নির্বাচিত সরস গল্প

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

সম্পাদনা : বিমল কর

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

প্রচ্ছদ অমিয় ভট্টাচার্য

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ২০.০০

মুখবন্ধ

অনেকদিন ধবেই ইচ্ছে ছিল, প্রভাতকুমাব মুখোপাধ্যায়-এব কয়েকটি প্রিয় সবস গল্পেব সংকলন কবব। প্রশ্ন হতে পাবে, শুধু সবস গল্প কেন, অন্য গল্প কী দোষ কবল? দোষ নিশ্চয় কবেনি কিন্তু আমাব উদ্দেশ্য অন্য। প্রভাতকুমাবেব গল্প সম্পর্কে যাঁদেব উৎসাহ ও অনুবাগ বয়েছে তাঁবা ইদানীং প্রকাশিত 'প্রভাত গল্প গ্রন্থাবলী' (তিন খণ্ড) সংগ্রহ কবে পড়তে পাবেন। সম্ভবত সব দিক দিয়েই এটি সুসম্পূর্ণ।

সামান্য পুবনো কথায় আসি। আমাদেব যখন বাল্যকাল তখন প্রভাতকুমাবেব লেখা পড়তে হলে বসুমতী সাহিত্যমন্দিব প্রকাশিত তাঁব বচনাবলী (গ্রন্থাবলী) ছাড়া উপায় ছিল না। স্বতন্ত্রভাবে প্রভাতকুমাবেব দু একটি বই বাড়িতে দেখেছি, কিন্তু সে প্রায় অর্ধছিন্ন অবস্থায়। মফস্বলেব বেলেব লাইব্রেবিতেও অবস্থাটা ছিল একই বকমেব। সহজ কথাটা এই, আমাদেব বাল্যকালে বসুমতী সাহিত্যমন্দিব যে কী পবিমাণ সাহিত্য পিপাসা মিটিয়েছে তা বলে শেষ কবা যায় না। প্রভাতকুমাবেব বেলাতেও তাই। তাঁব বই যখন স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হত—তখন আমবা জন্মাইনি। যখন কিঞ্চিৎ সাহিত্য পাঠ ইচ্ছা জেগেছে, তখন বসুমতী গ্রন্থাবলীই ছিল ভবসা।

এবপব দীর্ঘ একটা সময় কেটে গেছে, যখন আব বসুমতী সাহিত্যমন্দিব প্রকাশিত প্রভাতকুমাব গ্রন্থাবলী বাজাবে কিনতে পাওয়া যেত না। বৃহত্তব পাঠক গোষ্ঠীব সঙ্গে তাঁব বচনাব যোগসূত্র প্রায় ছিন্ন হতে বসেছিল। লেখকেব 'শ্রেষ্ঠগল্প' জাতীয় এক আধটি বই অবশ্য দেখা যেত, কিন্তু সে আব কতটুকু। এব অনেক পবে নতুন কবে প্রভাত গ্রন্থাবলী প্রকাশ হতে শুরু কবে। সুদৃশ্য, শোভন, পবিচ্ছন্ন সংস্কবণ। কিন্তু বড়ই অনিয়মিতভাবে এমনকি, একসঙ্গে কখনোই পব পব খণ্ডগুলি পাওয়া যেত না। ডি এম লাইব্রেবিব গোপালদাস মজুমদাব—গোপালদা একদিন আমায় বলেছিলেন, বই তো

ভালই বিক্রি হয়, কিন্তু ওরা ঠিকমতন বার করতে পারে না। তাঁর কাছেই আমি জানতে পারি, প্রভাতকুমারের নাতিই এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করছেন। অর্থাৎ দায়টা যেন তাঁর বংশধরের, বাঙালি পুস্তক প্রকাশকের নয়। অনেকে হয়ত বলবেন, এমন তো অনেকই ঘটেছে ; এর মধ্যে নতুনত্বের কী রয়েছে !

সম্ভবত এইসব কারণে, প্রভাতকুমারের রচনা পড়ার রেওয়াজ সাধারণভাবে কমে যায়। এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রী, বাংলা ভাষা নিয়ে যে এম এ পড়ছিল একসময়ে (বাংলা ছোট গল্প ছিল যার বিশেষ পড়ার বিষয়)—একদিন আমার কাছে স্বীকার করেছিল, প্রভাতকুমারের 'আদরিণী' ছাড়া অন্য কোনো গল্প সে পড়েনি। তাও গল্পটি তাদের স্কুল পাঠ্য কেতাবের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলেই পড়া হয়েছে। অবশ্য একটি ছাত্র বা ছাত্রী—সকল ছাত্রছাত্রীর পরিচয় হতে পারে না। একজনের অজ্ঞতাকে সকলের নামে চালিয়ে দেওয়া অন্যায়। অন্যেরা হয়ত অনেকটাই পড়েছেন।

আমার বলার কথাটি আবার বলি, একদার বহু লেখকই পরবর্তীকালে অপঠিত থেকে যান, সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যেতে পারেন পাঠকের সামনে থেকে। আমরা তাঁদের ভুলে যাই—এটা ঠিকই। স্বীকার করে নেওয়া ভাল, কিছু লেখক যে যে কারণে সাধারণ পাঠকের চোখের আড়ালে চলে যান প্রভাতকুমার সে-জাতীয় লেখক নন। আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা তাঁকে ভুলতে বসেছিলাম। আর সৌভাগ্য এই যে, শ্রীঅলোক রায় সম্পাদিত প্রভাতকুমাবেব তিন খণ্ড গল্প গ্রন্থাবলী এবং হালে প্রকাশিত একটি দুটি অন্য গ্রন্থ আমাদের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব হওয়ায় হয়ত নতুন করে একটি যোগাযোগ সম্ভব হবে।

প্রভাতকুমারের দশটি সরস গল্প বা কৌতুককাহিনী সংকলন করার একটি কাবণ এই যে, বৃহত্তর পাঠকগোষ্ঠীকে কিঞ্চিৎ প্রলুব্ধ করা। যদি এই সরস, উৎকৃষ্ট, পরিচ্ছন্ন গল্পগুলি পড়ে তাঁরা পরিতৃপ্ত হন, আমার আশা, নিজেরাই আগ্রহ করে অন্য গ্রন্থগুলি সংগ্রহ করে নেবেন। এছাড়া যে-কারণটি রয়েছে তা সাহিত্য সম্পর্কীয়। এ-বিষয়ে আলোচনার যোগ্যপাত্র আমি নই। শ্রীউজ্জ্বলকুমার মজুমদার তার দায়িত্ব নিয়েছেন। বা বলা ভাল, এ দায় আমি জোর করে তাঁর ওপর চাপিয়ে দিয়েছি।

তবু আমার কিছু বলার থাকে। সংক্ষেপেই বলি।

বাংলা সাহিত্যে হাস্য কৌতুক ব্যঙ্গ বিদ্রূপ-এর অভাব বড় একটা ঘটেনি। শুধু অভাব ঘটেনি বললে হয়ত ভুল বলা হবে, তার যে রেওয়াজ ছিল তা উচ্চমানের। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে কে ভুলতে পারে ? কার পক্ষে ভোলা সম্ভব মাইকেল দীনবন্ধু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচিত প্রহসনগুলি ! হুতোম পেঁচার নকশার তুলনা কোথায় ? ধরা যাক বঙ্কিমচন্দ্রের কথা। বঙ্কিমের উপন্যাসের নানা জায়গায় এবং লঘুপ্রবন্ধে যে উজ্জ্বল সকৌতুক, কখনও ব্যঙ্গময় কখনও অতি সরস সৌন্দর্যমণ্ডিত হাস্যরস ছড়িয়ে আছে তারই বা তুলনা কই ! ত্রৈলোক্যনাথ ? দ্বিতীয় কেউ আছে নাকি ? আর রবীন্দ্রনাথ ! রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কৌতুক-রসের যে রুচি, আভিজাত্য, মার্জিত রমণীয়তা ছিল তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করাব জন্যে কলম ধরার দরকার করে না। তাঁর কৌতুকের অন্যতম একটি গুণ ছিল ভাষা এবং শব্দপ্রয়োগ, বাইরে থেকে যার চার আনা দেখা যেত আর বারো আনা থাকত লুকোনো, সুরসিক পাঠকমাত্রেই তা অনুভব করতে পারতেন। রবীন্দ্রনাথের পর যে বাংলা সাহিত্য থেকে হাস্যরস উধাও হল তাও নয়। আমরা একাধিক উল্লেখযোগ্য উৎকৃষ্ট লেখক পেয়েছি যাঁদের রচনা বাংলা সাহিত্যের এই বিশেষ শাখাটিকে সমৃদ্ধ করেছে। এক 'পরশুরাম'-ই তো স্বতন্ত্র অধ্যায়। তবু স্বীকার করে নিতে হবে,

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় শিবরাম চক্রবর্তী পর্যন্ত যে যুগটি আমরা পেয়েছি—তার মূল্য সামান্য নয়। লেখকদের নামের তালিকা বৃদ্ধি করা আমার উদ্দেশ্য নয় বলে বিগত লেখকদের অনেক নামই উল্লেখ করলাম না।

লেখার বিষয়, রস যেমনই হোক এক লেখকের সঙ্গে অন্য লেখকের পার্থক্য থাকে—এ-বিষয়ে সকলেই একমত। কেদারনাথের রসরচনার সঙ্গে কেশবচন্দ্র গুপ্তর, কিংবা বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে শিবরাম চক্রবর্তীর লেখার পার্থক্য ধরতে সাধারণ পাঠকেরও কষ্ট হবার কথা নয়।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে সরস রচনার ক্ষেত্রে কেন যে স্বতন্ত্র এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক এ-বিষয়ে আমার কিছু বলার আছে। আমার মতের সঙ্গে অন্যে একমত হবেন—এমন আশা আমি করি না।

রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করে বলতেন, বাঙালি জাতি হৃদয় মনের সঙ্গে আমোদ করতে জানে না।"আমাদেব মধ্যে প্রফুল্লতা নাই...।" আমার ধারণা, প্রভাতকুমারের সরস রচনাগুলি যথার্থভাবেই হৃদয় মনের আমোদ। সেগুলির ধর্ম প্রফুল্লতা।

প্রসঙ্গত একটা কথা এখানে বলে নিই। প্রভাতকুমার যে-যুগে জন্মেছিলেন এবং যে-সময়ে সাহিত্য চর্চা করেছেন তখনকার বাঙালি সমাজ এবং এখনকার বাঙালি সমাজ সর্বাংশে এক নয়। বিশেষ কবে, আমাদের বাল্যকালেও আমরা লক্ষ্য করেছি, মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজে এক ধরনের আয়েসী, আবামদায়ক অবস্থা ছিল। হয়ত সেটা কিছুটা অর্থনৈতিক কারণে গ্রাম্য খুদে জমিদার ছাড়াও, নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ— যাদের মধ্যে ডাক্তার উকিল ব্যারিস্টার অধ্যাপক সরকাবি চাকরিঅলা ছিল এবং ইত্যাকার পেশা অবলম্বন ছিল যাঁদের তাঁরা অন্তত আর্থিক দিক দিয়ে মোটামুটি অনুদ্বিগ্ন ছিলেন। ফলে জীবনের একটা দিক দিয়ে ছিলেন—নিশ্চিন্ত, নির্ভার। সম্ভবত এই কারণে এক ধরনের আয়েস আরাম বৈঠকি মনোভাব বিরাজ করত এক শ্রেণীর মধ্যে। গড়গড়ার নলে মুখ দিয়ে অম্বুরি তামাকেব সুগন্ধি ধোঁয়া ওড়ানো থেকে বিলিতি চুরুট টানা খুব একটা কঠিন ব্যাপার এঁদের কাছে ছিল না। স্বভাবতই যাকে আমরা বৈঠকি মেজাজ বলি—সেই মেজাজ এঁদেব মধ্যে দেখা যেত।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমারের সরস গল্প সম্পর্কে যা বলেছেন, তার থেকে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের পরিমার্জিত রুচি,সূক্ষ্মতা, বৈচিত্র্যের উত্তরাধিকার লেখক লাভ করেছিলেন। এ-কথা অস্বীকার করার বড় কারণ নেই। সেই সঙ্গে বোধ হয় এটাও বলা যায়, বিভূতিভূষণ যাকে মজলিশ আসরের হাসি বলেছেন, প্রভাতকুমারের হাসির গল্পগুলি তার অন্তর্গত।

প্রভাতকুমারেব হাসির গল্প এখনও পড়তে কেন ভাল লাগে, কেনই বা তার সমাদর কমেনি সে-সম্পর্কে আমার দু চারটি কথা রয়েছে। সেগুলি বলি।

প্রথমত, এই গল্পগুলির গঠন এবং তার বিন্যাস অত্যন্ত চমৎকার। হাসির গল্পের গোক গাছে না উঠুক—তার নিজস্ব এক স্বাধীনতা রয়েছে। তাকে আমরা মান্য করি, স্বীকার কবি, কৃত্রিম বলি না। এটা কোনো ত্রুটি নয়। কাজেই প্রভাতকুমার তাঁর স্বীকৃত স্বাধীনতাটুকু নিয়েই গল্পগুলি রচনা করেছেন। আর প্রায়শই তাতে ত্রুটি খুঁজে পাওয়া যাবে না।

দ্বিতীয়ত, প্রভাতকুমারের সরস গল্পগুলির মধ্যে পারিবারিক, ঘরোয়া, মোটামুটি চেনাজানা মানুষদের উপস্থিতি আমাদের বড়ই কৌতূহলী করে। এদের হাস্যময় কীর্তি এবং অ-কীর্তিগুলিতে অট্টহাস্য না করে পারি না। আমি মনে করি না, প্রভাতকুমার

হাস্যরস সৃষ্টির জন্যে স্বাভাবিকতা বর্জন করে উদ্ভটকে আশ্রয় করেছেন।

তৃতীয়ত, প্রভাতকুমারের সরস রচনায় ব্যঙ্গ বিদ্রূপ শ্লেষ কখনোই তীক্ষ্ণ বা তীব্র নয়। এ-সবই পাওয়া যায়, তবে উচ্চগ্রামে নয়। সূক্ষ্মভাবে, সরসভাবে এবং বিদ্বেষবর্জিত রূপে।

আর যেটা শেষ কথা, প্রভাতকুমারের ভাষা। হাসিব লেখার ভাষাকে কত সুনির্বাচিত করে বসানো উচিত লেখকেব গল্পগুলি মনোযোগ দিয়ে পড়লে বোঝা যায়। ভাষা এবং শব্দের ওপর-চমক, অমার্জিত প্রযোগ আমরা খুঁজে পাব না। অথচ গল্প এবং ভাষার তলা দিয়ে হাস্যরসের প্রবাহ যেন ফল্গুর মতন বয়ে চলেছে।

প্রভাতকুমারেব লেখাব ঘরানা বোধ কবি বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়তেই ফুরিয়ে গেল।

এই সংকলনটি করাব সময় আমরা এখনকার চলতি বানান ব্যবহারের চেষ্টা কবেছি। তবু কিছু ত্রুটি থাকতেই পাবে। কপিব বানান সংশোধন এবং আনুষঙ্গিক কাজে আমায় সাহায্য কবেছেন, মিতালি মুখোপাধ্যায়। তাঁকে এবং ভূমিকা লিখে দেবার দাযিত্ব পালন কবার জন্যে আমি অনুজ বন্ধু শ্রীউজ্জ্বলকুমাব মজুমদারকে ধন্যবাদ জানাই।

বিমল কর

নিটোল গল্পের প্রসন্ন স্রষ্টা

সাধারণ বাঙালী পাঠককে প্রায় দুঃখ করতে শুনি এই বলে যে বাঙলা সাহিত্যে হাসির খোরাক কম আমার ধারণা সব দেশের সাহিত্যেই হাসির খোরাক কমই কারণ হাসির উপাদান আমাদের বাস্তব জীবনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও তাকে সঠিক রূপে অর্থাৎ শিল্পসম্মতভাবে পরিবেশন করার ক্ষমতা খুব কম লেখকেরই থাকে। সেইজন্যেই বেস্ট ট্র্যাজিক স্টোরিজ বা শ্রেষ্ঠ দুঃখের গল্পের সংকলন করতে হয় না। কিন্তু শ্রেষ্ঠ হাসির গল্প বা বেস্ট হিউমারাস স্টোরিজ সংকলন করে পাঠকের হাতে তুলে দিতে হয়। মন-মেজাজের ভারসাম্য আনতে পাঠকও এ জাতীয় সংকলনের তারিফ করে। মাঝে-মধ্যে একটি-দুটি গল্প পড়ে ভারাক্রান্ত মনকে হালকা করে নেওয়া যায় বলেই এমন সংকলন হাতের কাছে থাকা দরকারও বটে

আসলে জীবনের ভুল-ভ্রান্তি ত্রুটি-বিচ্যুতি অসঙ্গতিকে যে লেখক গভীর-ভাবে 'অনুভব' করেন তাঁর দৃষ্টি হাস্যরসিকের দৃষ্টি নয়, যদিও উঁচুদরের হাস্যরসিক দুঃখের দিকটাকে গভীর সহানুভূতির সঙ্গেই দেখেন এবং তাঁর কৌতুক সৃষ্টির পেছনে বিপন্ন মানুষের প্রতি গভীর অনুকম্পা থেকেই যায়। গভীর অনুভূতির সঙ্গে 'সজাগ বুদ্ধি' হাস্যরসিককে ঘটনা বা পরিস্থিতির অস্বাভাবিকতাকে চিন্তার রাজ্যে একটু দূরত্বে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। আর সেই দূরত্ব থেকে পরিস্থিতিকে একটু তির্যকভাবে দেখিয়ে অনুভূতির গভীরতার মাত্রা কমিয়ে হাস্যরসিক কৌতুক রসের সৃষ্টি করেন। তাই এক দিক থেকে 'ভাবলে' যা দুঃখের অন্যদিক থেকে 'চিন্তা করলে' তা-ই কৌতুকে কমনীয়।

সেইজন্যেই অনেক সময় হাস্যরসিককে করুণরসিকের তুলনায় বেশি পরিণত মনে হয়। সমস্যা নিয়ে বেঁশি ভাবনা-চিন্তা করা বা বেশি অনুভূতি-প্রবণ হওয়া চরিত্রের ভারসাম্য রক্ষার লক্ষণ নয়। অন্যদিকে সমস্যায়-পড়া মানুষের আচার-আচরণকে একটু নিরপেক্ষদৃষ্টিতে দেখাটা অনেকটাই চারিত্রিক ভারসাম্য রক্ষার প্রমাণ। কারণ নিরপেক্ষদৃষ্টিতে দেখলে ব্যাপক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে যে কোনো সমস্যাই—যত অপ্রত্যাশিতই হোক—যুঝবাব মতো মানসিকতা তৈরি করার পক্ষে চ্যালেঞ্জ। এই দৃষ্টি যথার্থ রসিকের দৃষ্টি। এই দৃষ্টি স্বভাবে থাকলে মানুষের আচার-আচরণের মধ্যে অসঙ্গতি দেখা, তার বিস্মৃতি বা বিভ্রান্তিকে উপভোগ করা সম্ভব। উত্তেজিত, উদভ্রান্ত কিংবা বিপন্ন মানুষের মধ্যে খানিকটা শিশুসুলভ সারল্যকে দেখা, কিংবা অপ্রত্যাশিত চমক বা প্রত্যাশা-ভাঙার ধাক্কাকে কমনীয়ভাবে দেখাও সম্ভব। এই দৃষ্টি মানুষের অতিরিক্ত সংলগ্নতা বা ইনভল্‌ভ্‌মেন্টকে এড়িয়ে গিয়ে একটু মৃদু বা কমনীয়ভাবে উপভোগ করার মতো দূরত্ব নিয়ে আসে। যাঁরা বিদ্রূপ বা ব্যঙ্গ করেন তাঁদের চরিত্রে যে ক্রোধ থাকে, জ্বালা থাকে, তা এই জাতীয় কৌতুকদৃষ্টিতে থাকে না। তাই সমস্যায় পীড়িত মানুষের চেয়ে সমস্যা-উত্তীর্ণ মানুষের তৃপ্তিকর চেহারাটা এই কৌতুক-রসিকেরা বেশি পছন্দ করেন। এই দৃষ্টিতে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ থাকলেও তাতে শেষপর্যন্ত ক্রোধ বা জ্বালা থাকে না। ট্র্যাজিক বোধ যেমন মানুষের যুঝবার ক্ষমতাকে প্রকাশ করে, কৌতুকবোধ তেমনি মানুষের ত্রুটি-বিচ্যুতি, সংস্কার ও বিপন্নতাকে অনেকখানি ক্ষমার চোখে দেখে। প্রতিকূল জীবনে যুঝবার এও আর এক অস্ত্র ; উত্তেজনা বা আতঙ্কের বিরুদ্ধে স্নিগ্ধ প্রসন্নতার অস্ত্র।

এই প্রসন্ন কৌতুকেব অস্ত্র নিয়েই প্রভাতকুমার গত শতাব্দীর শেষ দশকেগল্প-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আর্বিভাবের বছর পাঁচেক পরে তারই উৎসাহে গল্পরচনা শুরু করেন। এবং, দেবী, হীরালাল, কাশীবাসিনী কিংবা আদরিণীর মতো কিছু করুণরসাত্মক গল্প ছাড়া মূলত সংযমস্নিগ্ধ রুচিকর রঙ্গকৌতুকের গল্পলেখক হিসেবেই শরৎচন্দ্রের আগে তিনি বাঙলা সাহিত্যের পাঠকের কাছে অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। প্রভাতকুমারে আগে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এবং পরে পরশুরাম উঁচুদরের রঙ্গ-ব্যঙ্গের শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। কিন্তু এই দুজন কৌতুকশিল্পীর সঙ্গে প্রভাতকুমারের পার্থক্য আছে চরিত্রধর্মে। ত্রৈলোক্যনাথ ও প্রভাতকুমার দুজনেই বিশুদ্ধ গল্পবিলাসী হলেও বৈঠকী মেজাজের আসর-জমানো গল্পের বক্তা ত্রৈলোক্যনাথকে প্রভাতকুমারের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। ছোটগল্প বলতে যে নির্বাচিত ঘটনার পরিমিত পরিবেশন বোঝায় সেই নির্বাচন-দক্ষতা ও পরিমিতিবোধ প্রভাতকুমারে প্রায় নিখুঁত। ত্রৈলোক্যনাথের বৈঠকী আলগা ভঙ্গি প্রভাতকুমারের চরিত্রে নেই। ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের আরও একটি পরিচয় আছে স্বজাতি ও সমাজের সমালোচনায়। সমাজের গ্লানি ভণ্ডামি সংস্কার মিথ্যাচার ত্রৈলোক্যনাথের আক্রমণের লক্ষ্য, কিন্তু কৌতুক রসকে উপেক্ষা করে কখনোই নয়। ত্রৈলোক্যনাথ উদ্‌ভট উদ্দাম কল্পনায় ভৌতিক সংস্কারকে নিয়ে যে চরম ঠাট্টা করে গেছেন তাতে আক্রমণের তীব্রতাকে কমিয়ে 'উইট' ও 'ফান'—বুদ্ধিদীপ্ত

মন্তব্য ও বেপরোয়া রঙ্গরসিকতাকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রভাতকুমারের রসময়ীর রসিকতা গল্পেও ভূততাত্ত্বিকদের প্রতি কটাক্ষ আছে, কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত উইট বা বঙ্গরসিকতায় তা 'আক্রান্ত' নয়। গল্পেব পরিণতিই ভূততাত্ত্বিকদেব ছদ্ম-বৈজ্ঞানিক ভঙ্গিটির মুখোস খুলে দিয়েছে। সামাজিক ভণ্ডামি ও মিথ্যাচারের প্রতি ত্রৈলোক্যনাথের 'খড়্গহস্ত' হবার তির্যক উইটের ভঙ্গিটি প্রভাতকুমারে পাওয়াই যাবে না।

অন্যদিকে গল্প বলাব পরিমিতিবোধে পরশুরামের সঙ্গে প্রভাতকুমারেব যথেষ্ট মিল আছে। আধুনিক গল্পেব ঘটনা-নির্বাচন-দক্ষতা বা অনুভবের নাটকীয পবিবেশনে নিখুঁত মাত্রাজ্ঞান প্রভাতকুমারের যেমন ছিল, পরশুরামেরও তেমনি ছিল। কিন্তু লম্বকর্ণ, স্বয়ম্বরা, দক্ষিণ রায়, মহেশের মহাযাত্রা, ভূশণ্ডীর মাঠে ইত্যাদি গল্পে পরশুরামের যে বৈঠকী ভঙ্গির দক্ষতা ও উদ্দাম কল্পনা দেখি তা ত্রৈলোক্যনাথেবই অনুসবণ। প্রভাতকুমার ঠিক এই মেজাজের শিল্পী নন। আবাব কচি সংসদ কিংবা শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেডেব মতো ক্যারিকেচারও প্রভাতকুমারে পাওয়া যাবে না। আগেই বলেছি, তীক্ষ্ণ তির্যক আক্রমণাত্মক ভঙ্গি বা গামানুষ জাতির কথা-ব মতো ব্ল্যাক হিউমারও প্রভাতকুমারে পাওয়া যাবে না। সহজ ঘরোয়া সাংসারিক জীবনের সুপরিকল্পিত সিচুয়েশন বা পরিস্থিতি-সৃষ্টিতেই তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। তীব্র আক্রমণেব বদলে এই সিচুয়েশানাল বা পরিস্থিতিজাত স্নিগ্ধ কৌতুকই তাঁকে কালোত্তীর্ণ করেছে। যে সমাজবিধিব ওপর তাঁব আস্থা ছিল তা পবিবর্তিত হয়ে গেছে, কিন্তু নিছক রঙ্গকৌতুক সৃষ্টির মাত্রাজ্ঞান ও সহানুভূতি তাঁব গল্পকে উত্তবকালেও সমান উপভোগ্য করে রেখেছে। তাঁর সময়েব একটু আগেকার সামাজিক নানা ভাবনাচিন্তা ও গতিবিধি কিংবা তাঁরই সমকালেব সামাজিক বাস্তব পরিবেশ প্রভাতকুমারেব বহু গল্পেব ঘটনা-সংস্থানের বঙ লাগিয়েছে। গ্রাম, মফঃস্বল শহর, কলকাতা—বিশেষ করে মধ্য কলকাতার মেস-জীবন, বাঙলাদেশেব বাইবে উত্তরভারতের নানা স্থানিক পবিবেশ, এমন কি লণ্ডন-ব্রাইটন পর্যন্ত প্রভাতকুমারের গল্পের পবিবেশ বিস্তৃত। সে সব পরিবেশ এখন বদলে গেছে। কিন্তু এই স্থানিক রঙ যেমন আজকেব অশীতিপর বৃদ্ধের কাছে নসটালজিক, আজকের তরুণ পাঠক-পাঠিকাদের কাছে তেমনি ঐতিহাসিক কৌতূহলের বিষয। তেমনি আবার চরিত্রের বৈচিত্র্যেও তাঁব গল্প সমান আকর্ষণীয়। মেসের ছাত্র, পেনসন-পাওয়া বৃদ্ধ, সদ্য কেরানী, বহির্বঙ্গের চাকুরে ও উকীল, আদালতের মোক্তার, রেলস্টেশনের ছোটবাবু, চাষী গৃহস্থ, ঝি ও খানসামা, ট্রেনের গার্ড, জমিদার, নবীন ব্রাহ্ম যুবক, চিৎপুরের জ্যোতিষী, লণ্ডনের ল্যান্ডলেডি, ইত্যাদি বিচিত্র চরিত্র গল্পগুচ্ছের রবীন্দ্রনাথের চরিত্র-বৈচিত্র্যকেও ছাড়িয়ে গেছে। তার ওপর জীবজন্তু নিয়েও অবিস্মরণীয় গল্প লিখেছেন তিনি। 'আদরিণী' ও 'কুকুর ছানা'র মতো করুণ-মধুব গল্পের প্রভাতকুমারকে কেউ ভুলতে পারে কি? স্থানিক বৈচিত্র্যে ও চরিত্র-বৈচিত্র্যে শরৎচন্দ্রের আগে প্রভাতকুমারের জুড়ি নেই।

এই সংকলনে যে দশটি গল্প প্রখ্যাত লেখক বিমল কর বেছে দিয়েছেন

সেগুলিব মধ্যে প্রভাতকুমাবেব পবিস্থিতি-নির্ভব বঙ্গ-কৌতুকই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বাঙালী সংসাবেব নাবী-পুরুষেব স্বভাববৈচিত্র্য প্রেম ও দাম্পত্য সম্পর্ক নির্ভব স্নিগ্ধ কৌতুক এবং পবিচ্ছন্ন ও সুপবিকল্পিত প্লট। 'বউ চুবি' গল্পেব নায়ক অনাথশবণ বাড়িতে যোড়শী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও কলকাতায় এক দীক্ষিত ব্রাহ্ম বন্ধুব পাল্লায় পড়ে স্ত্রীকে ভগিনী হিসেবে ভাবতে শুরু কবেছে এবং ব্রাহ্ম-বন্ধুব দূব সম্পর্কেব আত্মীয়াব প্রেমে পড়ে ঠিক কবেছে যোড়শী স্ত্রীকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে দুজনে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হবে এবং নতুন ব্রাহ্ম আইন অনুসাবে বিবাহ বিচ্ছেদ কবে ব্রাহ্ম বন্ধু হেমন্তেব বোন নগেন্দ্রবালাকে বিয়ে কববে। তাব ধাবণা পূর্ব পবিচিত না হয়ে ভালো না বেসে যে স্ত্রীকে সে বিয়ে কবেছে সে স্ত্রীই নয়। এই ধাবণাব বশে সে অন্তঃপুরে গিয়ে একটি কাগজে স্ত্রীকে বাত বাবোটাব সময়ে ঘবে আসতে অনুবোধ কবে কাগজটি গৃহকাজে বত স্ত্রীকে ছুড়ে দিয়ে চলে এসেছে। উদাসীন স্বামীব এই হঠাৎ পবিবর্তনে স্ত্রী একটু অবাক হলেও শেষ পর্যন্ত বিধবা ননদেব কাছে সাহস পেয়ে স্বামীব ঘবে গেছে এবং স্বামীকে নিদ্রিত দেখে স্বামীব পদসেবাব সুযোগ পেয়ে স্বামীব পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে পায়েব কাছেই ঘুমিয়ে পড়েছে। বেশি বাত্রে অনাথেব ঘুম ভেঙে গেলে পায়েব কাছে ঘুমন্ত স্ত্রী মন্দাকিনীকে দেখে অনাথ মুগ্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু মনে বল এনে আলো জ্বালতেই মন্দাকিনীব ঘুম ভেঙে গেলে তাকে কলকাতা নিয়ে যাবাব উদ্দেশ্যটি স্পষ্ট কবেই বলেছে বিবাহবন্ধন ছিন্ন হলে স্বাধীন হয়ে মন্দা যে ভালোবেসে অন্য কাউকে বিয়ে কবতে পাবে তাও বুঝিয়েছে। মন্দা কেঁদেছে কিন্তু নিজেব মত জানায়নি কিন্তু পবেব দিন আসতে অনুবোধ কবায় সে বাজি হয়েছে পবদিন তাদেব বাড়িব চাকব মাখনেব স্ত্রী সাপেব কামড়ে মাবা গেলে মাখনেব কান্না দেখে অনাথেব মনে হয়েছে তাব বন্ধুব কাছে পাওয়া ধাবণাটি মিথ্যে ভালো না বেসে বিয়ে কবেও স্ত্রীব মৃত্যুতে মাখনেব কান্না দেখে তাব চোখ ভিজে উঠেছে। সেই দিনই হেমন্তেব চিঠিতে নগেন্দ্রবালাব উত্তবোত্তব বেড়ে যাওয়া ভালোবাসাব কথা সে জানতে পেবেছে। অন্যদিকে গত বাত্রে মন্দাব কান্নাব মধ্যেও স্বামীব প্রতি ভালোবাসাব প্রমাণ পেয়ে বিবাহ পববর্তী ভালোবাসা যে একেবাবেই মিথ্যে—এ ব্যাপাবেও তাব সংশয় এসেছে। সন্ধ্যাবেলা ভাইপো ব হাতে পাওয়া চিঠিতে চবণাশ্রিতা' দাসী মন্দাকিনী স্বামীব অনুগামী হতে বাজি আছে জানতে পেবে পবেব দিন স্ত্রীকে যথাপূর্ব জানিয়ে বাত একটায় স্ত্রীকে চুবি' কবে অনাথ পালিয়েছে। পথে পাণ্ডুয়ায় মন্দাকিনী অসুস্থ হয়ে পড়েছে এবং অসুস্থতা সত্ত্বেও স্বামীব প্রতি তাব কর্তব্যবোধে এবং অনাথেব নিজেব উদ্বেগ ও উপবাসে স্ত্রীব প্রতি অনাথেব ভালোবাসা যেন স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছে এই মুহূর্তে স্বামী স্ত্রীব অভিমানী সংলাপে যে স্নিগ্ধ কৌতুক ফুটে উঠেছে তাতে স্বামী স্ত্রীব সম্পর্ক সহজ হয়ে এসেছে। এব পব স্বামীব ওপব অধিকাবেব জোবে মন্দা নগেন্দ্রবালাব সঙ্গে কলকাতায় গিয়ে দেখা কবতে চাইলে চুবি-কবা বৌয়েব প্রতি নতুন প্রেমেব আবেগে অনাথ সে প্রস্তাবে বাজি হয়নি। অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে সে যাবে পশ্চিমে শবীব সাবাতে। এই নতুন দাম্পত্য প্রেমেব পবেই হেমন্তেব চিঠিতে জট খুলেছে। জানা গেছে নগেন্দ্রবালাব বিয়ে ঠিক

হয়েছে অন্যের সঙ্গে। চিঠিতে ব্যর্থপ্রেমিক অনাথকে হিমালয়ে গিয়ে তপস্যা করতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এবং সান্ত্বনাও দেওয়া হয়েছে যে অনাথ সান্ত্বনাকে এখন গ্রাহ্যই করে না। আর একটি কথাও আছে হিন্দুমতে অনাথের যে বিয়ে হয়েছে, ব্রাহ্ম বিবাহ আইনের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক ছিন্ন হবার নয়। এরপর অনাথ ও মন্দার আর একটু অভিমানী সংলাপের পর নিবিড় চুম্বনে গল্পের পরিণতি। গল্পটি একটু বিস্তৃতভাবে বলেছি এই কারণেই যে, বিবাহ-পূর্ব প্রেমই একমাত্র সত্য এই ধারণা ভেঙে গিয়ে কীভাবে স্ত্রীর সংস্পর্শে এসে অনাথ বিবাহোত্তর প্রেমে অনিবার্যভাবে আস্থা পেয়েছে তা লক্ষ্য করার মতো। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে প্রাথমিক দ্বিধা ও সংকোচ, ঘটনাচক্রে দুজনের সান্নিধ্য, বিশেষত, খুব সংক্ষেপে, পায়ের তলায় ঘুমন্ত স্ত্রীকে দেখার অনুভূতি, পরস্পরের প্রতি দোষারোপের সংক্ষিপ্ত সংলাপ এবং স্ত্রীর সহজ সতীত্ববোধের কাছে স্বামীর নতুন-পাওয়া ধ্যান-ধারণার পরাজয় অসাধারণ সংযত কৌতুকে দেখানো হয়েছে। পরিস্থিতি বিন্যাস ও সংলাপের কৌতুকময় নৈপুণ্য এবং পুরোনো মূল্যবোধকে (যাকে সমাজস্থিতির প্রতি প্রভাতকুমারের আস্থা বলে উল্লেখ করেছি।) কৌশলে ফিরিয়ে আনার দক্ষতায় পাঠকের পক্ষে উপভোগ্য স্বস্তি এই গল্পের বিশিষ্ট লক্ষণ।

এই রকমই চমৎকার দাম্পত্য প্রেমালাপ দিয়ে শুরু হয়েছে পত্নীহারা গল্প। কেবল স্বামী-স্ত্রী এখানে আর একটু বেশি শিক্ষিত রুচির। স্ত্রী সুনীতি কবিতা-টবিতা পড়েন, স্বামী সুবোধেরও লেখক হিসেবে একটু-আধটু খ্যাতি আছে। সুবোধ সুনীতিকে মেম সাহেবের পোশাক পরিয়ে স্টার থিয়েটারের বক্সে দুজনে পাশাপাশি বসে চন্দ্রশেখর অভিনয় দেখবে এই উদ্দেশ্যটা অনেক আদর-আবদার বিনিময় করার পর প্রকাশ করলে। স্ত্রীর সংকোচ হচ্ছিল বলে ঠিক হলো, শাড়ি পরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে হুগলি থেকে কলকাতার ট্রেনে রিজার্ভ করা সেকেণ্ড ক্লাসে (এখন ভাবা যায় না) উঠে মেমসাহেবের পোষাক পরে নেবে। ট্রেনে পোষাক বদলে মেমসাহেব সেজে সুনীতি সুবোধের সঙ্গে হাওড়ায় এসে ঘোড়ার গাড়িতে উঠল। ওঠার পর হঠাৎ তোরঙ্গটি থিয়েটার দেখার সময় গাড়িতে পড়ে থাকলে চুরি হয়ে যাবে ভেবে গাড়োয়ানকে স্টার থিয়েটার-হাতিবাগান যেতে হবে বলে সুবোধ স্টেশন মাস্টারের কাছে কুলিকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেছে তোরঙ্গটি রাখতে। এদিকে গাড়োয়ান গাড়ি নিয়ে সোজা স্টার থিয়েটার পৌঁছে গেছে। তোরঙ্গটি রেখে এসে গাড়ি নেই দেখে সুবোধ মহাবিপদে পড়েছে। অন্য গাড়ি নিয়ে স্টার থিয়েটারে 'মেমসাহেব'কে না পেয়ে আবার স্টেশনে এসে স্টেশন মাস্টার ও পুলিসের সাহায্যে তোরঙ্গবাহক কুলিটির কাছে গাড়িটির গাড়োয়ানের খোঁজ করে তার কাছে খবর পেয়েছে স্টার থিয়েটার থেকে সে সুনীতিকে নিয়ে গেছে চক্রবেড়িয়ায় ভায়রা ভাই অবিনাশের বাড়ি। তারপর সেখানে হাসির রোলের মধ্যে দুর্গতির অবসান। শ্যালিকার বকুনিতে বোঝা গেল মেমসাহেবরা একলাই গাড়িতে যায় এই ভেবেই গাড়োয়ান গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেছে। সুবোধও আগে এই আশঙ্কা করেছিল। গাউন পরাতেই যত বিপত্তি। নাটকে যে ধরনের ভুল বোঝাবুঝিতে জটিল পরিস্থিতির মধ্যে চরিত্র

বিপদে পড়ে এবং দর্শক চরিত্রের বিপন্নতা দেখে দূরত্ববোধে মজা পায় 'পত্নীহারা' সেই জাতীয় নাটুকে গল্প। এই জাতীয় গল্পে বা নাটকে পরিস্থিতিকে জটিল করে জট ছাড়িয়ে দিয়ে পাঠকের বা দর্শকের মনে স্বস্তি আনা হয়। নিছক ইচ্ছাপূরণের আগ্রহে মানুষ সম্ভাব্য বিপদের কথা অনেক সময়েই ভাবতে না পেরে যেমন বিপদে পড়ে এবং লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি বা উদ্দেশ্য অনুযায়ী সর্বস্বান্ত হয় বা বিপদমুক্ত হয়, সেই জাতীয় একটি সমস্যাই এখানে লেখকের কৌতুক সৃষ্টির লক্ষ্য হয়েছে। শ্যালিকার বকুনিতে সুবোধের ইচ্ছাপূরণের অত্যুৎসাহে বুদ্ধিভ্রমের কথাই কারণ হিসেবে বলা হয়েছে। 'বউ চুরি' গল্পে দেখা গেছে নিজের স্ত্রীকে পরিত্যাগ করবে বলে নায়ক তাকে চুরি করে নিয়ে যেতে গিয়ে নিজের স্ত্রীরই প্রেমে পড়েছে। 'পত্নীহারা' গল্পে নিজের স্ত্রীকে মেমসাহেব সাজিয়ে বক্‌সে বসে একসঙ্গে থিয়েটার দেখতে যাবার পথে নায়কের নিজের এবং গাড়োয়ানের ভুলে বউ চুরি হয়ে গেছে। তবে সৌভাগ্যবশত খুঁজে পাওয়াও গেছে।

কিন্তু 'রসময়ীর রসিকতা' গল্পের দাম্পত্য সম্পর্কটা একেবারেই উল্‌টো। হুগলীর নিঃসন্তান মোক্তার ক্ষেত্রমোহনের আঠারো বছরের দাম্পত্যজীবন রসময়ীর সঙ্গে যুদ্ধ ও সন্ধি করেই কেটে গেছে। কিন্তু এবারের 'বিপ্লব' দিয়েই গল্পের শুরু। ঝগড়া করে রসময়ী বাপের বাড়ি হালিসহরে গেছে। ক্ষেত্রমোহন অন্য অন্যবার সাধ্য-সাধনা করে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেও এবার আসেনি। দ্বিতীয়বার বিয়ে কববে ঠিক করেছে। হালিসহরে পাড়ার একটি ছেলের বন্ধুর আত্মীয়ার সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছে খবর পেয়ে রসময়ী তার দিদিব সঙ্গে গিয়ে সেই বাড়িতে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে চলে আসার ফলে মেয়ের বাবা ক্ষেত্রমোহনকে ভয়ে কন্যা দিলেন না। পরের দিন ক্ষেত্রমোহনের বাড়ি গিয়ে রসময়ী 'নিজ কোমরে দুই হাত দিয়া, ঝুঁকিয়া, নিজের মুখ ক্ষেত্রমোহনের অতি নিকটে সরাইয়া' স্বামীকে খণ্ডযুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করলে। স্ত্রীর 'এতাদৃশ বিনয় দেখিযা' ক্ষেত্রমোহন বললেন, 'তুমি না মরলে আর বিয়ে করছি না। মরবে কবে?' উত্তরে জানা গেল 'রসিবামনি এখনি মরছে না।'

এই ঘটনার ছ'মাস পরে বাপের বাড়িতেই রসমযীর মৃত্যু হয়েছে। ক্ষেত্রমোহন গিয়ে দাহ করে এসেছেন। আরও ছ'মাস পরে যখন ক্ষেত্রমোহনের বিয়ে স্থির হয়েছে তখন রসময়ীর একটি চিঠিতে 'মৃত' রসময়ী ক্ষেত্রমোহনকে বিয়ে করতে বারণ করেছেন। বিয়ে করলে অশেষ দুর্গতির ভয়ও দেখিয়েছেন। চিঠির বিচিত্র বানান, সাবধান করার নিজস্ব ভঙ্গি এবং হাতের লেখা সবই রসময়ীর। এই চিঠি উপলক্ষ্য করে ভূতে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে বিতর্ক প্রভাতকুমারের সমকালীন থিয়োসফিস্ট আন্দোলনেরই প্রতিচ্ছবি। যাই হোক, ক্ষেত্রমোহন তাঁর খুড়োর পরামর্শে সাহস করে বিয়ের আশীর্বাদ সেরে ফেললেন। তারপরে আবার ভৌতিক পত্রাঘাত। আশীর্বাদ হয়ে যাওয়াতে আরও রাগ এবং খুনের ভয় দেখানো : 'বটগাচ হইতে নামিয়া তোমার বুকে একখান দসমুনে পাতর চাপাইয়া দিব। ঘুম আর ভাঁগিবে না।' ফলে থিয়োসফিস্টদের উৎসাহ বেড়ে গেছে। ক্ষেত্রমোহন গয়ায় গিয়ে 'পিণ্ডি' দেবেন ঠিক করলেন। এর পরেই আবার পত্রাঘাত আর হুমকি। যাবার পথে

'রেলগাড়িতে প্রবেশ করিয়া তোমার বুকে ছোরা বসাইয়া দিব।' এদিকে হস্তলিপি-বৈজ্ঞানিক চিঠিগুলির সঙ্গে রসময়ীর আগেকার চিঠি মিলিয়ে বললেন, হাতের লেখা একই। থিয়োসফিক্যাল রিভিয়ুতে চিঠিগুলি প্রকাশিত হলো। ভয়ে ক্ষেত্রমোহন গয়ায় গেলেন না। কিন্তু কিছুদিন পরে খবর এলো রসময়ীর ছোটভাই বাজি পোড়াতে গিয়ে জখম হয়েছে। হাসপাতালে শ্যালককে দেখে রসময়ীর বিধবা দিদিকে হালিসহরে পৌঁছে দিতে ওখানেই রাত কাটিয়ে ভোরে উঠে ক্ষেত্রমোহন দেখেন পুলিস সাহেব ওয়ারেন্ট নিয়ে হাজির—বাজি পোড়ানো না বোমা তৈরি তা দেখবার জন্যে সার্চ হবে। বহু জিনিসপত্তরের মধ্যে রসময়ীর দিদির বাক্স থেকে কিছু চিঠি বেরোলো। খামে রসময়ীর হাতের লেখা ক্ষেত্রমোহনের ঠিকানা। মৃত্যুর আগে স্বামীর দ্বিতীয়বারেব বিয়ের কল্পনা করে নানা চিঠি, যার মধ্যে গয়ায় পিণ্ডদানের পরের সম্ভাব্য ঘটনাগুলিও আছে এবং সঙ্গে হুম্‌কি। রসময়ীর দিদিকে বিস্মিত ক্ষেত্রমোহন প্রশ্ন করতেই 'ঠাকুরঝি আপন মনে মালা জপ করিয়া যাইতে লাগিলেন।' এইভাবেই সুপরিকল্পিত প্লটের সাহায্যে ভূতবিশ্বাসী থিয়োসফিস্টদের ধ্যান-ধারণাকে ফাঁস করে দেওয়া হয়েছে আসল 'বৈজ্ঞানিক' কারণটি দেখিয়ে। গল্পের খাতিরে ধরে নিতে হবে স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহের আশঙ্কা করে রসময়ী সেই প্রস্তুতির বিভিন্ন পুর্বে যা যা কল্পনা করেছে বাস্তবে হুবহু তা-ই ঘটেছে এবং ঘটনার রটনা অনুযায়ী সেই চিঠিগুলি রসময়ীর দিদি পোস্ট করেছে, যথাসময়ে চিঠিগুলি পৌঁছে সব আয়োজন পণ্ড করে থিয়োসফিস্টেব উৎসাহ বাড়িয়ে দিয়েছে। ভৌতিক বহস্যকে অক্ষুণ্ণ রাখার পক্ষে এইটিই লেখকেব **well-contrived** কৌশল। কিন্তু থিয়োসফিস্টদের প্রতি তীব্র আঘাত কোথাও নেই, পরিণতির অপ্রত্যাশিত চমকই তাদের ছদ্ম-বৈজ্ঞানিকতাকে অসার প্রমাণ করে দিয়েছে।

কিন্তু এই কৌতুক-শ্লেষের চমৎকার আয়োজনের আড়ালে একটি করুণ মুখ ভেসে ওঠে। সে মুখটি রসময়ীর। তার বদমেজাজী স্বভাবেব আড়ালে পতিপ্রাণা অপেক্ষমানা রসময়ী মৃত্যুশয্যায় স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহের কল্পনা করে কতোখানি করুণ অসহায়তা নিয়ে চিঠিগুলি লিখে রেখেছে তা ভাবলে গল্পটির কৌতুকোচ্ছ্বাসে গভীর কারুণ্য মিশে যায়। এ গল্পে তাই প্রভাতকুমার উঁচুদরের হিউমারিস্ট।

এখন যেমন পূর্ব পরিচিত ছেলে-মেয়েরাই অনেক ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী হয়ে যায়, সত্তর-আশি বছর আগে তেমন ছিল না। অনেকক্ষেত্রেই স্ত্রী-রা এখন যেমন ভক্ষিত ফল, তখন ছিল নিষিদ্ধ ফল। 'নিষিদ্ধ ফল' গল্পে সেই নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণেব বিপত্তি কৌতুকের কারণ হয়েছে। 'সামাজিক-সমস্যা-সমাধান' বইয়ের লেখক রায়বাহাদুর বরপণে আপত্তি করতেন কিন্তু বাল্যবিবাহ যৌথপরিবারের পক্ষে উপযুক্ত বলেই বইতে তার সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর থিয়োরি ছিল মেয়ের বয়স যোলো আর ছেলের বয়স চব্বিশ না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে হলেও তারা মিলিত হতে পারবে না। যাই হোক, বি. এ-পড়া ছেলে হেমন্তের তিনি বিয়ে দিলেন তেরো বছরের মেয়ে রাণীর সঙ্গে। কিন্তু হেমন্ত ফুলশয্যার পর বাইরের ঘরে শোয়, মেয়ে অন্দরে। পরীক্ষার পড়া চলছে তবু তারই মধ্যে খাবার সময়ে

অন্দবে ঢুকলে স্ত্রীব সঙ্গে ক্ষণিক মিলনই হয, বাকি সময়টা বিবহেব কবিতা লিখে বর্ষাযাপন হয। বঙ্গবাণী-তে হেমন্তেব 'চকোবেব ব্যথা' কবিতা চোখে পডতেই বাযবাহাদুব পুত্রবধূকে পিত্রালযে পাঠিযে দিলেন। কিন্তু কিছুদিন বাদে কলেজেব ঠিকানায হেমন্তেব নামে চিঠি এলো—তাব বড শালী শিবপুব থেকে চিঠি লিখেছে তাব দিদিশাশুডী হেমন্তকে দেখতে চায। তাছাডা তাব স্ত্রীও দিদিব কাছে বযেছে। এইভাবেই নিষিদ্ধ ফল দেখা শুরু হলো। পবীক্ষা এসে গেছে, বাডিতে পডা চলছে, স্ত্রী পিত্রালযে। কাজেই মেসে গিযে থাকলে স্ত্রী শিবপুবে গেলে তাব সঙ্গে গিযে দেখা কবা সম্ভব হবে এই ভেবে বাবাব অনুমতি নিযে হেমন্ত মেসে গিযে 'পবীক্ষাব পডা' চালাতে লাগলো। পবীক্ষাব ফলবেবোলো যথাবীতি গেজেটে তাব নাম নেই। এব পব থেকে বাবাব নির্দেশে মেসেই থাকতে হয। ববিবাব বাডিতে এসে বিকেলে মেসে ফেবে। স্ত্রীব সঙ্গে দেখা নেই। শেষে 'বোমিও জুলিযেট' পডে উত্তেজিত হযে ঝিব সাহায্যে দডিব মই পাঠালে স্ত্রীকে। স্ত্রী দোতলাব ঘবেব জানলা দিযে মই নামিযে দিলে সেই মই বেযে স্ত্রীব ঘবে ঢুকবে। যথাসময়ে বাডিব পেছনেব বাগানে প্রাচীবে উঠতেই সিমেন্ট খসে যাওযাব শব্দ পেযে পথচাবী 'চোব' বলে চেচাতেই কনস্টেবল এসে চেচালো। তখন বাযবাহাদুবেব লোকজন এবং শেষে বন্দুক নিযে স্বযং বাযবাহাদুব বাগানে এলেন। চোব তখন ধুতি খুলে জুতো খুলে মই বেযে উঠছে। বাযবাহাদুবেব চোখে পডলো। চোব পুত্রবধূব ঘবে ঢুকছে। সবাই মিলে অন্দবে এসে পুত্রবধূব ঘবে ঢুকতেই দেখা গেল পুত্রবধূ মাটিতে মূর্ছা গেছে, চোব খাটেব ওপব লেপ মুডি দিযে শুযে। বাযবাহাদুব তাঁব বইযেব সম্ভাব্য দ্বিতীয সংস্কবণেব জন্যে সংশোধন কবে ছেলেব বযস কবলেন বাইশ, মেযেব বযস চোদ্দ। নিষিদ্ধ ফল খাওযাব জন্য গল্পেব মধ্যে হেমন্তকে কেন্দ্র কবে উপভোগ্য বিং জ্ঞাপক পাবস্থিতিব সৃষ্টি কবা হযেছে। ব্যক্তিত্ববান বাযবাহাদুব শেষ মুহূর্তে যদি ব্যক্তিত্ব ফলাতেন তাহলে গল্পেব পবিণতি সম্পূর্ণ বিপবীত বসেব হতে পাবতো। কিন্তু বযসেব স্বাভাবিক ধর্ম তিনি মেনে নিযেছেন বলেই অপ্রত্যাশিত মোড নিযে গল্পটি স্নিগ্ধ কৌতুকে শেষ হযেছে।

দাম্পত্য সম্পর্কেব উপবও একটি উল্লেখযোগ্য গল্প 'প্রেম ও প্রহাব'। বসময়ীব কাহিনী যেমন মধ্যবিত্ত সংসাবেব গল্প এ গল্প তেমনি পল্লীগ্রামেব খেটে খাওযা স্বামী-স্ত্রীব গল্প। বসমযাব গল্পে দাম্পত্য-কলহে স্বামী প্রায নীবব যা বলে ঠাণ্ডা মাথায মেক্ষম দু একটি কথা বলে স্ত্রীকে আবও ক্ষুবধাব হতে সাহায্য কবে। এ গল্পে স্বামী-স্ত্রী দুই সমান মুখব। গালাগালিব ভাষাব জোব এবং প্রত্যুত্তব-দেবাব ক্ষমতা দুজনেবই সমান। এমনি একটি ঝগডা একদিন মাবামাবিতে গিযে ঠেকলো। মোক্ষদাব মুখে লাগলো জ্বলন্ত কলকেব ঝালাস, ভজহবিব মাথায লাগলো সেই হুঁকোব খোল আব জাঠেব ঘা। থানায যাচ্ছি বলে ভজহবি বেবিযে গেল। মোক্ষদা স্বামীব জন্যে খাবাব নিযে বসে বইলো। ভজহবি ফিবলো না। পবদিন থানায গিযে মোক্ষদা শুনলে, এক মাঝি ধুতি আব গামছা বেখে গেছে। মোক্ষদা দেখলে তাব স্বামীবই পবনেব কাপড আব গামছা। মাঝিটি বাতে একটি লোককে জলে ঝাঁপ দিতে দেখেছে। পবে তাকে জাল ফেলেও খুঁজে পাযনি।

তাই ঘাটে পড়ে থাকা ধুতি-গামছা থানায় জমা দিয়েছে। এরপর থেকে বিধবা অল্পবয়সী মোক্ষদাকে গ্রামের যুবকরা বিরক্ত করায় একটি মেয়ের সঙ্গে কলকাতায় এসে উকিল গৃহস্থের বাড়িতে এসে মোক্ষদা ঝিয়ের কাজ নিয়েছে। বছর তিনেক বাদে উকিলবাবু তাঁর বন্ধু এ্যাটর্নিবাবুর সঙ্গে একবার মধুপুরে পাশাপাশি বাড়িতে চেঞ্জে গেলেন। একদিন সন্ধ্যাবেলা ঘরে মোক্ষদা দেখলে, এ্যাটর্নিবাবুর তামাকের গুড়গুড়ি হাতে স্বয়ং ভজহরির প্রবেশ। এ্যাটর্নিবাবুর কাছে ডুবন্ত ভজহরির উদ্ধার কাহিনী শুনলেন উকিলবাবু। মোক্ষদাও আড়ালে থেকে সব ঘটনাটা শুনলো। এর পর ভজহরি-মোক্ষদার দেখা সাক্ষাৎ হয় গোপনে। কিন্তু মোক্ষদা প্রকাশ্যে বলতে পাবে না ভজা তার স্বামী। ভজাও পত্নীবিয়োগে জলে ডুবে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল এ গল্প ফাঁদার পর বলতে পারে না মোক্ষদা তার স্ত্রী। ভজা তার স্ত্রীর এতদিনকার বৈধব্য যন্ত্রণার কথা ভেবে গোপনে তাকে মাছভাজা এনে খাওয়াতে লাগলো। এই অবস্থায় ভজা একদিন এ্যাটর্নিবাবুর বড় ছেলের কাছে পদাঘাত ও থাপ্পড় খেলো। তারপর দুজনকেই জেরা করে বাবুদের বিশ্বাস হলো তারা স্বামী-স্ত্রী। পদাহত ভজার কোমরে মালিশ করার অধিকারটাও মোক্ষদা পেলো। তারপর জমানো টাকা নিয়ে কলকাতা হয়ে দুজনে দেশে ফিরে শহরের অভিজ্ঞতায় দুধে জল মিশিয়ে ব্যবসা শুরু করলো। গল্পের মধ্যে দাম্পত্য-কলহের জোরালো সংলাপ, মধুপুরে ভজা-মোক্ষদার গোপন সাক্ষাৎ ও উথলে-ওঠা দাম্পত্য প্রেম, ভজার নির্যাতন ও জেরার পর স্ত্রীর ওপর অধিকারের ডিক্রি পাওয়া—এই সমস্ত সুপরিকল্পিত পরিস্থিতির কৌতুকময় বিন্যাস গল্পটিকে উপভোগ্য করেছে। বিশেষত খেটে খাওয়া মানুষের তীব্র দাম্পত্য-কলহ এবং দাম্পত্য-প্রেমের স্বাভাবিক বৈপরীত্যকে পাশাপাশি রেখে যেভাবে সহানুভূতির সঙ্গে সমস্যাটিকে তুলে ধরা হয়েছে তাতে কৌতুকের সঙ্গে কারুণ্যও মিশেছে।

'প্রতিজ্ঞাপূরণ' গল্পে 'বউ চুরি' গল্পের মতোই একটা তাত্ত্বিক ধারণার চমৎকার পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে একই রকম দক্ষ প্লটের সাহায্যে। এই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যেমন 'বউ চুরি' গল্পে মন্দাকিনীর অসুস্থতা, স্বামীর প্রতি নিষ্ঠা ইত্যাদি ব্যাপারগুলি অনাথের বিবাহোত্তর প্রেমের ধারণাকে ক্রমশ দৃঢ় করেছে এখানে তেমনি ইংরিজির ছাত্র অথচ পরাশর-সংহিতা-পড়া মুনি-ঋষি-মার্কা উসকো-খুসকো ভবতোষের সুন্দরী মেয়ের প্রতি বিতৃষ্ণাও দূর করা হয়েছে কলুদের কুৎসিত মেয়ে দেখিয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। যখন ভবতোষের মা সুন্দরী মেয়ের মা-কে ভবতোষের অদ্ভুত ধারণার কথা বলে তখন মেয়ের মা বলেছিল 'আমি সব ঠিক করে নেব।' এই মন্তব্যের আড়ালে কুৎসিত মেয়ে দেখিয়ে ছেলের মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির কৌশলটি লুকোনো ছিল। নিজের প্রতিজ্ঞাপূরণের চেষ্টায় ভবতোষ যখন কুৎসিত জগদম্বাকেই বিয়ে করবে ঠিক করেছে তখন দ্বিধাগ্রস্ত মনে ভবতোষ দুটি স্বপ্ন দেখেছে। একটিতে জগদম্বার মুণ্ডওয়ালা কালীর হাতে ভবতোষের ছিন্নমুণ্ড, আর একটিতে জগদম্বার মুণ্ডওয়ালা বেগুনি রঙের বোম্বাই শাড়ি-পরা মহিষের তাড়াখাওয়া ভবতোষ। তারপর ফুলশয্যার সময়ে সুন্দরী স্ত্রী যখন বললে 'কেমন জব্দ!' তখন থেকে

ভবতোষ কলকাতায় ফিরে গিয়ে চিঠি আসার আগেই পিয়নের সঙ্গে দেখা করতে লাগলো। এই গল্পটির মধ্যে আনুষঙ্গিক নানা কৌতুকের উপকরণ থাকলেও মেয়ে দেখানোর কৌশল এবং ভবতোষের মনের গভীরে তার ধারণার খুব ধীর কিন্তু কৌতুকময় মোক্ষম পরিবর্তন মূলত পরিস্থিতি রচনারই ফল।

খুব অল্পবয়সে কোনো মেয়ের সংস্পর্শে এসে মনে রঙ ধরলে কিশোর মনে কল্পনা, সংকোচ, ভয়. উদ্বেগ, নিস্পৃহতা এবং কাব্যিক আবেগ মিশে গিয়ে যে এক অদ্ভুত জটিল রোম্যান্টিক অনুভূতির সৃষ্টি করে তার চমৎকার ছবি আছে 'প্রণয় পরিণাম' গল্পে। দ্বিতীয় শ্রেণীর (এখনকার ক্লাস নাইন) ছাত্র মানিকের এই মানসকিতার সুযোগ নিয়ে তার পিসতুতো দাদা প্রভাস একটু বেশি অভিজ্ঞতার জোরে মানিককে উত্তেজিত করেছে। ভালোবাসার কথা ও বিয়ের কথা বললে কুসুম লজ্জায় পালিয়েছে। লজ্জা প্রণয়ের প্রথম পদক্ষেপ। দ্বিতীয় পদক্ষেপে চিঠিতে কুসুমের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ কবিতা। কবিতাটিতে ছেলেমানুষী কল্পনাকে কৌতুকময় করে তোলা হয়েছে। কবিতাটি কুসুম কিছু না ভেবেচিন্তে দিদির হাতে দিতেই বাড়িতে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। কুসুম বকুনি খেয়ে নিস্তার পেলো ঠিকই কিন্তু মানিকের দাদা মানিকের বাবার কাছে মানিকের 'লভে পড়ার' খবরটি দিতেই রক্তচক্ষু বাবার সামনে মানিকের ডাক পড়লো। তারপর গন্ডদেশে কয়েকটি চড় খেতেই প্রেম উবে গেল। তারপর কুসুমের বিয়েতে 'বিস্তর লুচি' খয়ে দুদিন অসুস্থ থেকে মানিক ভালো হয়ে উঠে 'বৃক্ষের শাখায় শাখায় লম্ফ দিয়া অতিবাহিত করিল।' এ গল্পে সুকৌশলী প্লট নেই, তার বদলে আছে অনভিজ্ঞ কিশোরের প্রেমস্বপ্ন এবং অপ্রত্যাশিত আঘাতে সে স্বপ্নের সমাধি। আঘাতের স্বাভাবিক বিস্মৃতি এবং কৈশোরের দুরন্তপনায় ফিরে যাওয়ার ব্যাপারটি বিষণ্ণ কৌতুকের সৃষ্টি করে অভিজ্ঞ রসিকের মনে।

'শখের ডিটেকটিভ' গল্পটিতে এক ডিটেকটিভ উপন্যাস-লেখকের অতিকল্পনা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা জটিল, পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। কিন্তু পরিস্থিতি ছাড়াও ডিটেকশনের জন্যে সমস্যা সৃষ্টি করতে হয়েছে বলে উত্তেজক পরিবেশ-সৃষ্টিরও প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কলকাতাবাসী ডিটেকটিভ উপন্যাসের লেখক গোবর্ধনবাবু বিয়ের সম্বন্ধের ব্যাপারে কথা বলতে এসে ফিরবার সময় শীতের রাত্রে ট্রেন ধরতে না পেরে গভীর রাত্রির ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করছেন স্টেশনের ছোটবাবুর ঘরে। ছোটবাবু একদল প্যাসেঞ্জারের ফেলে-যাওয়া একটি ডিটেকটিভ বই পড়ছিলেন যেটি গোবর্ধনবাবুরই লেখা। ডিটেকটিভ গল্পের লেখককে পেয়ে ছোটবাবু বইয়ের ভেতরকার একটা চিঠি দেখালেন যাতে পত্রলেখক 'শত্রু দুর্গ আক্রমণে'র সময় রাত দশটা বলে উল্লেখ করেছেন। লেখক মর্মোদ্ধারের কৃতিত্ব নেবার জন্যে পোস্ট অফিসের ছাপ দেখে ঠিক করলেন স্বদেশী ডাকাতির ব্যাপার, যে ডাকাতদের অন্তত একজন বৌবাজার অঞ্চলে থাকে। যাই হোক, স্বদেশী ডাকাতদের ধরবার জন্যে মুগ্ধ ও ভীতু ছোটবাবুর সাহায্য চাইলেন। পত্রলেখকের শত্রু দুর্গস্বরূপ শ্বশুরবাড়িতে যুদ্ধরূপ বিবাহের বরযাত্রীরা স্টেশনে এসে পৌঁছোলে তাদের এক সঙ্গী অদূরবর্তী আড়ত ঘরে অসুস্থ হয়ে শুয়ে আছে এই রকম ধোঁকা দিয়ে আড়তঘরে বন্দী করা হলো।

আড়তঘর থেকে খাটের নেওয়ারের মই নামিয়ে তারা যখন বেরোবার চেষ্টা করছে তখন স্টেশনে ঘুমন্ত গোবর্ধনকে না জানিয়ে ছোটবাবু আড়তঘরের তালা নিঃশব্দে খুলে দিয়ে এসেছিলেন। গোবর্ধন ঘুম থেকে উঠে ছোটবাবুর পরামর্শে যখন কলকাতার পুলিশের ইনস্‌পেকটার জেনারেলকে টেলিগ্রাম করার খসড়া করছেন তখন বাইরে গণ্ডগোল শুনে বেরিয়ে স্বদেশী ডাকাতরূপী বরযাত্রীদের তাড়া খেলেন। বনজঙ্গল ঘুরে আহত হয়ে ফিরে এসে ছোটবাবুর কাছে শুনলেন তারা কী দুঃসাহসের সঙ্গে আড়ত থেকে বেরিয়েছে। গোবর্ধন বরযাত্রীরা যে তাহলে স্বদেশী ডাকাত এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হলেন। কিন্তু ভয় পেলেন তাঁর নামটি যদি ছোটবাবু ফাঁস করে থাকেন। ছোটবাবু পাগল-টাগল বলে বাঁচিয়েছেন শুনে নিশ্চিন্ত গোবর্ধন কলকাতায় ফিরে ছোটবাবুকে তাঁর এক সেট গ্রন্থাবলী পাঠালেন 'আপনার চিরকৃতজ্ঞ গোবর্ধন' লিখে। গোবর্ধনবাবুর অতিকল্পনা এবং স্বদেশী ডাকাত ধরে দেবার গৌরব-কল্পনা যে জটিলতা এনেছিল, ছা-পোষা ভীতু ছোটবাবু সেই জট ছাড়াতে কিছুটা সাহায্য করেছেন, কিন্তু বরযাত্রীদের বুদ্ধি ও শ্রম শেষপর্যন্ত নিশ্চিন্ত গোবর্ধনকেই বিপদে ফেলেছে। এবং বিপদমুক্ত হবার গৌরবটি ছোটবাবু অনায়াসে নিয়ে এক সেট গোবর্ধন-গ্রন্থাবলী পেয়ে গোবর্ধনের চিরকৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। প্রভাতকুমারের স্বভাবসিদ্ধ প্লট রচনার অপ্রত্যাশিত চমক এখানেও সমান সক্রিয়।

'যুবকের প্রেম' গল্পটির প্লট তেমন ঘোরালো নয়, কিন্তু পরিবেশ ও পরিস্থিতি নতুন। মিশনারী কলেজের ছাত্র বিপত্নীক মহেন্দ্র গ্রামের একটি চেনা লোকের সঙ্গে কলকাতায় তার গদিতে এসে চাকরি-বাকরির চেষ্টায় থাকতে থাকতে ঘটনাচক্রে লাগাম ছেঁড়া ছুটন্ত বগি গাড়ি থেকে একটি ইংরেজ মহিলা ও দুটি শিশুকে বাঁচিয়ে সেই মহিলার স্বামী ফোর্ট উইলিয়ামের মেজরের সঙ্গে পরিচিত হয়। মেজর মহেন্দ্রের কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে তাকে চাকরি দেয় এবং তার কাছে বাঙলা শিখতে চায়। কিন্তু ক...জ ব্যস্ত হয়ে পড়ায় মেজরের স্ত্রীই বাঙলা শিখতে শুরু করে এবং দুজনেই পরস্পরের ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে। ইয়োরোপীয়সমাজে এই ঘনিষ্ঠতা নিয়ে কানাঘুষো চলতে থা...লে মেজরের কানে যায় এবং মেজর মহেন্দ্রকে বাড়িতে আসতে বারণ করে। কিন্তু দিন তিনেক বাদে মহেন্দ্রকে লেখা স্ত্রীর একটি চিঠি মেজরের হাতে পড়লো এবং মেজর স্ত্রীর অভিসার আটকবার জন্যে যথাসময়ে স্ত্রীকে বায়োস্কোপে নিয়ে গিয়ে হলে বসিয়ে নির্দিষ্ট নির্জন স্থানে অপেক্ষমান মহেন্দ্রকে দেখে গুলি করে মারতে গেল। কিন্তু গুলি করবার আগে মহেন্দ্র মেজরকে ধরাশায়ী করেছিল বলে প্রস্তুত হয়ে গুলি ছুঁড়তে গিয়ে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। বায়োস্কোপে ফিরে এসে ...জর স্ত্রীকে ঘটনাটি জানালোই না। পরদিন মহেন্দ্র চাকরি ছেড়ে দেশে ফিরলো। এবং পরের মাসেই গ্রামের একটি মেয়েকে বিয়ে করে ফেললো। বছর দুই পরে গ্রামের লাইব্রেরিতে ইংরিজি কাগজে বিলিতি কাগজ থেকে উদ্ধৃত একটি খবরে মহেন্দ্র পড়লো ভারতীয় সেনাবিভাগের মেজর গ্রীন লণ্ডনে এল্‌সির সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ করেছেন এবং টার্নার নামে একটি যুবকের বিরুদ্ধে হাজার পাউণ্ডের খেসারত ডিক্রি পেয়েছেন। গল্পের মধ্যে এল্‌সির সঙ্গে মহেন্দ্রের ঘনিষ্ঠতার কৌতুকময় রোম্যান্টিক সংলাপ

যেমন উপভোগ্য তেমনি মহেন্দ্রের প্রতি মেজরের চাপা ক্রোধ ও মহেন্দ্রকে গুলি করার উত্তেজনাময় দৃশ্যটিও উপভোগ্য। সংবাদপত্রের খবরে লণ্ডনে গিয়ে বুড়ো মেজরের তরুণী স্ত্রীর নতুন করে প্রেমে পড়ে মেজরের সঙ্গে বন্ধন ছিন্ন করার সংবাদটিও এল্‌সির চরিত্র বুঝতে সাহায্য করে। প্লটের চাতুর্য না থাকলেও সংলাপের চাতুর্যে এবং মেজর ও এল্‌সির চরিত্রবৈশিষ্ট্য গল্পটিতে একটু নতুন স্বাদ এনে দিয়েছে। বাঙালী বিপত্নীক তরুণ ও বিবাহিত ইংরেজ তরুণীর প্রেম সেকালের পাঠকের কাছে যেমন স্বাদের নতুন মাত্রা এনেছিল, একালের পাঠকের কাছেও দুজনের ঘনিষ্ঠতার ক্রমবিকাশটি কৌতুকের ঔজ্জ্বল্যে কম আকর্ষণীয় নয়।

আরম্ভে পতিসেবায় অধীর স্ত্রীর চিঠি পেয়ে পোস্টমাস্টার নলিনী পুজোর ছুটি নিয়ে দাম্পত্য মিলনের অপেক্ষায় থাকলেও 'বলবান জামাতা' গল্পটি মিলনের আগেকার জটিলতাতেই জমে উঠেছে। যে বিদূষী শ্যালিকা বিয়ের সময় শ্লেষ করে নলিনীর নবনীতকোমল চেহারাটি নিয়ে পদ্য লিখেছিলেন তিনি পুজোর সময় শ্বশুরালয় এলাহাবাদে আসার খবর পেয়ে নলিনীর শ্বশুরালয় যাবার আগ্রহ আরও বেড়েছে। অবিস্মরণীয় সেই শ্লেষের ঘা খেয়ে নলিনী ব্যায়াম করে ও খাদ্য তালিকার পরিবর্তন করে চেহারাটাকে পুরুষোচিত 'চোয়াড়ে' করে নিয়ে এলাহাবাদে পৌঁছে একই নামের আরেক বাড়িতে গিয়ে উঠেছে। প্রথমটা 'জামাই'-খাতির পেলেও আগন্তুক নলিনীর সঙ্গে সম্ভাব্য শরতের চেহারা যখন মিললো না তখন অন্দরমহলের হুলুস্থুলের মধ্যে নলিনী আলমারির বইতে নামলেখা 'মহেন্দ্রনাথ ঘোষ' দেখে বুঝলে এ বাড়ি তার শ্বশুর মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নয়। ইতিমধ্যে উকিলদের আড্ডায়, যেখানে দুই মহেন্দ্রই বসেন, সেখানে খবর যেতেই মহেন্দ্র ঘোষ ছুটে এসেছেন। নলিনী তখন চোয়াড়ে চেহারায় সে বাড়ির চোখে লাঠি-বন্দুক-হাতে 'ডাকু।' যাই হোক, নলিনী ক্ষমা চেয়ে এবার আসল শ্বশুর বাড়িতে এলো। শ্বশুর ততক্ষণে ফিরেছেন। জামাই এসেছেন শুনে তিনি দেখেন যণ্ডামার্কা একটি লোক বন্দুক নামাচ্ছে। তখুনি মহেন্দ্র ঘোষের বাড়িতে জামাই বেশে ডাকাত পড়ার কথা মনে পড়লো। ভৃত্যেরা আক্রমণ করলে নলিনী লাঠি ঘুরিয়ে তাদের ঠেকিয়ে নিজের পরিচয় দিয়েও বিফল হলো। অগত্যা সে স্টেশনে চলে গেলে গৃহিণীর কাছে নলিনী আসবার কথা শুনে এবং টেলিগ্রাম দেখে মহেন্দ্র বুঝলেন, 'মির্জাপুরী গুণ্ডা' আসলে নলিনী। অনুতপ্ত হয়ে তিনি স্টেশন থেকে তাকে নিয়ে এলেন। নলিনী কিন্তু গায়ের ঝাল মেটালো না। লজ্জিত অনুতপ্ত শ্বশুরবাড়িই তার পক্ষে যথেষ্ট। চমৎকার কৌশলে গল্পের মধ্যে যে 'ভ্রান্তিবিলাস' সৃষ্টি করা হয়েছে তাতে শুধু নামের ভুল নয়, নলিনীর নিজের চেহারার বিপুল পরিবর্তনও দায়ী। হয়তো সেই জন্যেই নলিনী সমস্ত ব্যাপারটাকে ক্ষমা করেছে। কিন্তু শুধু কি তাই? যে 'দুঃখিনী' তার 'আশাপথ চেয়ে' বসে আছে বলে চিঠি লিখেছিল গল্পের সূচনায়, তাকে পেয়েও নিশ্চয় নলিনীর সহ্যশক্তি বেড়ে গেছে। এই গভীর সুরটি লঘু হাস্যের পরিবেশে মিশে গিয়ে গল্পরসে ভারসাম্য এনেছে।

এই দশটি গল্প হয়তো প্রভাতকুমাবেব গল্পবচনা- প্রতিভাব পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব কবে না, কিন্তু মোটামুটি তাঁব গল্প বলাব দক্ষতাব পবিচয দেয । গল্পগুলি থেকে সূত্রাকাবে সেই পবিচয দিতে গেলে বলতে হয

সমাজ ব্যবস্থাব প্রতি তীব্র বিদ্রূপ প্রভাতকুমাবেব স্বভাব নয, ব্যতিক্রম দুটি-একটি আছে ।

সামাজিক ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ব্যক্তিস্বভাবকে কৌতুক-কটাক্ষ কবেই প্রভাতকুমাব গল্পবচনাব আর্টকে উপভোগ্য কবাব চেষ্টা কবেছেন জটিল সমস্যা সৃষ্টি কবে তাব জট খুলেছেন চবিত্রেব সংযম ক্ষমাশীলতা বা প্রতিবাদী মনোভাবেব সাময়িকতা দেখিয়ে কিংবা প্লটেব চাতুর্যেব সাহায্যে ।

উদ্দাম কৌতুক-কল্পনায প্রভাতকুমাবেব স্বভাব নয, কৌতুক শ্লেষ, বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মোক্ষম স্ল্যাঙ ব্যবহাবেব ক্ষমতা, বাঙলা-হিন্দীব মিশ্রবুলি কিংবা ভোজপুবী হিন্দীব নিপুণ প্রযোগ ইত্যাদিব সাহায্যে সিচুয়েশন বা পবিস্থিতি সৃষ্টিই তাঁব মূল লক্ষ্য ।

পবিস্থিতি বচনাব বৈচিত্র্যও প্রভাতকুমাবেব গল্প বচনাব বৈশিষ্ট্য তাঁব খুব কম গল্পে একজাতীয পবিস্থিতি কিংবা প্লট লক্ষ্য কবা যায । এই সংকলনেব দশটি গল্পেব সংক্ষিপ্ত গল্পবেখা থেকেই এই বৈচিত্র্যেব আন্দাজ কবা যাবে । গল্পেব অতি দীর্ঘ আযোজন প্রভাতকুমাবেব বৈশিষ্ট্য নয । যথাসম্ভব সংক্ষেপে চবিত্র-পবিচয দিযে মূল গল্প সমস্যায চলে আসেন তিনি । গল্পেব মধ্যেও বর্ণনাব চেযে সংলাপেব দিকেই তাঁব ঝোঁক । নাবী পুরুষ শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকলেবই সংলাপে শব্দ ব্যবহাবে ও স্ববভঙ্গিতে তাঁব প্রশংসনীয দক্ষতা গল্পেব গতিকে ক্ষিপ্রতব কবে । নিখুঁত পবিমিতবোধে আধুনিক গল্পেব আর্ট ছিল তাঁব আযত্তে ।

গল্পেব শেষেও তাঁব সহানুভূতিপূর্ণ শ্লেষ-কৌতুক বজায থাকে অনেক সমযেই তাঁব শ্লেষ কৌতুক বিবেব আচবণেব বুদ্ধিদীপ্ত বর্ণনায বা চবিত্রেব মুখে বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্যে ঝলসে ওঠে বলবান জামাতা বসমযাব বসিকতা কিংবা নিষিদ্ধ ফল বা শখেব ডিটেকটিভ গল্পেব শেষ অনুচ্ছেদগুলিতে এই দক্ষতাব নিঃসংশয প্রমাণ পাওয়া যাবে চবিত্রেব প্রতি সহানুভূতি প্রভাতকুমাবেব শ্লেষ কৌতুক ও সক্ষ্ম কৌশলকে নিছক চাতুর্য কিংবা তীব্র বিদ্রূপেব হাত থেকে অনেক সমযেই বক্ষা কবেছে এবং সাময়িকতাব উর্ধ্বে তুলে দিযেছে । যাঁবা বিদেশী গল্প পড়েন তাঁবা দেখবেন পার্থক্য থাকলেও এই জাতীয পবিচ্ছন্ন ক্ষিপ্রগতিব সুপবিকল্পিত প্লটে, কৌতুকোজ্জ্বল নিটোল গল্প 'সাকি' ছদ্মনামেব এইচ এইচ মুনবো কিংবা ও'হেনবিব হাত থেকেই বেবিযেছে । যদিও তাঁদেব অনেক বিখ্যাত গল্পে পবিণতিব চমক থাকলেও প্রভাতকুমাবেব সহানুভূতিব স্নিগ্ধ দাক্ষিণ্যেব অভাব চোখে পড়ে ।

উজ্জ্বলকুমাব মজুমদাব

বউচুরি

যে সময়ে নব্য-বঙ্গে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইবার একটা ভারি ধুম পড়িয়া গিয়াছিল সেই সময়ের কথা বলিতেছি।

মহামায়া বর্দ্ধমান জেলার একটি সুনিবিড় পল্লীগ্রাম। সুনিবিড় অর্থাৎ রেলওয়ে স্টেশন হইতে কুড়ি মাইল এবং পোস্ট অফিস হইতে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত। গ্রামের মধ্যভাগে দেবী মহামায়ার একটি বিগ্রহ স্থাপিত আছে—সেই হইতে ইহার নামোৎপত্তি।

এই ক্ষুদ্র গ্রামটির একটি ক্ষুদ্র জমিদার আছেন তাঁহার নাম বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার মধ্যম পুত্র মন্মথনাথ বি-এ পরীক্ষা দিয়া কয়েক দিন হইল বাড়ি আসিয়াছে। ছেলেটির বয়স বাইশ বৎসর হইবে, বেশে পারিপাট্য আছে, চেহারাটি মন্দ নহে। কিন্তু পিতা তাহার উপরে কয়েকটি কারণে অত্যন্ত চটা। প্রথমত সে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিয়া থাকে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়ত গৃহে ষোড়শী স্ত্রী রহিয়াছে, কিন্তু সে তাহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ পর্যন্ত করে না। তাহার কারণ কী জান? সে বলে, যাহাকে আমি ভালবাসিয়া বিবাহ করি নাই, সে আমার স্ত্রী নহে, ভগিনী। যদি জিজ্ঞাসা কর, উহাকে বিবাহ করিলে কেন? সে বলিবে, যখন বিবাহ করিয়াছিলাম, তখন আমার এ সমস্ত মতাদি ছিল না। বালিকার দশা কি হইবে জিজ্ঞাসা করিলে বলে, আমরা উভয়ে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইব তাহার পর ব্রাহ্মবিবাহের যে নূতন আইন বিধিবদ্ধ হইতেছে, সেই আইন অনুসারে আমাদের বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিব, ও তখন ভালবাসিয়া আর যাহাকে ইচ্ছা স্বামিত্বে বরণ করিতে পারিবে।

বিবাহের পর কলিকাতায় গিয়া অনাথশরণের একটি প্রাণের বন্ধু জুটিয়াছিল, তাহার নাম হেমন্তকুমার সিংহ। সে দীক্ষিত ব্রাহ্ম। তাহার সহিত বন্ধুত্ব সূত্রপাতের অল্পকাল পরেই অনাথের মনে ধারণা জন্মিল যে, সে হেমন্তকুমারের দূরসম্পর্কীয়া ভগিনী নগেন্দ্রবালাকে ভালবাসে। মনের এই চপলতায় প্রথমে অনাথ অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু হেমন্তকুমার তাহাকে সান্ত্বনা দিল। সে বলিল, ভালবাসা একটি ঐশ্বরিক শক্তির বিকাশ, কোনও অবস্থাতেই তাহাতে পাপ স্পর্শিতে পারে না। বিশেষত হেমন্তকুমারের প্রবল বিশ্বাস, প্রেম-সম্পর্ক-বিহীন পূর্বরাগ-বর্জিত বিবাহ বিবাহই নয়। অনাথ মন্দাকিনীকে ভালবাসিয়া বিবাহ করে নাই, সুতরাং সে তাহার স্ত্রী নহে ভগিনী, এই অদ্ভুত মত হেমন্তই অনাথের মস্তিষ্কে প্রবেশ করাইয়াছে। নগেন্দ্রবালাও যে অনাথের প্রতি প্রণয়শালিনী, ইহাও দুই বন্ধু অনুমান করিয়া লইয়াছে। এই বিবাহ হইলেই যথার্থ আদর্শ বিবাহ হয়, ইহাই হেমন্তকুমারের মত। কিন্তু অনাথের তথাকথিত স্ত্রী বর্তমানে তাহা অসম্ভব। নগেন্দ্রবালার প্রতি প্রণয় ব্যক্ত করিবার অধিকার পর্যন্ত অনাথের নাই। হেমন্ত প্রায়ই বলিত—প্রাণে প্রাণে যোগ, আত্মায় আত্মায় মিলন ইহাই ভালবাসার চরম সফলতা,—বিবাহ নাই হইল। কিন্তু নূতন ব্রাহ্মবিবাহ আইন হইবার কথা উঠা পর্যন্ত, তাহারা অন্যরূপ পরামর্শ করিয়াছে।

মধ্যাহ্নকাল বিগতপ্রায়। জ্যৈষ্ঠ মাসের আম-পাকানো রৌদ্র বাহিরে ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। অনাথশরণ বহির্বাটীর কক্ষে ডেস্কের সম্মুখে চেয়ারে উপবিষ্ট। এই কক্ষটি তাহার নিজস্ব। এইখানেই রাত্রে শয়ন করে। ভিত্তিগাত্রে কয়েকখানি বিলাতী ছবির সঙ্গে একটি একতারা টাঙ্গানো, প্রভাতে ও সায়াহ্নে এইটি বাজাইয়া সে ব্রহ্মসংগীত করিয়া থাকে। গৃহসজ্জার মধ্যে একটি ক্লক, একটি আলমারি, একটি আলনা এবং শয়নের খাট ছাড়া কিছুই নাই।

ডেস্কের ভিতর হইতে অনাথ হেমন্তকুমারের একখানি সদ্য-প্রাপ্ত চিঠি বাহির করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। তাহার যেখানে যেখানে নগেন্দ্রবালার নাম ছিল, সেখানে সেখানে চুম্বন করিল। চিঠি রাখিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, কী যেন ধ্যান করিতে লাগিল। ঠং ঠং করিয়া ঘড়িতে দুইটা বাজিয়া গেল।

অনাথ তখন ধীরে ধীরে চক্ষু খুলিয়া, পত্রখানি খামে বন্ধ করিল। এক টুকরা কাগজ লইয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া লিখিল—

"আজ রাত্রি বারোটার পর সকলে নিদ্রিত হইলে তুমি একবার আমার ঘরে আসিও।"

লিখিয়া, কাগজখানিকে পাকাইয়া গুটাইয়া ছোট করিল। পূর্বকথিত খামসুদ্ধ চিঠিখানি ডেস্কে বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখে, অঙ্গন জনশূন্য। প্রথম কক্ষে, তাহার বউদিদি কয়েকজন সখীকে লইয়া তাস খেলিতেছেন। দ্বিতীয় কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, পালঙ্কের উপর জননী নিদ্রামগ্না। কুলুঙ্গীর কাছে তাহার বালক ভ্রাতুষ্পুত্রটি দাঁড়াইয়া চুরি করিয়া কুল-আচার ভক্ষণ করিতেছে। কাকাকে দেখিয়া সে অপ্রতিভ হইয়া হাসিয়া ফেলিল। কাকা তাহার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া সে

স্থান ত্যাগ করিয়া গেলেন। তৃতীয়টি পূজার ঘর; নারায়ণশিলা আছেন; মূর্তিবিদ্বেষবশত ইদানীং অনাথশরণ এই কক্ষে প্রবেশ করিত না। বাহিরে দাঁড়াইয়া দেখিল, তাহার স্ত্রী মন্দাকিনী মেঝের উপর বঁটি পাতিয়া বসিয়া তেঁতুল কাটিতেছে। দক্ষিণ হস্তের কাছে কলার পাতার উপর কতকটা কাটা তেঁতুল; বঁটির নিম্নে একরাশি কাঁইবীচি ছড়ান। মন্দাকিনীর ওষ্ঠাধর তাম্বুলরাগরঞ্জিত; কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম; অঞ্চলাগ্র গলায় জড়ানো। মন্দা আপন মনে হেঁট হইয়া তেঁতুল কাটিতেছিল, স্বামীকে দেখিতে পায় নাই। অনাথ প্রায় এক মিনিটকাল বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। বিবাহের পর এই সে প্রথম মন্দাকে ভাল করিয়া দেখিতেছে।

উঠানে আমগাছের শাখা হইতে একটা পাকা আম বাতাসে পড়িয়া গেল। সেই শব্দে মন্দা চমকিয়া বাহিরের পানে চাহিল—দেখিল বারান্দায় স্বামী দাঁড়াইয়া। তৎক্ষণাৎ সে বঁটি ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। আধহাত পরিমাণ ঘোমটা টানিয়া জানালার কাছে সরিয়া দাঁড়াইল। তাহার অঞ্চলবদ্ধ চাবিগুলি ঝিন্ ঝিন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল।

অনাথ মৃদুপদক্ষেপে ঘরে প্রবেশ করিল। মন্দাকিনীর পা লক্ষ্য করিয়া পাকানো কাগজখানি ছুঁড়িয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে মন্দা কাগজখানি কুড়াইয়া লইল। প্রথমত দুয়ারটা বন্ধ করিয়া দিল। জানালার কাছে আসিয়া কাগজখানি খুলিয়া পাঠ করিল। তাহাব পর বাহিরে চাহিল। একটা আমগাছে কাঁচা পাকা অসংখ্য আম ধরিয়া রহিয়াছে। তাহার ভিতরে বসিয়া কোকিল ডাকিতেছে। অনেক দূরে ঘুঘু ডাকিতেছে। আবার কাগজখানি পড়িল; আবার আমগাছ পানে চাহিল। গাছের ফাঁকে আকাশ দেখা যাইতেছে। মন্দা কাগজখানি বুকে চাপিয়া ধবিল। গলবস্ত্র হইয়া নারায়ণশিলার সম্মুখে উপুড় হইয়া পড়িয়া প্রণাম করিতে লাগিল। উঠিয়া আবার জানালার কাছে গিয়া কাগজখানি পাঠ কবিল।

আজ তাহার জীবনের কী দিন! বিবাহের পর এই প্রথম স্বামী তাহাকে সম্ভাষণ করিলেন। জ্বরগায়ে মন্দার বিবাহ হইয়াছিল; ফুলশয্যা হইতে পায় নাই। যে তিনদিন শ্বশুরবাড়িতে ছিল, স্বামীর সাহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। তখন সে তেরো বৎসরের। মাঝে একবার আসিয়া কয়েক মাস ছিল, তখন অনাথের নূতন "মতাদি" হইয়াছে। পরিজনবর্গের বহু আকিঞ্চন সত্ত্বেও অনাথ অন্তঃপুরে শয়ন করে নাই। এবার রাগ করিয়া তাহাকে কেহ বাটীর ভিতর আনিবার চেষ্টা করে নাই। অনাথের মাতা প্রতিদিনই নবীনাগণকে এ বিষয়ে অনুরোধ করিতেন। কেহ কর্ণপাত করিত না। এতদিনে স্বামীর কী মনে পড়িয়াছে? মন্দার এ জীবনটা তবে কি বিফল হইবে না? তাহার আত্মীয়াগণের, সখীদের স্বামীর ভালবাসার কথা সোহাগের কথা শুনিয়া শুনিয়া তাহার বুক ফাটিয়া যাইত। মনে হইত, কী পাপ সে করিয়াছে যাহাব জন্য ঈশ্বর তাহাকে এমন করিয়া শাস্তি দিতেছেন? এইবার কী সে সব দুঃখ তবে দূর হইবে?

হঠাৎ মন্দাকিনীর চিন্তাস্রোত বাধাপ্রাপ্ত হইল। অর্গলিত দুয়ারে বাহির হইতে

কে গুম্ গুম্ করিয়া কিল মারিতেছে।

ব্যস্ত হইয়া মন্দাকিনী দুয়ার খুলিয়া দিল। তাহার ছোট ননদ হরিমতি। হরিমতি বালবিধবা। আজ পাঁচ বৎসর হইল তাহার এ দশা ঘটিয়াছে। হরিমতি মন্দার অপেক্ষা তিন বৎসরের বড় ; তবু দুইজনে খুব ভাব। দুইজনে দুইজনের সকল সুখদুঃখের ভাগী।

মন্দাকে দেখিয়া হরিমতি চমকিয়া বলিল, "তোর কী হয়েছে লা ?"

মন্দা ধীরে ধীরে উত্তর করিল, "হবে আবার কী ?"

"দোর বন্ধ করে কী করছিলি ?"

মন্দা চুপ করিয়া রহিল। তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া হরিমতির ভারি সন্দেহ হইল। সে মন্দার গলাটি জড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কী হয়েছে বলবিনে ভাই ?"

"বলব।"

"কখন বলবি ?"

"রাত্তিরে।"

"না এখন বল্।"

মন্দাও বলিবে না হরিমতিও ছাড়বে না। শেষে মন্দা বলিল।

শুনিয়া হরিমতি প্রথমটা চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর অল্প অল্প হাসিতে লাগিল।

মন্দা জিজ্ঞাসা করিল, "হাসছিস কেন ভাই ?"

হরিমতি বলিল, "হাসছি তোর বরটির রকম দেখে। আমি যা ভেবেছিলাম তাই। এবার এসে অবধি ছোড়দার উসখুস্ করে বেড়ান হচ্চে। বলেওছিলাম বড় বউদিকে।"

"কী বলেছিলি ?"

"বলেছিলাম, ওগো এবার হয়ত ছোড়দার মন হয়েছে। এবার তোমরা চেষ্টা করে দেখ, এবার হয়ত ঘরে আসবেন। তা বউদিদি বললেন—মন হয়েছে ত আসুক না, আমি কী বারণ করেছি নাকি ? আমি বললাম—এতদিন আসেননি, এখন আপনা হতে কী আসতে পারেন ? লজ্জা করে হয়ত। তিনি বললেন—সেবার অমন ক'রে আমাদের অপমান করলে, আবার আমি সাধতে যাব ? আমি তেমন মেয়ে নই। যেমন কর্ম তেমনি ফল ! দু মাস ত ছুটি আছে। ভুগুক, জব্দ হোক।"

মন্দা বলিল, "আমি কিন্তু ভাই যেতে পারব না।"

"কেন ?"

"সে আমার ভারি লজ্জা করবে।"

হরিমতি হাত নাড়িয়া বলিল, "ওলো দেখিস ! কচি খুকিটি কিনা ! বরের কাছে যেতে লজ্জা করবে ! কতক্ষণে যাবি, ঘণ্টা গুনছিস, তাই বল্। মুখে আর ন্যাকামো করতে হবে না।"

মন্দা বলিল, "না ভাই, ঠাট্টা রাখ্। আমার ভয় হচ্চে।"

"প্রথম দিনটে ভয় হতে পারে। তা একদিন বই ত নয়।"

"রোজ রোজ আমি যাব বুঝি ? তা হলে একদিন ধরা পড়তে হবে না ?"

"ধরা না পড়লে আর উপায় কী ভাই ? একদিন লজ্জা ত ভাঙ্গতেই হবে ?"

"তার চেয়ে তুই বরং বউদিদিকে বল্‌গে আর একবার। তিনি যা হয় করবেন।"

"আচ্ছা তা বলব ; কিন্তু আজকের দিনটা চুরি করেই তোদের দেখা হোক ! দেখিস চুরির কাঁচা আমটা পেয়ারাটাব মতন চুরির সব জিনিসই বড় মিষ্টি।"

॥ ২ ॥

"ছোটবউ, ও ছোটবউ, ঘুমুলি ভাই ?"

রাত্রে শয্যায় হরিমতি মন্দাকিনীকে ডাকিল। মন্দাকিনী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। জিজ্ঞাসা কবিল, "বারোটা হয়েছে ?"

"বারোটা ছেড়ে এই একটা বাজলো ছোড়দাব ঘড়িতে।"

"তুমি বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছিলে ?"

"নাঃ—আমার চোখে কি আর ঘুম আছে ? যত ঘুম তোর। যার বিয়ে তার হুঁকা নেই, পাড়া পড়শীর ঘুম নেই।"

এই কথা বলিয়া হরিমতি প্রদীপ জ্বালিল। আলনা হইতে একখানা ধোয়া দেশী শাড়ি পাড়িযা বলিল, "নে এইখানা পব।"

মন্দা বলিল, "না ভাই, আব অততে কাজ নেই।"

হরিমতি বলিল, "দূব ছুঁড়ি, এই ময়লা কাপড় প'রে বুঝি যায় ?" বলিয়া মন্দার আঁচল ধবিয়া টান দিল ; তখন মন্দা হরিমতির আদেশ পালন করিতে পথ পাইল না।

কাপড় পরা হইলে হরিমতি বলিল, "বল, এগিয়ে দিয়ে আসতে হবে নাকি ?"

মন্দাকিনী একটা প্রচলিত দেশীয় ঠাট্টা করিতে যাইতেছিল, কিন্তু সামলাইয়া লইল। কাবণ এ সময় হারমতিকে রাগানো সুবুদ্ধির কর্ম হইবে না। সুতরাং বলিল, "নইলে আমি বউ মানুষ একলা যাব নাকি ?"

দুইজনে দুয়াব খুলিয়া বারান্দায় বাহির হইল। নিস্তব্ধ জ্যোৎস্না রাত্রি। মন্দাকিনীর পায়ে মল ছিল, ঝম ঝম্ কবিতে লাগিল। হরিমতি সে শব্দে চমকিয়া বলিল, "আ মবণ ! মল চারগাছা খুলিসনি ? ভাবে বিভোর হয়েছিস যে !"

মন্দাকিনী মল খুলিয়া বালিশের নিচে রাখিয়া আসিল। তাবপর দুইজনে বৈঠকখানা অভিমখে চলিল। কাছাকাছি পর্যন্ত গিয়া হরিমতি মন্দাকিনীর কানে কানে বলিয়া দিল, "দোর ভেজিয়ে রাখব ; আস্তে আস্তে সাবধানে আসিস এখন।" বলিয়া—সে ফিরিয়া গেল।

মন্দা ধীরে ধীরে সিঁড়ি চাবিটি ভাঙ্গিয়া স্বামীর ঘরেব বারান্দায় উঠিল। দুয়ারের ফাঁক দিয়া দেখিল, আলো জ্বলিতেছে। প্রবেশ করিতে তাহার অত্যন্ত ভয় হইতে লাগিল। বুকটি দুর্ দুর্ করিতে লাগিল। পা আর উঠে না। শেষে সাহসে ভর করিয়া দুয়ারটি নিঃশব্দে খুলিয়া প্রবেশ করিল।

দেখিল, মাথার শিয়রে বাতি জ্বালিয়া স্বামী নিদ্রা যাইতেছেন।

পিছু ফিবিযা দুযাব বন্ধ কবিযা মন্দাকিনী খিল দিল। বাতিটা নিবাইযা দিল। ঘবে জ্যোৎস্না প্রবেশ কবিযাছিল, এখন তাহা যেন হাসিযা উঠিল। স্বামীব বিছানায, স্বামীব মুখে জ্যোৎস্না পডিযাছে। মন্দা দাঁডাইযা অনেকক্ষণ সেই সুপ্ত মুখখানি দেখিল, ভাবিল—ইনি আমাব স্বামী! আমাব স্বামী ত বড সুন্দব।

এইরূপে এক মিনিট অতিবাহিত হইল। মন্দা মনে মনে বলিল, "বেশ মানুষ ত! লোককে ডেকে এনে নিজে দিব্যি কবে নিদ্রে হচ্ছে।"

কী কবিবে কিযৎক্ষণ ভাবিল। শেষে স্থিব কবিল, কখনও ত পদসেবা কবিতে পাই নাই, এই প্রথম সুযোগ ছাডি কেন?

তখন সে সন্তর্পণে স্বামীব পদতলে উপবেশন কবিযা, পাযে হাত বুলাইতে লাগিল। আবামে অনাথশবণেব নিদ্রা গভীবতব হইল। জানালা দিযা মিঠা মিঠা দক্ষিণা বাতাস আসিতেছে। এই ভাবে কিযৎকাল—প্রায আধ ঘণ্টা—কাটিলে, মন্দা স্বামীব পাযেব কাছে শুইযা ঘুমাইযা পডিল।

দুইটা বাজিবামাত্র অনাথেব নিদ্রাভঙ্গ হইল। চেতনা প্রাপ্তিব প্রথম কযেক মুহূর্ত অনুভব কবিল, তাহাব মন যেন কিসেব প্রতীক্ষায ব্যাপৃত বহিযাছে। ক্রমে স্মবণ হইল আজ মন্দাকিনীকে আসিতে বলিযাছে, যতক্ষণ জাগিযাছিল, তাহাবই প্রতীক্ষা কবিতেছিল। যখন সাডে বাবোটা হইযা গেল, তখন মন্দাকিনী আসিবে না বুঝিযা শযন কবিযাছে। এই ভাবিতে ভাবিতে পার্শ্ব পবিবর্তন কবিল। অমনি তাহাব পা মন্দাকিনীব গাযে ঠেকিল। কোমল স্পর্শে অনাথ বিস্মিত হইযা উঠিযা বসিল। দেখিল মন্দাকিনী ঘুমাইতেছে। জ্যোৎস্না তখন সবিযা গিযাছে, মন্দাকিনীব মুখখানিব উপব পডিযাছে। সেই আলোকে অনাথ সুপ্তিমগ্না নবযৌবনা পত্নীকে দেখিতে লাগিল। বড সুন্দব বলিযা মনে হইল। ঠোঁট দু'খানি এক একবাব কাঁপিযা উঠিতেছে, মন্দা বুঝি তখনও স্বপ্ন দেখিতেছিল?

স্ত্রীব মুখপানে চাহিযা অনাথ ভাবিতে লাগিল, এ বড সুন্দব ত! এ যেন নগেন্দ্রবালাব চেযেও সুন্দব। দুই তিন মিনিট এই ভাবে কাটিলে অনাথ সহসা মুখ ফিবাইযা লইল, চক্ষু বুজিযা অস্ফুটস্ববে বলিল, "হে ঈশ্বব, আমাব হৃদযে বল দাও।"

চন্দ্রালোক হৃদযে দুর্বলতা আনযন কবে ভাবিযা অনাথ তাডাতাডি বাতিটা জ্বালিযা ফেলিল। কেবোসিনেব তীব্র আলোকে মনে হইল বুঝি স্বপ্নজডিমা ভাঙ্গিযা গিযাছে। মন্দাকিনীব পাযে হাত দিযা তাহাকে জাগাইল।

মন্দা উঠিযা অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইযা পডিল। কাপডচোপডগুলা কিছুতেই যেন আব বাগ মানে না। অনেক চেষ্টাব পব, বীতিমত ঘোমটা দিযা অনাথেব পানে একবাব আডচোখে চাহিযা মুখ নত কবিযা বসিল।

অনাথ ডাকিল, "মন্দাকিনী।"

মন্দা নিমেষমাত্র কাল ঘোমটাব ভিতব হইতে অনাথেব পানে দৃষ্টিপাত কবিযা আবাব চক্ষু নামাইল।

"মন্দাকিনী আজ তোমায কেন ডেকেছি জান?"

মন্দা ঘাড় নাড়িয়া বলিল সে জানে না।

অনাথ বলিল, "তবে শোন। আমার সঙ্গে তোমায় কলকাতায় যেতে হবে। যাবে ?"

মন্দা উত্তর করিল না।

অনাথ বলিল, "যাবে কী ?"

অতি মৃদুস্বরে মন্দা বলিল, "আমাকে যেখানে নিয়ে যাবে সেইখানে যাব।'

"আমার বাপ মার অমতে অজানতে। যেতে পারবে ?"

মন্দা কোনও উত্তর করে না।

অনাথ বলিল, "কথা কও। এখন লজ্জার সময় নয়। যেতে পারবে ? বল।"

মন্দা বলিল, "মা বাপের অজানতে কেন ? তাঁদের অনুমতি নাও না। এখন ত সকলেই বিদেশে স্ত্রী নিয়ে যাচ্চে।'

"সে প্রস্তাব আমি হারু কাকাকে দিয়ে করিয়েছিলাম। বাবার মত নেই। বলেছেন--ওর এখন মতিগতির স্থিরতা কি ? নিজে যে চুলোয় ইচ্ছে হয় সেই চুলোয় যাক। বাড়ির বউটাকে যে জুতো মোজা পরিয়ে ব্রাহ্মসমাজে নিয়ে যাবে, সে আমি বেচে থাকতে দেখতে পারব না।"

"তুমি আমায় ব্রাহ্মসমাজে নিয়ে যাবে সত্যি কী ?"

"আমরা দু'জনে পবিত্র ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হব।"

মন্দাকিনী প্রমাদ গণিল। স্বামী কী রহস্য করতেছেন ? বলিল, "আমি ঠাকুর দেবতা মানি, কি ক'রে ব্রহ্মজ্ঞানী হব ?'

অনাথ রীতিমত গাম্ভীর্যের সহিত বলিল, "ও সকল বিশ্বাস তোমায় পরিত্যাগ করতে হবে। ওসব ভুল। আমি কী ক'রে এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করি ?"

"তুমি লেখাপড়া শিখেছ। আমার কী বুদ্ধি আছে ?"

"তোমাকে লেখাপড়া শেখাব। কলকাতায় গিয়ে সমস্ত বন্দোবস্ত করে দেবো। মেয়েদের স্কুলে ভ ত করে দেবো।'

মন্দাকিনী ঘাড় নাড়িয়া বলিল লেখাপড়া যদি শিখতে হয় তবে আমি তোমার কাছে শিখব। বুড়ো বয়সে মি ইস্কুলে যেতে পারব না।"

অনাথ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "তুমি ভুল বঝছ। আমরা দু'জনে একত্রে এব বাড়িতে থাকব না ত '

মন্দাকিনী বিস্মিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'তবে আমি কোথায় থাকব ?"

'সেই ইস্কুলেই সেইখানে মেয়েরা পড়ে, থাকে রীতিমত সকল বন্দোবস্ত আছে।

মন্দা স্থিরস্বরে বলিল "তবে আমি ।ব না।"

অনাথ দেখিল যেখানে রোগ, সেখানে চিকিৎসা হইতেছে না। সকল কথা খুলিয়া বলা আবশ্যক। বলিল, "কেন আমি এত দিন তোমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিনি তুমি কিছু শুনেছ ?'

মন্দা বলিল, "শুনেছি, কিন্তু ভাল বুঝতে পারিনি।"

"তবে বুঝিয়ে বলি শোন। প্রথমত আমাদের বিবাহ ভালবাসার বিবাহ নয়।

দ্বিতীয়ত, তার অনুষ্ঠানাদি পৌত্তলিক মত অনুসারে হয়েছে। এই দু'টি কারণে, আমার মতে, আমাদের বিবাহ অসিদ্ধ। সুতরাং তুমি আমার স্ত্রী নও, বোনের মত। বুঝলে?"

"না, ছিছি!"

"তবে আর একটা কথা খুব স্পষ্ট ক'রে বলি শোন। আমি তোমায় ভালবাসিনে।"

মন্দা বলিল, "তা ত দেখতেই পাচ্ছি।"

"আমি আর একজনকে ভালবাসি।"

"তবে আমায় কলকাতায় নিয়ে কী করবে?"

"দেখ মন্দা, আমি তোমায় ভাল না বেসে বিয়ে করেছি, সেই তোমার প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার কবা হয়েছে। তার উপর তোমার বাকী জীবনটা নিষ্ফল করে দিযে আর সর্বনাশ কবব না। আমরা দুজনেই ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলে আমাদের বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করা যাবে। তখন তুমি স্বাধীন হবে, যাকে ইচ্ছে বিবাহ করো। এই জন্য কলকাতায় গেলে আমাদের একত্র বাস অসম্ভব। সব কথা বুঝতে পারলে?"

মন্দাকিনী বেশি করিয়া ঘোমটা দিল। কোনও উত্তব কবিল না, প্রশ্ন কবিল না, কাঠের পুতুলেব মত বসিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে অনাথ জানিতে পাবিল, মন্দা কাঁদিতেছে।

ইহাতে অনাথ মনে ক্লেশ অনুভব কবিল। ইচ্ছা করিল মন্দার মুখেব আবরণ খুলিয়া তাহার চক্ষু দুইটি মুছাইয়া দেয়: কিন্তু তাহার তীক্ষ্ণ কর্তব্যজ্ঞান তাহাকে বাধা দিল। এই গভীব রাত্রে, নির্জন গৃহে, যুবতী স্ত্রীলোকের অঙ্গস্পর্শ কবা নীতিসঙ্গত বলিয়া মনে হইল না। সুতরাং শুধু বলিল, "মন্দা, কাঁদ কেন? আমি তোমাব মঙ্গলের জন্যেই ত বলছি।"

কিন্তু মন্দাকিনী কিছুই বলিল না, তাহার ক্রন্দনও থামিল না।

অনাথ ডাকিল, "মন্দা!" এবাব স্বর অন্যরূপ; এ যেন আদরেব স্বর। এ স্বর শুনিয়া মন্দা বেশি কাঁদিতে লাগিল।

অনাথ বিস্মিত হইযা ভাবিল—এ কথায় মন্দার এত দুঃখ কেন? এত ক্লেশ কেন? একটা ভাবী পবিত্রাণেব আনন্দ অনুভব করিল না? আমি ভালবাসি না—ভালবাসিতে পারি না, তাহা জানে; এ বন্ধন ছিন্ন হইলে, জীবনের সুখময় পথে চলিবার অবসর পাইবে। তথাপি এ প্রস্তাবে এত দুঃখ কেন? তবে কি আমায় ভালবাসে?

এই সময় ঘড়িতে টং টং করিয়া তিনটা বাজিল। মন্দা উঠিয়া বলিল, "আমি যাই!"

অনাথ মন্দাকে স্পর্শ করিল, তাহার হাতখানি ধরিল, ধরিয়া বলিল, "তোমার মনের কথা আমায় খুলে বল মন্দা।"

মন্দা কম্পিতস্বরে উত্তর করিল, "আমার এখন মাথার ঠিক নেই।"

"তবে কাল আবার এস। আসবে?"

"দেখব।"

"দেখব না মন্দা, কাল নিশ্চয় এস।" অনাথের কণ্ঠস্বরে একটা আগ্রহ ধ্বনিত হইল।

মন্দা বলিল, "আচ্ছা।" বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

॥ ৩ ॥

পরদিন যখন অনাথের নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন অনেক বেলা হইয়াছে। প্রথমেই মন্দাকিনীর অশ্রুপূর্ণ চক্ষু দুটি ছবির মত তাহার মনে উদয় হইল।

অনাথ উঠিয়া বসিল। দেখিল চুলে পরিবার একটি সোনার কাঁটা বিছানায় পড়িয়া রহিয়াছে। সেটি তাড়াতাড়ি বাক্সের মধ্যে লুকাইয়া ফেলিল।

প্রাতে সে প্রতিদিন সঙ্গীত ও উপাসনা করিয়া থাকে, কখনও বাদ যায় না। আজ আর তাহা হইয়া উঠিল না। আজ তাহার মনটা বড় উদ্‌ভ্রান্ত।

গ্রামের বাহিরে নদীতীরে গিয়া অনাথ পদচারণা করিতে লাগিল। কিয়ৎপরে দেখিতে পাইল বাড়ির একজন ভৃত্য মাখন সর্দার ছুটিতে ছুটিতে তাহার অভিমুখে আসিতেছে।

হঠাৎ অমঙ্গল আশঙ্কায় তাহার মন চমকিয়া উঠিল। কী হইয়াছে? ও কী আমাকে ডাকিতে আসিতেছে? মন্দাকিনীর কিছু হয় নাই ত? অথবা সে কিছু করিয়া বসে নাই ত?

মাখন সর্দার নিকটস্থ হইলে অনাথ দেখিল সে কাঁদিতেছে।

দ্রুতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে মাখন, কী হয়েছে?"

মাখন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আর দাদাঠাকুর সর্বনাশ হয়েছে। রোজা ডাকতে যাচ্ছি। কাটি ঘা।"

কাটি ঘা অর্থে সর্পাঘাত। অনাথ ভাবিল মন্দাকিনীকে সর্পে দংশন করিয়াছে। মাখন ততক্ষণ অনেক দূরে। কাহার এরূপ হইয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করা হইল না।

তখনই অনাথ বাড়ি ফিরিল। প্রথমে সহজ পদবিক্ষেপ আরম্ভ করিয়াছিল, ক্রমে গতির বৃদ্ধি করিল। পরে দৌড়াইতে লাগিল।

সদর দরজায় বাড়িতে আসিতে একটু ঘুরিতে হয়। বাগানের দুয়ার দিয়া প্রবেশ করিল। বাগানে বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া কিয়দ্দূরে গাছের আড়ালে হরিমতি ও মন্দাকিনীকে দেখিতে পাইল। তাহারা পুষ্করিণীতে স্নান করিতে যাইতেছে। দেখিয়া অনাথ হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। উভয়েরই মাথার কাপড় খোলা। মন্দাকিনীর মুখখানি বিষণ্ণতা মাখা। হরিমতির চক্ষু দুইটি কৌতুকপূর্ণ। প্রথমে হরিমতিরা অনাথকে দেখিতে পায় নাই, কাছাকাছি আসিয়া দেখিতে পাইল। মন্দাকিনী ব্যস্ত হইয়া ঘোমটা দিল। হরিমতি অনাথের প্রতি যেন গোপনে হাস্য করিতেছে, যেন তাহার চক্ষু দুইটি দাদাকে বলিতেছে, "আমি সব জানি গো সব জানি।"

অনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "হরি, কাকে সাপে কামড়েছে?"

হরিমতি বিস্মিত হইয়া বলিল, "সাপে কামড়েছে ? কই কাকে তা ত জানিনে।"

অনাথ বৈঠকখানায় গিয়া শুনিল, মাখন সর্দারের স্ত্রীকে সর্পদংশন করিয়াছে। তখন সে মাখনের বাড়ির অভিমুখে চলিল। সেখানে গিয়া দেখিল, অনেক লোক জমিয়াছে, রোজাগণ উচ্চস্বরে মন্ত্র পড়িতেছে। কিন্তু স্ত্রীলোকটি কিছুতেই বাঁচিল না। মাখন যখন রোজা লইয়া আসিল, তখন সব শেষ হইয়া গিয়াছে। তাই দেখিয়া মাখনের যে কান্না ! পাঁচ বৎসরের বালকের মত ভূমিতে লুটাইয়া লুটাইয়া সে কাঁদিতে লাগিল। অনেকে সেই শোকাবহ দৃশ্য সহ্য কবিতে পারিল না, হায় হায় কবিতে করিতে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেল। অনাথও চক্ষু মুছিতে মুছিতে বাড়ি ফিরিল। অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল, একজন কৃষকের অশিক্ষিত অমার্জিত হৃদয়ে এত ভালবাসা ? ইচ্ছা করিল হেমন্তকুমারকে আনিয়া একবার এ দৃশ্য দেখায়। সে সর্বদা বলিয়া থাকে, পূর্বরাগবর্জিত, মন্ত্রপড়া বিবাহে ভালবাসা কিছুতেই জন্মিতে পারে না, তাহা একেবারেই অসম্ভব।

বাড়ি পৌঁছিয়া দেখিল হেমন্তকুমাবেব একখানি পত্র আসিয়াছে।

সত্যমেব জযতে

কলিকাতা।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবাব।

প্রিয ভ্রাতঃ,

গত কল্য তোমাকে যে পত্রখানি লিখিয়াছি, তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। অন্য একটা সুসংবাদ আছে। কান্তপুবেব বাজা শ্রীযুক্ত অশ্বিনীরঞ্জন রায় বাহাদুর তাঁহাব পুত্রের জন্য গৃহশিক্ষক অন্বেষণ কবিতেছিলেন, বৈকালে দুই ঘণ্টা পড়াইতে হইবে। বেতন পঞ্চাশ টাকা। আমি ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি। তোমায় তিনি ঐ কার্যে নিযুক্ত করিতে পাবিলে অত্যন্ত সুখী হইবেন, কিন্তু তাহা হইলে তোমায এক সপ্তাহের মধ্যে কার্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অতএব তুমি পত্র পাঠমাত্র পূর্ব পরামর্শমত শ্রীমতী মন্দাকিনীকে সমভিব্যাহারে লইয়া চলিয়া আইস। তোমার উত্তর পাইলেই বালিকা বিদ্যালয়ে তাঁহার জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত কবিয়া রাখিব।

আমাব সহিত দেখা হইলেই নগেন্দ্রবালা তোমার কথা জিজ্ঞাসা করেন। তোমার প্রতি তাঁহাব প্রেম যে উত্তবোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভগিনী মন্দাকিনীকে লইয়া আসা সম্বন্ধে তুমি কিছুমাত্র দ্বিধা বা শঙ্কা করিও না। যদি বাধা প্রাপ্ত হও ত স্মরণ করিও, পৃথিবীতে অধিকাংশ শুভকার্য সম্পাদনেই বাধা অতিক্রম করিতে হইয়াছিল ; ঈশা স্বীয় প্রিয় ধর্ম্ম প্রচার করিবাব জন্য আপনার প্রাণ পর্যন্ত দিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। সর্বমঙ্গলবিধাতা তোমার সহায় হউন।

ভবদীয়

শ্রীহেমন্তকুমাব সিংহ

অনাথ হেমন্তকুমারের পত্রের কোনও উত্তর দিল না। মন্দাকিনীর অশ্রুমাখা মুখখানি কেবল তাহার মনে পড়িতে লাগিল। সে যে সম্মত নয়! সে যে ভারি দুঃখিত! কী করিয়া তাহাকে কলিকাতায় লইয়া যাইবে?

অদ্য প্রভাতে মাখন সর্দারের ব্যাপার দেখিয়া তাহার মত ও বিশ্বাসে একটু আঘাত লাগিয়াছে। হয়ত মন্দাকিনী তাহাকে ভালবাসে, তাই বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিবার প্রস্তাবে সে অত দুঃখাতুর! বিবাহের পূর্বে প্রণয়সঞ্চার না হইলে পরে যে তাহা হইবেই না, তাহার স্থিরতা সম্বন্ধে অনাথের মনে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে।

সন্ধ্যাবেলায় তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রটি আসিয়া তাহার হাতে একটি পত্র দিয়া সবেগে পলায়ন করিল। খাম আঠা দিয়া বন্ধ, ভিতরে চিঠি রহিয়াছে, অথচ কোন শিরোনামা নাই। অনাথ খামখানি ছিঁড়িয়া চিঠি বাহির করিয়া পড়িল; তাহাতে লেখা আছে

প্রিয়তমেষু,

তুমি আমায় যেখানে লইয়া যাইবে, যাইতে প্রস্তুত আছি। যে দিন যে সময়ে বলিবে, আমি তোমার অনুগামিনী হইব। আজ রাত্রে সাক্ষাৎ করিতে পারিব না।

চরণাশ্রিতা দাসী।
শ্রীমতী মন্দাকিনী দেবী

এই পত্র পাইয়া অনাথ ভাবি বিস্মিত হইল। যাইতে প্রস্তুত? বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিতে আর দুঃখ নাই?

কয় পংক্তি অনাথ বারংবার পাঠ করিল। যদি দুঃখ নাই, তবে ভালবাসে না। অথচ লিখিয়াছে 'প্রিয়তমেষু'—'চরণাশ্রিতা দাসী' —ইহার অর্থ কি? ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে স্থির করিল, ওগুলো বাঁধাগৎ, ওগুলার বিশেষ কোনও অর্থ নাই। কিন্তু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে তাহার মনে ব্যথা বাজিয়া উঠিল।

কিন্তু তাহা ক্ষণিক মাত্র। মনকে সে দুই তাড়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সে তোমাকে ভালবাসে না বাসে তাহাতে তোমার কি? মন বলিল—নাঃ—তাহার জন্য আমার কিছুমাত্র মাথাব্যথা নাই। নগেন্দ্রবালার মানসী প্রতিমাকে সে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত বুকে চাপিয়া ধরিল। ভাবিল, আর একদিনও বিলম্ব করা হইবে না। কল্যই মন্দাকিনীকে লইয়া কলিকাতা যাত্রা করিতে হইবে। রাত্রি একটার সময় বাহির হইবে। দুই ক্রোশ দূরে রতনপুর গ্রাম; সে অবধি পদব্রজে যাইবে। সেখান হইতে গরুর গাড়ি করিয়া স্টেশনে যাইবে। তারকেশ্বর দিয়া যাইলে আট ক্রোশ, পাণ্ডুয়া দিয়া যাইলে এগার ক্রোশ; পাণ্ডুয়া দিয়া যাওয়াই শ্রেয়। গ্রামের লোকজনের সঙ্গে দেখা হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। একটু দূর হইবে, বিলম্ব হইবে, তা আর কি হইবে? সারা রাত্রি তাহার নিদ্রা হইল না। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা প্রকার কাল্পনিক আয়োজনে তাহার মস্তিষ্ক অত্যন্ত উষ্ণ হইয়া পড়িল।

পরদিন সকালে উঠিয়াই মন্দাকিনীকে লিখিল :—

প্রিয় ভগিনী,

আজ রাত্রি একটার সময় যাত্রা করিতে হইবে। ঐ সময় আমার ঘরে

আসিও। জিনিসপত্রের মধ্যে দ্বিতীয় একখানি বস্ত্র ভিন্ন আর কিছুই লইও না।

শ্রীঅনাথশরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাত্রি একটার সময়, স্ত্রীকে চুরি করিয়া অনাথ পলায়ন করিল।

॥ ৪ ॥

দুই দিন পরে বেলা বারোটার সময় যখন পাণ্ডুয়ার বাজারে অনাথশরণ গোশকট হইতে মন্দাকিনীর সহিত অবতরণ করিল, তখন রৌদ্র অত্যন্ত প্রচণ্ডভাব ধারণ করিয়াছে। দুইজনেই স্বেদাক্ত কলেবর। গাড়িভাড়া চুকাইয়া দিয়া অনাথ একটা দোকানে উঠিল। দোকানি অভ্যর্থনা করিয়া মাদুর বিছাইয়া তাহাকে বসাইল। একটা ঝি আসিয়া মন্দাকিনীকে আড়ালে স্ত্রীলোকদের বসিবার স্থানে লইয়া গেল।

সেই ঘরের পশ্চাতেই বারান্দা। বারান্দার নিম্নেই একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা। জল বড় নির্মল মন্দাকিনীর শরীর বড় উত্তপ্ত পিপাসায় কণ্ঠাগত প্রাণ। ঝিকে বাজার করিতে পাঠাইয়া মন্দাকিনী স্নান করিতে নামিল। তখনও সে যথেষ্ট বিশ্রাম করে নাই গায়ের ঘাম পর্যন্ত মরে নাই। যতক্ষণ ঝি ফিরিল না ততক্ষণ, আধঘণ্টা হইবে মন্দা জলে পড়িয়া রহিল ঝি আসিলে উঠিয়া মাথা গা মুছিয়া রান্না চড়াইয়া দিল।

এই অত্যাচারের প্রতিফল পাইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। রন্ধন সমাপ্ত হইবার পূর্বেই মন্দা প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইল

অনাথ স্নান করিয়া জল খাইয়া স্টেশনে গিয়াছিল গাড়ির খবর লইতে এবং হেমন্তকুমারকে টেলিগ্রাম পাঠাইতে। ফিরিয়া আসিয়া দেখে, এই ব্যাপার। মন্দার গায়ে হাত দিল গা একেবারে পুড়িয়া যাইতেছে। চক্ষু দুইটি জবাফুলের মত লালবর্ণ। শীতে হাত পা ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতেছে। সঙ্গে না আছে বিছানা বালিস, না আছে বাহুল্য বস্ত্র মন্দা কিসেই বা শয়ন করে, কী বা গায়ে দেয়?

অনাথ বলিল একটু অপেক্ষা কর আমি একখানা কম্বল চেয়ে এনে বিছানা ক'রে দিচ্ছি

মন্দাকিনী বলিল, তুমি আগে খেতে বস। তোমাকে ভাত বেড়ে দিই, তারপর শোব এখন

অনাথ বলিল, "পাগল। এখন ভাত বাড়তে হবে না। তোমার এমন অসুখ, আমি কী খেতে পারি?"

মন্দা কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "আমার অসুখ তা কী? তা ব'লে তুমি উপবাসী থাকবে? দু দিনের কষ্টে তোমার মুখ শুকিয়ে আধখানি হয়ে গেছে।"

অনাথ দোকানীর নিকট চাহিয়া একখানা বালাপোষ আর খান দুই তিন কম্বল লইয়া আসিল। সেইগুলি দিয়া বিছানা করিয়া মন্দাকে বলিল, "শোবে এস।"

মন্দা বলিল, "ওকি কথা? তুমি না খেলে আমি শোব না।"

অনাথ শুনিল না, মন্দাকিনীকে শয়ন করাইল। বিছানায় শুইয়া মন্দাকিনী দুই তিন বার বলিল, "ভাত বেড়ে নিয়ে খাও তুমি আপনি। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে খেতে

কষ্ট হবে।" কিন্তু আব বেশীক্ষণ জিদ কবিবাব শক্তি তাহাব বহিল না, অল্পে অল্পে জ্বরঘোরে অচেতন হইয়া পড়িল।

তিন দিন পবে যখন মন্দাকিনীব জ্ঞান হইল তখন সে চক্ষু খুলিয়া দেখিল, বিছানাব কাছে স্বামী বসিয়া।

অনাথ জিজ্ঞাসা কবিল, "মন্দা কেমন আছ?"

মন্দা বলিল, "ভাল আছি। তুমি ভাত খেয়েছ?" বলিতে বলিতে আশেপাশে দৃষ্টি কবিয়া দেখিল, সে দোকানে নহে, কাহাব গৃহে পালঙ্কেব উপব শযন কবিয়া বহিয়াছে। জিজ্ঞাসা কবিল, "একি! আমি এ কোথায় বযেছি?"

অনাথ বলিল "মন্দা তোমাকে যে আব কথা কইতে শুনব, তা ভাবিনি। তিন দিন কেটে গেছে। এ এখানকাব জমিদাবেব বাগানবাড়ি।"

মন্দা বলিল, তিন দিন।"

'হাঁ মন্দা, তিন দিন তুমি অচেতন হযে ছিলে। এখন যদি বাঁচাতে পাবি, তবেই সব সার্থক।"

মন্দা কিছুক্ষণ নীবব থাকিয়া অত্যন্ত ক্ষীণ স্ববে বলিল, "তোমায একটা কথা বলব?"

অনাথ বলিল "কী মন্দা?'

'আমাকে বাঁচিও না।

এ কথা শুনিযা অনাথেব চক্ষু দিযা জল আসিতে লাগিল। বলিল, "ছি মন্দা, ও কথা কী বলতে আছে? তুমি ভাল হবে, তুমি বাঁচবে।"

মন্দাব ঠোঁট দুটি কাঁপিযা উঠিল। জলভবা চোখ দুইটি অনাথেব পানে ফিবাইযা বলিল 'কী হবে আমাব বেঁচে? আমায যেতে দাও।"

অনাথ বলিল, "না মন্দা, তোমাকে আমি যেতে দেব না।"

'কি কববে আমায নিযে?"

"আমি তোমায ভালবাসব।"

বোগিণীব দুর্বল মস্তিষ্ক চিন্তাব ভাব আব সহিতে পাবিল না। চক্ষু মুদিযা মন্দা ঘুমাইযা পড়িল।

কিযৎক্ষণ পবে ডাক্তাববাবু আসিলেন অনাথ সহাস্যমুখে তাঁহাকে নমস্কাব কবিয়া বলিল, "দুপুববেলাকাব ওষুধটায বেশ ফল হযেছে। জ্ঞান হযেছে। এই কিছুক্ষণ আগে কথাবার্তা কযেছেন।"

ডাক্তাববাবু বলিলেন, "তবে আব ভাবনা নেই। এ জ্বরটুকু দুদিনে সাবিযে দেব কিন্তু আপনি যে মাবা গেলেন। এ তিন দিন ত এক বকম না খেযে আপনি ঠায বসে আছেন। আপনাব মত পত্নীপ্রেমিক স্বামী আমি খুব কম দেখেছি।"

অনাথ মনে মনে বলিল 'খুব কমই বটে।' প্রকাশ্যে বলিল, "আমাব স্ত্রী, আমি ত স্বভাবতই কবব, কিন্তু আপনি যে সহৃদযতাব পবিচয দিযেছেন, তাব তুলনা নেই।'

প্রবীণ ডাক্তাববাবু আত্মপ্রশংসায সঙ্কুচিতচিত্ত হইযা বলিলেন, "আমি বেশী কী কবেছি? আমি যা কবেছি, সেই ত আমাব পেশা, জীবিকা।"

"আপনি যদি বাবুদের ব'লে এ বাগানবাড়ি খুলিয়ে না দিতেন, তাহলে দোকানের সেই স্যাঁৎসেঁতে মেঝেতে কম্বলের উপর শুয়ে আমার স্ত্রী ক'দিন বাঁচতেন ?"

ডাক্তারবাবু কথা উল্টাইয়া অন্য কথা পাড়িলেন। তাহার পর ঔষধ-পথ্যাদি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া প্রস্থান করিলেন।

সেদিন রাত্রি দশটায় মন্দার জ্বর মন্দ হইল। সে সারারাত্রি সুনিদ্রা উপভোগ করিল। তাহার পার্শ্বে শয়ন করিয়া অনাথও কয়দিনের পর খুব ঘুমাইল।

॥ ৫ ॥

প্রভাতে যখন ডাক্তারবাবু আসিলেন, তখন মন্দাকিনী তাঁহাকে দেখিয়া মাথায় কাপড় দিল। জ্বর ছাড়িয়াছে শুনিয়া ডাক্তারবাবু অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ কবিলেন। বলিলেন, আর কিছুমাত্র ভয় নাই। এখন ইঁহাকে খুব প্রফুল্ল বাখা প্রয়োজন।

ডাক্তাববাবু চলিযা গেলে, অনাথ মন্দাকে নিয়মিত ঔষধ-পথ্যাদি সেবন করাইল। তাহাব পর দুইজনে কথাবার্তা আরম্ভ হইল।

মন্দা বলিল, "এ ক'দিন কী খেলে ?"

"ডাক্তারবাবুদেব বাডি থেকে ভাত আসত ?"

"তবে চেহাবা এমন হযে গেল কেন ? একেবারে শুকিযে যে আধখানি হয়ে গেছ। আমিই তোমাব যত কষ্টের মূল। আমার জন্যে কেন এত করলে ?"

অনাথ মৃদু হাসিযা বলিল, "যদি আমার ব্যারাম হয়, তা হ'লে তুমি আমাব জন্যে করতে না ?"

মন্দা বিছানার দিকে চাহিয়া, আস্তে আস্তে বলিল, "আর ব্যারামের প্রার্থনায় কাজ নেই।"

অনাথ মন্দার একখানি হাত ধবিয়া আদব করিয়া বলিল, "প্রার্থনা নাই করলাম, হলে করতে কী না ?"

"কবি না ত কী ?"

"কেন ?"

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে মন্দা বলিল, "তুমি যে আমার স্বামী।"

অনাথ মন্দার হাতখানি চাপিযা বলিল, "তুমি যে আমার স্ত্রী।"

মন্দা সস্মিত মুখে জিজ্ঞাসা কবিল, "কবে থেকে ?"

"যে দিন তোমায় ভালবেসেছি।"

মন্দাকিনী কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। শেষে বলিল, "তুমি না ব্রাহ্ম ? তুমি না মিছে কথা বল না ?"

অনাথ বলিল, "আমি ব্রাহ্ম, আমি মিছে কথা বলিনে, আমি তোমায ভালবাসি।"

"তবে সে দিন বললে, 'ভালবাসব'।"

অনাথ নিরুত্তর। বলিল, "তুমি ত আমায় ভালবাস না।"

"কিসে জানলে ?"

"তুমি ত আমাদের বিবাহবন্ধন ছিন্ন হতে দিতে সম্মত হয়েছিলে। তাই ত কলকাতায় যাচ্ছিলে।"

মন্দা হাসিযা বলিল, "তা বুঝি?"

"কি তবে?"

"আমি বুঝি আসতে চেয়েছিলাম? ঠাকুরঝিই ত আমাকে পাঠালে।"

"তাব ভাবি ইচ্ছে তোমাব আব একটি বিয়ে হয?"

"হ্যাঁ—পাত্রও ঠিক করে দিয়েছিল।"

"কে?"

"যমবাজা।"

অনাথ হাসিতে লাগিল। মন্দা বলিল, "ঠাকুরঝিই বলেছিল, তোকে যেমন দাদা বাড়ি থেকে চুবি ক'বে নিয়ে যাচ্ছে, তুই তেমনি পথে তাব মন ডাকাতি কর্‌বি। না যদি পাবিস, তবে—"

অনাথ বাধা দিযা বলিল, "তবে ঐ বিয়েব বন্দোবস্ত? তা ডাকাতিই ক'রেছ বটে। এদিকে অন্য বিয়েব যোগাড়যন্ত্রটিও বেশ ক'বে তুলেছিলে।"

মন্দা বলিল, "কিন্তু সে ভালবাসাব বিয়ে হচ্ছিল না। তাই ব্যাঘাত হল। কখন আমি তোমাব মনে ডাকাতিটে কবেছি, শুনতে পাইনে?"

"সে সব পবে বলব।"

'কখন কবেছি, সেইটে বল না।"

"কখন? যে দিন আমাব বিছানাব পা'ব তলায শুযে ঘুমুচ্ছিলে, তখন আবম্ভ কবেছ আব কি। তাব পব সাবাপথে।"

চাণক্যপণ্ডিত বুধগণেব প্রতি উপদেশ দিযাছেন, ঘৃতকুম্ভসমা নাবী এবং তপ্তাঙ্গাবসম পুরুষকে একত্র স্থাপন কবিবে না, কবিলে বিপদ ঘটিতে পাবে। সেই নবনাবী যদি স্বামী স্ত্রী হয এবং তাহাদেব বযস যদি তরুণ হয, তাহা হইলে কি আব বক্ষা আছে?"

মন্দা অল্প হাসিতে হাসিতে বলিল "পথে কেন তবে আত্মসমর্পণ কর্‌নি?"

অনাথ কিছু না বলিযা স্ত্রীব মুখেব পানে চাহিযা বহিল

মন্দা মৃদুস্ববে বলিল, "নগেন্দ্রবালা? আমাব স্বামীকে নগেন্দ্রবালা নেবে নগেন্দ্রবালাব বড সাধ্যি! চল একবাব কলকাতায, তাকে আমি দেখব।

অনাথ বলিল, "কলকাতায ত যাব না। পশ্চিম যাব, তোমাব শবীব সাবাতে।"

মন্দা এ কথা যেন কানে তুলিল না। জিজ্ঞাসা ক'বল, "সত্যি সে তোমায ভালবাসে? তা হলে তাব ত ভাবি দুঃখ হবে।"

"সে আমায ভালবাসে কী না, সেই জানে আব ঈশ্বব জানেন।"

"বলেনি? জিজ্ঞাসা কবনি?"

"তাব সঙ্গে কখনও এ কথা হযনি।"

"তুমি ভালবাসতে তা সে জানে?"

"কী করে জানবে?"

মন্দা অভিমান ভবে বলিল, "সে না জানুক, তুমি ত বাসতে।"

অনাথ বলিল, "কই আর বাসতাম ? তা হলে তুমি এত শীঘ্র এত সম্পূর্ণভাবে আমাকে জয় ক'রলে কী ক'রে ? এই ঘটনায় প্রমাণ হয়ে গেল আমি যথার্থ ভালবাসতাম না। শুধু চোখের ভালবাসা ছিল, অন্তরে প্রবেশ করেনি। তার বিদ্যা, তার বুদ্ধি, তার আচার ব্যবহারের সৌন্দর্য এই সমস্ত আমাকে মুগ্ধ করেছিল।"

দুইদিন পরে মন্দা পথ্য পাইল। দুইটি দিন দুইজনে বাগানবাড়িতে বড়ই আনন্দে যাপন করিল

আজ সন্ধ্যায় ডাক্তারবাবুদের বাড়ি নিমন্ত্রণ খাইয়া, কল্য প্রভাতের গাড়িতে তাহারা মুঙ্গের যাত্রা করিবে। সমস্ত ঠিকঠাক।

সন্ধ্যার পর ডাক্তারবাবুর বৈঠকখানায় বসিয়া অনাথ হেমন্তকুমারের নিকট হইতে এই পত্র পাইল—

ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং

কলিকাতা।

২৫ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার

প্রিয় ভ্রাতঃ,

ভগিনী মন্দাকিনীর অসুস্থতার সংবাদে অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম ঈশ্বর শীঘ্র তাঁহার আরোগ্যবিধান করুন।

আজ তোমায় একটি দারুণ দুঃসংবাদ দিব, প্রস্তুত হও। তুমি বলিয়াছিলে, তোমার দৃঢ় বিশ্বাস, নগেন্দ্রবালা তোমাকে ভালবাসেন। আমারও বিশ্বাস তাহাই ছিল কিন্তু কল্য সন্ধ্যাকালে আমার সে ধারণা চূর্ণ হইয়াছে। শুনিলাম শরতের সঙ্গে নগেন্দ্রবালার বিবাহ স্থির আরও শুনিলাম দুই বৎসর হইতে তাঁহারা পরস্পরের প্রণয়ে আবদ্ধ। সুতরাং নগেন্দ্রবালার ব্যবহারে তুমি যে অনুমান করিয়াছিলে তোমার প্রতি তিনি প্রণয়বতী, তাহা তোমার ভ্রান্তি মাত্র

এখন তুমি কী করিবে ? এ দুঃসহ শোক কেমন করিয়া বহন করিবে ?

তোমার আর একটা ভুল হইয়াছে হিন্দুমতে যে বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে নূতন ব্রাহ্মবিবাহ আইনের সঙ্গে তাহার কোনও সম্পর্ক নাই সুতরাং তোমরা উভয়ে ব্রাহ্ম হইলেও সে সম্বন্ধ ছিন্ন করিবার পথ বন্ধ।

তুমি কী কলিকাতায় আসিবে ? চারি পাঁচ দিনের মধ্যেও যদি ভগিনী আরোগ্য লাভ করেন, এখানে আসিতে পার, তাহা হইলেও পূর্বকথিত রাজবাড়ির সেই কার্যটি হস্তান্তরিত হইবে না, কিন্তু আমার পরামর্শ ভগিনীকে গৃহে পাঠাইয়া দিয়া তুমি কিয়দ্দিন হিমালয়ের কোনও নিভৃত প্রদেশে গমন করত তপস্যা ও উপাসনার দ্বারায় চিত্তস্থির ও আত্মশান্তিবিধান করিবে।

ভবদীয়

শ্রীহেমন্তকুমার সিংহ

রাত্রি নয়টার পর ডাক্তারবাবুর বাড়ি হইতে ফিরিয়া অনাথ স্ত্রীকে পত্রখানি দেখাইল। মন্দা পড়িয়া হাসিয়া বলিল, "তবে আর নগেন্দ্রবালার উপর আমার রাগ নেই। মুঙ্গেরে না গিয়ে কলকাতাতেই চল, নগেন্দ্রবালার বিয়েটা দেখতে

হবে।"

অনাথ বলিল "তাই চল। মুঙ্গেরে যাবার আর একটা উদ্দেশ্য ছিল আমায় ভুলে যেতে নগেন্দ্রবালাকে অবসর দেওয়া।

শুনিয়া মন্দাকিনী ভারি অভিমানের ভান করিল। বলিল, 'তাই যখন মনের কথা খুলে বললেই ত হয়। বলা হল তোমার শরীর সারাবার জন্যে পশ্চিম যাচ্ছি।"

বাহিরে অন্ধকার বকুলগাছে একটা কোকিল বসিয়া ছিল সে হয়ত মানবের ভাষা বুঝিতে পারে। বুঝি মন্দাকিনীর এ ছলনাময় মানকথা শুনিয়া সে ভারি আমোদ পাইল তাই মুহুর্মুহু ঝঙ্কার দিতে আরম্ভ করিল। অনাথ স্ত্রীকে বক্ষের নিকট টানিয়া লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিল 'না গো না- তা নয়।'

[বৈশাখ, ১৩০৫]

রসময়ীর রসিকতা

ক্ষেত্রমোহনবাবুব অষ্টাদশবর্ষব্যাপী দাম্পত্যজীবন স্ত্রীব সহিত যুদ্ধবিগ্রহ ও সন্ধি করিতে করিতেই কাটিযাছে। এমন বণবঙ্গিণী স্ত্রী বঙ্গদেশে প্রায়ই দেখা যায না।

ক্ষেত্রমোহনেব বয়স এখন চল্লিশ বৎসব। স্ত্রী বসময়ীর বযস ত্রিশ। 'বসময়ী' '—এ নাম যে বাখিয়াছিল বলিহাবি তাহাব প্রতিভা। তবে বসও ত অনেকগুলি আছে কিনা—এ ক্ষেত্রে বৌদ্ররস।

ক্ষেত্রমোহন একজন বাঙ্গলানবিস মোক্তাব : হুগলীতে থাকিয়া বেশ দুই পয়সা উপার্জন কবেন। বাড়ি তাঁহাব হুগলীতে নহে—জেলাব মধ্যে কোন এক পল্লীগ্রামে। তবে কযেক বৎসব হইল হুগলীতে নিজ বাটী নির্মাণ করিযা বাস করিতেছেন।

দুঃখের বিষয় এ পর্যন্ত ক্ষেত্রমোহনের সন্তানাদি কিছুই হয় নাই—স্ত্রীর যেরূপ বয়স, আর হইবাব ভবসাও নাই। অনেকদিন হইতে তাঁহাব মাসী পিসী প্রভৃতি পুনর্বার বিবাহ করিবাব জন্য তাঁহাকে অনুবোধ কবিতেছেন। ক্ষেত্রমোহনের আন্তরিক বাসনাও তাহাই। কিন্তু রসময়ীর ভয়ে এ পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনরূপ চেষ্টাচবিত্র করিতে সাহস করেন নাই।

ইতিমধ্যে সামান্য একটা ঘটনা উপলক্ষে রসময়ী ভয়ানক বিপ্লবের সৃষ্টি করিযা ক্ষেত্রমোহনকে দুইদিন গৃহছাড়া করিল। অবশেষে নিজে তাহার পিত্রালয় হালিশহরে চলিয়া গেল। ক্ষেত্রমোহন তখন সাহসে ভর কবিয়া গৃহে ফিরিযা আসিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন রসময়ীর আর মুখদর্শন করিবেন না—অন্যত্র

বিবাহ করিবেন। এ বাড়িতে রসময়ীকে আব ঢুকিতে দিবেন না—এই শেষ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হালিশহর গ্রামটি হুগলীরই অপর পারে—মধ্যে গঙ্গা প্রবাহিতা। চৌধুরীপাড়ায় রসময়ীর পিত্রালয়। অনেক দিন হইল তাহার পিতামাতাব কাল হইয়াছে। এখন সে বাড়িতে রসময়ীর বিধবা দিদি বিনোদিনী এবং তাহার দুইটি ছোট ভাই নবীন ও সুবোধ বাস করে। নবীন কাঁচড়াপাড়ার কারখানায় কর্ম করে ; সুবোধ ইস্কুল ছাড়িয়া এখন বাড়িতেই বসিয়া আছে—এখনও কিছু জুটে নাই।

মাসাধিক কাল রসময়ী হালিশহরে বাস কবিতেছে। পূর্বে পূর্বে এরূপ স্থলে দুইচারি দিন বা বড জোর এক সপ্তাহ্ পরে, দন্তে তৃণ করিয়া ক্ষেত্রমোহন আসিয়া উপস্থিত হইতেন এবং কত সাধ্যসাধনা করিয়া স্ত্রীকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইতেন। কিন্তু এবার সে নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিয়া রসময়ী কিছু চিন্তিত হইয়া পডিযাছে।

পাড়ার একজন বালক প্রত্যহ নৌকাযোগে গঙ্গাপার হইয়া হুগলী ব্রাঞ্চ ইস্কুলে পডিতে যাইত। সে ছেলেটি গ্রামে প্রচার করিয়া দিল—ক্ষেত্রমোহনবাবুর বিবাহ : দিনস্থিব হইযা গিযাছে।

এই কথা শুনিযা রসময়ীব দিদি বিনোদিনী একদিন বৈকালে ছেলেটিকে বাডিতে ডাকিযা আনিলেন। তাহাকে সন্দেশ ও বসগোল্লা খাইতে দিয়া বলিলেন, "বাবা, শুনলাম নাকি আমাদের ক্ষেত্তর আবার বিয়ে কবছে ? এ কথা কি সত্যি ?"

বালব বলিল, "হ্যাঁ সত্যি বইকি। আমাদের ক্লাসে সুরেশ বলে একটি ছেলে পড়ে, চুঁচুড়োয় তাব মামাব বাড়ি। তারই মামাতো বোনের সঙ্গে বিয়ে।"

"ঠিক জান ?'

"জানি বইকি। সুবেশই ত আমাকে বলেছে। দিনস্থির পর্যন্ত হয়ে গেছে।"

"তাব মামার নাম কী ?"

"নাম হরিশ্চন্দ্র চাটুয্যে। জজ আদালতে কম করেন।"

"তাদের বাড়িটি তুমি চেন বাবা ?"

"হ্যাঁ চিনি বইকি। সুবেশের সঙ্গে কতবাব গিয়েছি।"

"কত বড় মেযে ?"

"এই আমাদেব বয়সীই হবে।" বালকটির বযস ত্রয়োদশ বৎসর।

"কেমন দেখতে ?"

"তা—বেশ সুন্দর।"

বিনোদিনী কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন। শেষে বলিলেন, "আচ্ছা, কাল একবার আমাদের দু বোনকে সে বাড়িতে নিয়ে যেতে পাব বাবা ?"

"কেন ?"

"তাদের একবার মিনতি করে বলে কয়ে দেখি। বিয়ে হলে আমার বোনটিরও

সুখ হবে না—তার মেয়েও জলে পড়বে। কাল একবার আমাদের নিয়ে চল।"

"কখন?"

"এই—খাওয়া দাওয়ার পরে।"

"আমার ইস্কুল কামাই হবে যে?"

"একদিনের জন্যে মাস্টারের কাছে ছুটি নিও এখন। আমি বরং তোমায় একটি টাকা দেব—ঘুড়ি, নাটাই এ সব কিনো।"

বালকটি ব্যগ্রভাবে নিজ সম্মতি জানাইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন বেলা এগারোটার সময় দুই ভগিনীকে সঙ্গে লইয়া বালকটি চুঁচুড়া যাত্রা করিল। গঙ্গাপার হইয়া ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করিয়া, মাধবীতলায় হরিশবাবুর গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল। খিড়কি দরজার সম্মুখে গাড়ি দাঁড়াইল।

রসময়ী বলিল "এই বাড়ি?"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা, তুমি গাড়ির ভিতর বসে থাক। আমরা চট করে ও'দের সঙ্গে দেখাটা করে আসি।" বলিয়া দুইজনেই অবতরণ করিয়া বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল।

সে বাড়ির মেয়েরা কেহ তখন স্নান করিতেছে, কেহ খাইতে বসিয়াছে, কেহ বা আহারান্তে উঠানে বসিয়া চুল শুকাইতেছে। হঠাৎ দুইজন ভদ্রঘরের অপরিচিতা স্ত্রীলোককে প্রবেশ করিতে দেখিয়া একজন সবিস্ময়ে বলিল, "তোমরা কারা গা?"

বিনোদিনী বলিল "আমরা হালিশহর থেকে তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

স্ত্রীলোকটি সন্দিগ্ধভাবে বলিল, "এস—বস।"

দুইজনে বারান্দায় উঠিয়া উপবেশন করিয়া বলিল, "বাড়ির গিন্নী কোনটি?"

একজন প্রৌঢ়াকে দেখাইয়া সকলে বলিল, "ইনি গিন্নী।"

গৃহিণী বলিলেন "তোমরা কী মনে করে এসেছ বাছা?"

বিনোদিনী বলিল, "তোমাদের মেয়ের নাকি বিয়ে?"

গৃহিণী বলিলেন, "হ্যাঁ—আমার ছোট মেয়েটির বিয়ে।"

"কবে?"

"এই বিশে মাঘ দিনস্থির হয়েছে।"

"পাত্রটি কে?"

"ক্ষেত্রমোহন চক্রবর্তী—হুগলীতে মোক্তারী করেন।"

"সতীনের উপর মেয়ে দিচ্ছ বাছা?"

গৃহিণীর বিস্ময় প্রতি কথায় বাড়িয়া চলিয়াছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা চেন নাকি?"

বিনোদিনী বলিল, "চিনিনে আবার—খুব চিনি। আমাদের গ্রামেই ত বিয়ে করেছে।"

গৃহিণী বলিলেন, "হ্যাঁ—সতীন আছে বটে—কিন্তু সে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছে।"

রসময়ী এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া শুনিতেছিল, তাহার মনের রাগ ক্রমশই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছিল। এই কথা শুনিয়া হস্তপদ ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল—চক্ষু দুটি লাল হইয়া উঠিল।

বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন পরিত্যাগ করেছে কিছু শুনেছ গা?"

"শুনেছি সে মাগী নাকি বড় দজ্জাল।"

শ্রবণমাত্র রসময়ী তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিল। বারান্দার কোণে ছিল একগাছা ঝাঁটা। নিমেষ মধ্যে সেইটা দুই হস্তে ধরিয়া গৃহিণীর উপর শপাশপ মারিতে আরম্ভ করিল। সঙ্গে সঙ্গে বলিতে লাগিল, কেন?—কেন? আর কি মররার জায়গা পেলে না? জায়গা পেলে না? আমার সোয়ামি ছাড়া কি তোমার মেয়ের অন্য পাত্তর জুটলো না? জুটলো না?"

এই অভাবনীয় ঘটনায় বাড়ির লোকে ক্ষণকালের জন্য হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। তাহার পর মহা গণ্ডগোল আরম্ভ হইল। অল্পবয়স্কা বালিকারা দৌড় দিয়া ছুটিয়া কেহ খাটের নীচে কেহ সিন্দুকের আড়ালে লুকাইল। বাড়ির ঝি বসিয়া বাসন মাজিতেছিল সে বাসন ফেলিয়া, "ওরে খুন কল্লে—খুন কল্লে রে—সেপাই—এ সেপাই—এ পাহারাওয়ালা" বলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

বাড়ির অপর মেয়েরা আসিয়া রসময়ীকে ধরিয়া ফেলিল। রসময়ী তখন গৃহিণীকে ছাড়িয়া তাহাদের উপর কিল চড় ও নিষ্ঠীবন-বৃষ্টি করিতে লাগিল। কাহারও কাপড় ছিঁড়িয়া দিল কাহারও চুল ছিঁড়িয়া দিল, কাহাকেও খামচাইয়া দিল কাহাকেও কামড়াইয়া দিল হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিতে লাগিল "কনেটি গেল্লা কোথা? তাকে একবার মেরে কর না। চোখ দুটো গেলে দিয়ে যাই। নাকটা কেটে দিয়ে যাই। দাঁতগুলো ভেঙ্গে দিয়ে যাই।

বিনোদিনী এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ক্রমে সদর দরজায় লোক হৈ হৈ করিতে লাগিল। তখন সে বলিল রসময়ী—থাম—থাম—ক্ষ্যামা দে বোন—খুব হয়েছে। চল বাড়ি চল

ঝি ছুটিয়া বাড়িতে প্রবেশ করিয়া বলিল 'ওগো যেতে দিওনি—থানায় খবর দিয়ে এসেছি দারোগা আসছে।'

পুলিশের নাম শুনিয়া রসময়ী বলিল, "চল দিদি চল"

'যাবে কোথা—দারোগা আসুক তবে যেও।' বলিয়া দুই তিনটি স্ত্রীলোক রসময়ীকে ধরিতে অগ্রসর হইল

রসময়ী এক লম্ফে উঠানের কোণ হইতে আঁশবটিখানা সংগ্রহ করিয়া মাথার উপর সবেগে ঘুরাইয়া বলিল, "খুন চেপেছে—আমার খুন চেপেছে—সবাইকে খুন করে ফাঁসি যাব।"

ইহা দেখিয়া সমস্ত স্ত্রীলোক "মা গো" বলিয়া ছুটিয়া ঘরে ঢুকিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল। 'পাহারাওয়ালা—এ পাহারাওয়ালা—আসামী পালায়" বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে ঝি পুনশ্চ রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

রসময়ী তখন দিদির সহিত খিড়কি দরজা দিয়া বাহির হইয়া গাড়িতে উঠিয়া বলিল, "পারঘাটে চল।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বলা বাহুল্য হরিশচন্দ্রবাবু ক্ষেত্রমোহনকে কন্যাদান করিলেন না। তাঁহার গৃহিণী বলিলেন, "সে খুনে মেয়েমানুষ, বিয়ে দিলে আমার মেয়েকে খুন করে ফেলবে। তুমি অন্যত্র চেষ্টা দেখ।"

পরদিন কাছারিতে গিয়া হরিশবাবুর মুখে ক্ষেত্রমোহন সকল কথাই শ্রবণ করিলেন। রাগে তাঁহার সর্বশরীর জ্বলিতে লাগিল।

কাছারি হইতে বাড়ি ফিরিয়া, হাত মুখ ধুইয়া, অন্তঃপুরে বসিয়া ক্ষেত্রবাবু তামাক খাইতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ ঝড়ের মত রসময়ী আসিয়া প্রবেশ করিল। কয়েক মুহূর্ত নির্বাক হইয়া ক্ষেত্রমোহনের পানে দৃষ্টিপাত কবিল সেই প্রকার দৃষ্টিপাত, যে দৃষ্টিপাতে পূর্বে মুনি-ঋষিরা লোককে ভস্ম কবিয়া ফেলিতেন।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, "কী মনে করে?"

রসময়ী অসম্ভব সংযমের সহিত উত্তব করিল, "একটা শ্রাদ্ধেব যোগাড় করতে।" তাহার ওষ্ঠযুগল ক্রোধে কম্পিত হইতে লাগিল।

তামাক টানিতে টানিতে ক্ষেত্রমোহনবাবু বলিলেন, "শ্রাদ্ধটা কাব?"

"হরিশ চাটুয্যের মেয়ের, আর মেয়ের মার।"

"তা হলে দুটো শ্রাদ্ধ বল। সঙ্গে সঙ্গে অমনি নিজেরটাও সেরে নিলে হয় না।?"

"সেইটি হবে না এখন। বুড়ো বয়সে বিয়ে করছ নাকি শুনলাম?"

হুঁকা নামাইয়া, একটু উত্তেজিত ভাবে ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, "কবছিই ত। করব না কেন? তোমাব ভয়ে নাকি?"

রসময়ী চিৎকার করিয়া হাত নাড়িযা বলিল, "কর না, করে একবার মজাটাই দেখ না!"

"কী করবে তুমি?"

"এই এমন কিছু না। আঁশবঁটি দিয়ে সে মেয়ের নাকটা কেটে দেব আব বুকে একখানা দশমুনে পাথর চাপিয়ে দেব।"

"আর তোমার নাকটা কানটা কেউ যদি কেটে দেয়?"

"এস না। কাট না। তুমিই কাট না হয়।" বলিয়া রসময়ী নিজ কোমরে দুই হাত দিয়া, ঝুঁকিয়া, নিজের মুখ ক্ষেত্রমোহনের অতি নিকটে সরাইয়া দিল।

স্ত্রীর এতাদৃশ বিনয় দেখিয়া ক্ষেত্রমোহন আবার হুঁকা উঠাইয়া লইয়া আপন মনে টানিতে লাগিলেন। ঝুঁকিয়া থাকিয়া যখন ক্লান্তি বোধ হইল, রসময়ী তখন নিজের মুখ সরাইয়া লইয়া আবার সোজা হইয়া দাঁড়াইল। বলিল, "তা হলে আঁশবঁটিতে শান দিয়ে রাখিগে? সম্বন্ধ পাকা হলে খবরটা দিও। চুপি চুপি যেন শুভকর্মটা সেরে ফেল না।"

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, "তুমি না মরলে আর বিয়ে করছিনে। মরবে কবে?"

এই কথা শুনিয়া রসময়ী বিদ্রূপের স্বরে হাঃহাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, "আমি মরব কবে জিজ্ঞাসা করছ? রসি বামনি এখনি মরছে না। তার এখনও অনেক দেরী—বিস্তর বিলম্ব। তোমার বিয়ে করবার বয়স যাবে—বুড়ো থুড়থুড়ো হবে—ভূঁয়ে-মুয়ে হয়ে যাবে—তখন আর কেউ তোমায় মেয়ে দিতে রাজি হবে না—তখন আমি মরব।"

দাম্পত্য রসালাপ এই পর্যন্ত অগ্রসর হইলে বাহিরে একখানি গাড়ি থামিবার শব্দ হইল। রসময়ী বলিল, "তবে সেই কথাই রইল। এখন তবে আসি। দিদি ওপাড়ায় তার জায়ের বাড়ি গিয়েছিল—ভাবলাম তার সঙ্গে এসে তোমার সঙ্গে দুটো মনের কথা কয়ে যাই।" বলিয়া রসময়ী প্রস্থান করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উক্ত কথোপকথনের পর ছয় মাস কটিয়া গিয়াছে। রসময়ীর গর্ব সফল হইল না। সে এখন মৃত্যু-শয্যায় শায়িত।

সংবাদ পাইয়া ক্ষেত্রমোহনবাবু হালিশহবে গেলেন। চিকিৎসাদির কিছুই ত্রুটি হইল না। কিন্তু বসময়ী বাঁচিল না।

গঙ্গাতীরে লইয়া গিযা ক্ষেত্রমোহন স্ত্রীর মুখাগ্নি করিলেন। আশ্চর্য সংসারের মায়া—যে এত কষ্ট দিয়াছে, তাহার জন্যও ক্ষেত্রমোহন ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রুপাত কবিতে লাগিলেন।

আবও মাস ছয় কাটিল। ক্ষেত্রমোহনের পার্শ্বচর বন্ধুবান্ধবগণ নানা স্থানে পাত্রী অন্বেষণে ব্যস্ত হইলেন। অবশেষে হুগলীর নিকটস্থ একটি গ্রামে সুযোগ্য পাত্রীর সন্ধান পাওযা গেল। ক্ষেত্রমোহন স্বয়ং গিয়া দেখিয়া আসিলেন। মেয়েটি ডাগব—দেখিতেও ভাল। বিশেষ মেয়েব পিতা একটি বড় জমিদারের নায়েব—ওদিককার মামলা মকর্দমাগুলিও এই সূত্রে ক্ষেত্রমোহনবাবুর করায়ত্ত হইবে! কন্যার পিতা বজনীকান্ত ঘোষাল ইংরাজী লেখাপড়া জানা ব্যক্তি।

বিবাহের কথাবার্তা পাকা হইল। বরের খুড়ো মহাশয় গ্রাম হইতে আসিয়াছেন—কল্য আশীর্বাদ। প্রভাতে আফিসকক্ষে বসিয়া দুই চারিজন মক্কেলের সঙ্গে মোক্তারবাবু কথাবার্তা কহিতেছিলেন—খুড়া মহশয় একখানি "বঙ্গবাসী" হস্তে ঘরের কোণে বসিয়া তামাকু সেবন কবিতেছিলেন। এমন সময় ডাকপিয়ন আসিল, ক্ষেত্রমোহনবাবুর হস্তে একখানি পত্র দিয়া গেল।

খামের উপব হস্তাক্ষরের প্রতি দৃষ্টিপাত কারয়া ক্ষেত্রমোহনের মাথা ঘুরিয়া গেল। দুই চারিবার চক্ষু রগড়াইয়া বারম্বার খামখানির শিরোনামা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। কাছে আনিয়া, দূরে সরাইয়া, নানা প্রকারে দেখিলেন।

অবশেষ কম্পিত হস্তে পত্রখানি খুলিলেন। পড়িয়া তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। মক্কেলগণকে বলিলেন, "আচ্ছা, এখন তোমরা যাও—আজ সকালে সকালেই কাছারি যাব—সেইখানেই বাকি কথাবার্তা হবে এখন।"

মক্কেলগণ চলিয়া গেলে খুড়া মহাশয় বলিলেন, "চিঠি এল ক্ষেত্তর?"

জড়িত স্বরে ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কোথাকার চিঠি ?"

"তাই ত ভাবছি।"

ক্ষেত্রমোহনের মুখভাব এবং কণ্ঠস্বরের বিকৃতি লক্ষ্য করিয়া খুড়া মহাশয় উঠিয়া আসিলেন। তখন ক্ষেত্রমোহন পত্রখানি দ্বিতীয়বার পাঠ করিতেছেন। তাঁহার নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে, চক্ষু কপালে উঠিয়াছে।

খুড়া মহাশয় দ্রুতভাবে বলিলেন, "কী ? ব্যাপার কী ? কোনও দুঃসংবাদ নয় ত ?"

ক্ষেত্রমোহনবাবু নীরবে পত্রখানি খুড়া মহাশয়ের হাতে দিলেন। তিনি পত্র লইয়া চশমা অনুসন্ধান করিয়া চক্ষে পরিলেন। জানালার কাছে দাঁড়াইয়া খুড়া মহাশয় পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন। সাধারণ পাতলা চিঠির কাগজে, বেগুনি রঙের ম্যাজেণ্টা কালি দিয়া লেখা—উপর স্থানের নাম নাই, তারিখ নাই—নিম্ন প্রকারে লিখিত—

শ্রীশ্রীদুর্গা
স্বহায়

প্রণাম পূর্বক নীবেদনঞ্চ বিসেস—

তোমার মোতিশ্চন্য ধরিআছে। মোনে করিআছ রসমই মরিআছে, আপোদ গিআছে এইবার বিবাহ্ করি। আমি মরিআছি বটে কিন্তু তাই বলিযা তুমি নিষ্কিতি পাইআছ তাহা মোনেও করিও না। বাড়ির সনমুখে জে বড বটগাচ আছে তাইতে আমি আজ কাল বাস করিতেছি। তুমি কি কর কোতায় যাও সমস্তই আমি সেখানে বসিয়া দেখিতেছি। রাত্তিরে গাচ হইতে নামিযা মাজে মাজে তোমার সযন ঘরে যাই। তোমার খাটের চারিদিকে ঘুরিয়া বেডাই। এক একবার ইচ্ছা করে গলাটা টিপিযা দিআ তোমাকেও আমার সঙ্গি করি। আমার একানে বডডো একলা বোধহয়। আমার চেহারা একন ওতিশয় খারাপ হইয়া গিআছে। আমার গাএর মাংসো চামড়া আর কিছুই নাই। খালি হাড় আছে তাও সাদা নয়। গংগাস্তিরে আমাকে যে পোড়াইআছিলে তাইতে হাড়গুনো কালো কালো হইযা গিআছে। যাহা হউক নিজের রূপ বন্ননা নিজের মুখে শোভা পায় না। বিবাহ করিও না। করিলে তোমার নলাটে অসেস দুগর্গতি নেকা আছে।

রসমই।

পত্র পড়িয়া খুড়া মহাশয়েরও মুখ কালিমাময় হইয়া গেল। ভীতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ হাতের লেখা কার চিনতে পারছ ?"

"খুব চিনি। তারই হাতের লেখা।"

"অন্য কেউ জাল করেনি ত ?"

"ভগবান জানেন।"

খুড়া মহাশয় নিকটস্থ চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ ছাদের কড়িকাঠের পানে চাহিয়া বলিযা উঠিলেন, "জয়রাম—সীতারাম—রাম রাঘব-রাবণারি—রাম—রাম—রাম।"

খুড়া মহাশয়কে এতদবস্থায় দেখিয়া, ক্ষেত্রমোহনের আরও ভয় হইল। বলিলেন, "আচ্ছা খুড়ো মশায়—ভূতে কখন চিঠি লেখে?"

খুড়া মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "ভূত বলতে নেই—ভূত বলতে নেই—উপদেবতা বল। জয় রাঘব রামচন্দ্র।"

দুইজনেই নির্বাক অবশেষে খুড়া মহাশয় বলিলেন, "দেখ—কারুর বদমাইসি নয় ত? এমনটাই কী হতে পারে? অনেক রকম ভৌতিক উপদ্রবের কথা শুনেছি বটে—কিন্তু এ রকমটা—কখনও ত শোনা যায়নি। আচ্ছা বউমার হাতের লেখা আগেকার চিঠিপত্র কিছু আছে কি? লেখাটা মিলিয়ে দেখলে হয়।'

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, "পুরানো চিঠি আছে বইকি।"—বলিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া চারি পাঁচখানা বাহির করিয়া আনিলেন।

খুড়া মহাশয় চশমার কাঁচ দুইখানি কোঁচার কাপড়ে ভাল করিয়া মার্জনা করিয়া লইলেন। পরে পত্রগুলি লইয়া অত্যন্ত সাবধানে হস্তাক্ষর মিলাইতে লাগিলেন। অবশেষে সগুলি টেবিলের উপর ফেলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন 'একই হাতের লেখা ত দেখছি। খামখানা উল্টিয়া পাল্টিয়া দেখিতে লাগিলেন। এক পয়সার ছয়খানাওয়ালা সাধারণ সাদা খাম। তাহাতে একখানি দুই পয়সার টিকিট আঁটা আছে ক্ষেত্রমোহনের হাতে খামখানি দিয়া বলিলেন কোথাকার ছাপ দেখ ত?'

ক্ষেত্রবাবু বাঙ্গালানবিস মোক্তার হইলেও ইংরাজি ছাপার অক্ষর পড়িতে পারিতেন। ছাপ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন গুপ্তিপাড়ার ছাপ কালকের তারিখ"

খুড়া মহাশয় চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। মাঝে মাঝে কেবল অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিলেন, 'জয় রাম—শ্রীরাম—সীতারাম।

কাছারির বেলা হয় দেখিয়া মোক্তারবাবু স্নান করিয়া আহারে বসিলেন—কিন্তু কিছুই খাইতে পারিলেন না। রান্নাঘরের বারান্দায় যেখানে বসিয়া তিনি আহার করিতেছিলেন, সেখান হইতে বটগাছটার অগ্রভাগ দেখা যায়। খান, আর মাঝে মাঝে সেই গাছটার পানে চাহেন। এক সময় গাছের একটা ডাল খড় খড় করিয়া নড়িয়া উঠিল। কাহার যেন হাসিরও শব্দ শুনা গেল ক্ষেত্রমোহনবাবুর আর খাওয়া হইল না উঠিয়া পড়িলেন মুখ প্রক্ষালন করিয়া বাহিরে আসিয়া বটগাছটার পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। দুই তিনটা কাঠবেড়ালী ডালে ডালে পরস্পরকে তাড়া করিয়া ফিরিতেছে গোটাকতক কাক উচ্চশাখায় বসিয়া জাতীয় সঙ্গীত গাহিতেছে। ইহা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় ক্ষেত্রমোহনের শয়নকক্ষে খুড়া ভাইপো বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন। দিবসে খুড়া মহাশয় কপাটের বাহিরে এবং ভিতরে দেওয়ালময় রামনাম লিখিয়া দিয়াছেন। অদ্য দুইজনেই এক শয্যায় শয়ন করিবেন। বালিশের তলায় একখানি কৃত্তিবাসী রামায়ণ রক্ষিত হইবে এবং ঘরে

সমস্ত রাত্রি আলো জ্বলিবে বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে।

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, "তা হলে খুড়ো মহাশয়, কি করা যায় ? বিবাহটা বন্ধই করে দেওয়া যাবে ?"

খুড়া মহাশয় বলিলেন, "আমি ত তার দরকার দেখছিনে।"

"যদি কোনও উপদ্রব অত্যাচার হয় ?"

খুড়া মহাশয় কিয়ৎকাল চিন্তা করিলেন। শেষে বলিলেন, "ভয়ের কোনও কারণ দেখিনে।"

"ঐ যে বলেছে ইচ্ছা করে তোমার গলাটা টিপে দিই ?"

"না—তা পারবে না। হাজার হোক স্বামী ত বটে।"

"আর যে বলেছে বিয়ে করো না, করলে তোমার অশেষ দুর্গতি হবে ?"

"অশেষ দুর্গতি হবে, তার মানে এ নাও হতে পারে যে আমি তোমার অশেষ দুর্গতি করব। ওর মানে বোধ হয় এই যে, অধিক বয়সে বিবাহ করলে যে সমস্ত সাংসারিক অশান্তি উপস্থিত হয়, তাই তোমারও অদৃষ্টে ঘটবে।"

ক্ষেত্রমোহনবাবু চুপ করিযা রহিলেন। মনে ভয়ও যথেষ্ট আছে—অথচ বিবাহ করবার লোভটিও সম্বরণ করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য।

পরদিন আশীর্বাদ হইয়া গেল : কিন্তু ক্ষেত্রমোহন যে ভৌতিক পত্র পাইয়াছেন সে কথাও রাষ্ট্র হইতে বিলম্ব হইল না। নায়েব রজনীবাবুরও কানে ক্রমে এ কথা পৌঁছিল। বলিয়াছি তিনি ইংরাজি জানা ব্যক্তি, শুনিয়া হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন "ভূত ! এই বিংশ শতাব্দীতে ভূত বিশ্বাস করতে হবে ?"

বিবাহের দিনস্থির হইযাছে ৮ই ফাল্গুন। আর পাঁচ দিন মাত্র বাকি আছে। উভয় পক্ষ হইতে সমস্ত আয়োজনাদি হইতেছে। বিকালে বৈঠকখানায় ক্ষেত্রমোহন জনকয়েক বন্ধুবান্ধবসহ বসিয়া ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন সরকারি উকিল—নাম মনোহরবাবু। লোকটির বয়স চল্লিশ পার হইয়াছে। চোখে সোনার চশমা। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল—মুখমণ্ডল প্রচুর গোঁফদাড়িতে আবৃত—হাতে বড় বড় নখ—এক কথায়,—লোকটি থিয়জফিস্ট। ক্ষেত্রবাবুর ভৌতিক পত্রপ্রাপ্তির সমাচার অবগত হইয়া অবধি, মনোহরবাবু ইঁহার সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়া লইয়াছেন। অপর একজন নব্য যুবক—নাম সুরেন্দ্রনাথ। ইনি এল্ এ ফেল করা শিক্ষিত মোক্তার। বিস্তর ইংরাজি উপন্যাস পাঠ করিয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ক্ষেত্রবাবু, একটা কথা আমার মনে হচ্ছিল। অনেক উপন্যাসে পড়া গেছে, একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল, যেমন রেলে কলিশন বা নৌকাডুবি বা আর কিছু সকলেই মনে করছে অমুক লোকটা মরে গেছে, মৃত্যুর চাক্ষুষ সাক্ষীরও অভাব নেই, কিন্তু বইয়ের শেষ দিকটায় দেখা গেল সে বেঁচে আছে। তাই আমার মনে হয়, হয় আপনার স্ত্রী এখনও বেঁচে আছেন, নয় এ চিঠি জাল। কিন্তু আপনার দৃঢ় বিশ্বাস এ চিঠি তারই হাতের লেখা—জাল নয়। সুতরাং আপনার স্ত্রী বেঁচে আছেন বিশ্বাস করা ছাড়া আর উপায়ান্তর নেই। কারণ, এ বিংশ শতাব্দীতে, ভূতের অস্তিত্ব কোন মতেই বিশ্বাস করতে পারা যায় না।"

থিযজফিস্ট উকিলবাবুটি ইহা শুনিযা বলিলেন, "কেন মশাই—বিংশ শতাব্দীতে ভূতেব অস্তিত্ব কোন মতেই বিশ্বাস কবতে পাবেন না কেন ?"

নবীন মোক্তাববাবু বলিলেন—"কাবণ আমি কখনও দেখিনি।"

শুনিযা মনোহববাবু বিজ্ঞভাবে হাস্য কাবযা বলিলেন—"সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডকে কখনও দেখেছেন ?"

"না, দেখিনি।"

"তিনি আছেন বলে বিশ্বাস কবেন ?"

"কবি। তাব কাবণ, আমি না দেখলেও, হাজাব হাজাব লোক তাঁকে দেখেছে। তাঁব দশ বিশখানা ছবিও দেখেছি। কিন্তু 'ভূত আমি নিজে দেখেছি এমন কথা আজ পযন্ত কাউকে বলতে শুনলাম না। সবাই বলে, খুব বিশ্বস্ত লোকেব মুখে শুনেছি যে তাবা স্বযং ভূত দেখেছে।"

মনোহববাবু তাঁহাব সুঘন দাড়িব মধ্যে দীর্ঘনখ অঙ্গুলিগুলি চালনা কবিতে কবিতে বলিলেন, "আপনি বললেন, হাজাব হাজাব লোকে সম্রাটকে দেখেছে তেমনি হাজাব হাজাব লোক অশবীবী আত্মাকে প্রত্যক্ষ কবেছে। আপনি বললেন যে সম্রাটেব দশ বিশখানা ছবি দেখেছেন। তেমনি দশ বিশখানা ভূতেবও ছবি আপনাকে আমি দেখাতে পাবি। যদি দেখতে চান, একদিন আমাব বাড়িতে যাবেন। আমাব একখানা বইযে কেটি কিংএব ছবি আছে। প্রথম চার্লসেব সময কেটি কিং নামে একটি মেযে জীবিত ছিলেন। ষোল বৎসব বযসে তাঁব মৃত্যু হয। গত শতাব্দীব মধ্যভাগে আমেবিকা ও ইউবোপেব নানা স্থানে অনেক সেযাসে, কেটি কিং স্থূলশবীব ধাবণ কবে আবির্ভূত হযেছিলেন তাঁব নাড়ি পবীক্ষা কবা হযেছে, তাঁব শবীবে ছুবি ফুটিযে দিযে দেখা হযেছে ঠিক মানুষেব মত বক্তপাত হয, তাঁব ফোটোগ্রাফ পযন্ত তোলা হযেছে ফোটোগ্রাফ থেকে তৈবি ছবি আমাব বইযে আছে—আসবেন দেখাব।'

সুবেন্দ্রবাবু মৃদু মৃদু হাস্য কবিযা বলিলেন, 'আপনাবাও যেমন ভাল মানুষ। ঐ সব বিশ্বাস কবেন? ভূতবাদীদেব কত জোচ্চুবি ধবা পড়েছে তাব সংখ্যা নেই। কেটি কিংএব দেহে ছুবি ফুটিযে বক্তপাত হযেছে ঐটে আপনি বিশ্বাসযোগ্যতাব প্রমাণ বলে উল্লেখ কবলেন। আমাব ত ঠিক উল্টো মনে হয ছুবি ফোটালে বক্ত না পড়ত অথচ শবীবী মানুষ একটা দাঁড়িযে বযেছে দেখছি তা হলে ববং বিশ্বাস হত এটা বাস্তবিক মানুষ নয। এ ক্ষেত্রে দেখুন ভূত তিনি বাড়িব সামনেই বটগাছে থাকেন। চিঠি যখন লিখতে পাবেন, তখন অনাযাসেই মূর্তিগ্রহণ কবে নিজেব বক্তব্য বলে যেতে পাবতেন। কিন্তু তা না কবে খাম কাগজ কালি, কলম সংগ্রহ কববাব কষ্ট স্বীকাব কবলেন। এইটুকু থেকে এইটুকু—চিঠিখানি টেবিলেব উপব বেখে গেলেই হত তা না কবে এক মাইল দূবে পোস্ট আপিসে গেলেন তাকে পোস্ট কবতে। আবাব দুটো পযসা খবচ কবে টিকিট কিনতে হল। মশায, ভৌতিক জগতে পযসা যদি বাস্তবিকই এত সস্তা হয, তা হলে না হয সেইখানে গিযেই প্র্যাকটিস শুরু কবি।"

মনোহববাবু একটু বিবক্তিব সহিত বলিলেন "মশায, জিনিসটা হাসি তামাশাব নয। এসব গভীব বিষয। অনেক চর্চা, অনেক আলোচনা না কবে এ বিষযে মতামত প্রকাশ কবা উচিত নয। ভৌতিক জগৎ থেকে ডাকে চিঠি আসা এই প্রথম নয। হিমালয থেকে মহাত্মাবাও মাঝে মাঝে ডাকে চিঠিপত্র লিখে

থাকেন। কুটুম্বিলাল নামক এক মহাত্মা এ বকম অনেক চিঠি আমাদেব মাদাম ব্লাভাটস্কিকে লিখেছিলেন। তাঁবাও মনে কবলে সাক্ষাৎ আবির্ভাব হযে বক্তব্য বলে যেতে পাবতেন কিম্বা চিঠি উডিযে টেবিলেব উপব ফেলে যেতে পাবতেন—কিন্তু ডাকেই তাঁবা চিঠিপত্র পাঠাতেন।"

ইহা শুনিযা শিক্ষিত মোক্তাববাবু মৃদু মৃদু হাস্য কবিতে লাগিলেন। বলিলেন, "কুটুম্বিলালেব চিঠি ত কোন কালে জাল বলে সাব্যস্ত হযে গেছে। ডাক্তাব হজসন বলে একজন বৈজ্ঞানিক নিজে ভাবতবর্ষে এসে এ বিষযে অনুসন্ধান কবে প্রমাণ কবে দিযেছেন যে মাদাম ব্লাভাটস্কি আব দামোদব বলে এক ব্যক্তি সব চিঠি জাল কবেছিলেন।"

একথা শুনিযা থিওজফিস্ট বাবুটি ভ্রূকুঞ্চিত কবিযা বিবক্তিব স্ববে বলিলেন. "ও সব ঈর্ষাপবাযণ লেখকেব বই পডবেন না। আমাব কাছে আসবেন, ভাল ভাল বই সব আপনাকে পডতে দেব। তা পডলে আপনাব সমস্ত অবিশ্বাস দব হযে যাবে। মাদাম ব্লাভটস্কি যে কতবড লোক তা তাঁব 'আইসিস আনভেল্ড বইটি পডলেই বুঝতে পাববেন।"

সুবেন্দ্রবাবু মুচকিযা হাসিযা বলিলেন. "সে বইটি পডিনি বটে. তবে এডমণ্ড গ্যাবেট প্রণীত আইসিস ভেবি মচ আনভেল্ড—অব দি স্টোবি অব দি গ্রেট মহাত্মা ফোক্স' বইটি পডেছি। লাইব্রেবীতে আছে। দেখতে চান ত এনে দিতে পাবি।"

এ কথায় মনোহববাবু বাগিযা আগুন হইযা উঠিলেন। বলিলেন ওই আপনাবা এক কথা শিখে গেছেন। গাল দেওযা যায না এমন ভাল জিনিসই নেই। যত সব কুচক্রী বদমাযেস লোক মিছামিছি মাদামেব অপবাধ বটনা কবেছে।

'মন সমষ বাহিবে শব্দ উত্থিত হইল বাবু চিঠি আছে পবমুহূর্তে ডাকপিযন প্রবেশ কবিযা ক্ষেত্রবাবুব হাতে একখানি পত্র দিল পত্রখানি হাতে লইযাই ক্ষেত্রমোহনবাবুব চক্ষুস্থিব হইযা গেল বলিলেন 'মশাই—আবাব সেই '

পত্র খুলিযা পাঠ কবিযা সেখানি সকলেব সম্মুখে ফেলিযা দিলেন। থিযজফিস্ট বাবুটি অতি আগ্রহেব সহিত সেখানি কুডাইযা লইযা পাঠ কবিলেন। শেষে নবীন মোক্তাববাবুটিব হাতে সেখানি দিলেন।

পত্রখানি এইরূপ—

শ্রীশ্রী দুর্গা

স্বহায

প্রণাম পূবক নীবেদনঞ্চ বিসেস

এত সাহস তোমাব। আসিব্বাদ পজন্ত হইযা গিআছে। তুমি মোনে কবি আছ আমি তোমায জে পত্র লিখেছিলাম তাহা ফাকা আওযাজ। বসি বার্মান তেমন মেযে নয। আমি মানা কবা সতোও বিবাহ কবিবে। একনও সাবধান হও। এ দুবমোতি পবিত্যাগ কব। নহিলে একদিন গভিব বাত্তিবে তুমি যকন ঘুমাইযা থাকিবে বটগাচ হইতে নামিযা তোমাব বুকে একখান দসমুনে পাতব চাপাইযা দিব। ঘুম আব ভাঁগিবে না। বসমই।

একে একে সকলে পত্রখানি পড়িলেন। পড়িয়া স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। শিক্ষিত মোক্তারবাবুরও মুখ শুকাইয়া গেল। তথাপি তিনি মন হইতে সংশয় দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা ক্ষেত্রবাবু—আর একবার বেশ করে লেখাটা পরীক্ষা করে দেখুন দেখি। আপনার স্ত্রীর হাতের লেখাই বটে ত? না কোন জায়গায় কোন সন্দেহজনক তফাৎ আছে?"

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, "কোন সন্দেহ নাই। শুধু হাতের লেখার মিল হলেও বা সন্দেহ করতাম। তার যেখানে যেখানে যে যে বানান ভুল চিরকাল হত, এচিঠিতেও তাই। সে চিরকালই শ্রীশ্রী এক জায়গায়, দুর্গা একটু তফাতে লিখত—এ দুখানা চিঠিতেও তাই। তা ছাড়া, চিঠিতে এমন সব কথাবার্তা রয়েছে যা সে জীবিত কালেও মুখে সর্বদা ব্যবহার করত।

সকলে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎপরে সুরেন্দ্রবাবু গলা ঝাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁর মৃত্যুর সময় আপনি উপস্থিত ছিলেন?

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, 'ছিলাম বইকি।

"সঙ্গে সঙ্গে ঘাটে গিয়েছিলেন?"

"গিয়েছিলাম।'

"চিতার উপর তাঁর দেহ রাখবার পর তাঁর মুখ আপনি আর দেখেছিলেন?"

"দেখিনি আবার? আমি নিজেই ত মুখাগ্নি করেছি ওহে তুমি যা ভাবছ তা নয়। কোনও ভুল হয়নি।'

নব্য মোক্তারবাবু তখন ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিলেন।

একজন বলিল—

"There are more things in heaven and earth, Horatio than are dreamt of in your philosophy"

(হে হোরেশিও- স্বর্গে ও মর্ত্যে এমন অনেক জিনিস আছে, যাহার বিষয় তোমার দর্শনবিজ্ঞান স্বপ্নেও অবগত নহে)।

অপর একজন বলিলেন, "তা ত বটেই তা ত বটেই। ধরুন আমাদের দেশে শুধু আমাদের দেশই বা বলি কেন সকল দেশেই, আদিকাল থেকে যে একটা বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে ভূত বলে একটা জিনিস আছে, তার কী কিছুই ভিত্তি নেই?'

সরকারি উকিল বাবুটি বলিলেন, "শুধু অন্ধ বিশ্বাসের কথা নয়। গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ইউরোপে আমেরিকায় ভূতের অস্তিত্ব নিঃসংশয়িতভাবে প্রমাণ হয়ে গেছে। এক সময় বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠ শিক্ষিত পর্যন্ত ভূতকে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন এখন আর শিক্ষিত সমাজে সে ভাব নেই। বিখ্যাত সম্পাদক ষ্টেড সাহেব তাঁর এক গ্রন্থে লিখেছেন—"of all the vulger superstitions of the half educated, more dies harder than the absure delusion that there are no such things as ghosts (অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তিগণের মনে যতগুলি ইতরজনোচিত কুসংস্কার আছে, তাহার মধ্যে 'ভূত নাই' এই অদ্ভুত ভ্রমটিই সর্বাপেক্ষা প্রবল"—বলিয়া বিজয়ী বীরের মত তিনি সুরেন্দ্রবাবুর প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল, সেদিনকার মত সভাভঙ্গ হইল। সেই বটগাছের তলা দিয়া যাইতে সুরেন্দ্রবাবুরও গা-টা যেন ছম্ ছম্ করিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

খুড়া মহাশয় কোথায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া, দ্বিতীয় পত্রের কথা শুনিয়া বলিলেন, "দেখ ক্ষেত্রর—ব্যাপারটা ক্রমেই গুরুতর হয়ে দাঁড়াল। বিবাহটা এখন না হয় বন্ধই রাখা যাক। আমার মতে, বৎসর পূর্ণ হলেই, গয়ায় গিয়ে একটা পিণ্ড দিয়ে এস, উদ্ধার হয় যাবেন। বৎসর পূর্ণ হতে ত আর বেশী দেরী নেই—আর মাসখানেক হলেই হয়। তখন নির্বিঘ্নে শুভকর্ম শেষ করা যাবে।"

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, "তা বেশ—সে ভাল কথা।"

কন্যার পিতাকে বলিয়া বিবাহের দিন পিছাইয়া দেওয়া হইল। নিমন্ত্রণ পত্র সমস্ত প্রত্যাহৃত হইল। গয়া-শ্রাদ্ধ সারিয়া আসিয়া ক্ষেত্রবাবু বিবাহ করিবেন ইহা সকলেই জানিতে পারিল।

ক্ষেত্রবাবুর হস্তে একটা বড় জালিযাতির মোকর্দ্দমার তদ্বিরের ভার রহিয়াছে। মোকর্দ্দমাটা দায়রা সোপর্দ হইয়াছে। সেটা শেষ না হইলে ক্ষেত্রবাবু গয়া যাইতে পারিতেছেন না। ফরিয়াদি পক্ষের সাক্ষীদিগকে সমস্ত দিন ধরিয়া তালিম দিতে হইতেছে।

মোকর্দ্দমার পূর্বদিন সন্ধ্যাবেলা কাছারি হইতে ফিরিবার সময় 'রসময়ী'র তৃতীয় পত্র ক্ষেত্রবাবুর হস্তগত হইল। তাহাতে অন্যান্য কথার সঙ্গে লেখা আছে—

"শুনিলাম না কি গয়ায় আমার পিণ্ডি দিতে যাইতেছ। ভাবিআছ বুঝি পিণ্ডি দিলে আমি উদ্ধার হইয়া যাইব তকন সচন্দে বিবাহ করিবে। গয়ায় যদি যাও তবে চোরের বেস ধরিয়া রেলগাড়িতে প্রবেশ করিয়া তোমার বুকে ছোরা বসাইয়া দিব।"

ক্ষেত্রবাবুর আর বাড়ি যাওয়া হইল না। কাছারির পোশাকেই মনোহরবাবুর বাড়ি গিয়া তাঁহাকে পত্র দেখাইলেন।

মনোহরবাবু পত্র পড়িয়া বলিলেন, "এ যে বড়ই বিপদ দেখছি। বিবাহ করবার কল্পনা আপনাকে পরিত্যাগ করতে হল।"

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, "আচ্ছা মশায়, অশরীরী আত্মা মানুষের বুকে ছুরি বসাইয়া দিতে পারে? আপনাদের থিয়জফি শাস্ত্রে কী বলে?"

মনোহরবাবু একখানি মোটা বহি আলমারি হইতে পাড়িয়া একস্থান খুলিয়া বলিলেন, "এ সম্বন্ধে থিয়জফি শাস্ত্রের মত এই। মুক্তাত্মাগণ সাধারণত অশরীরী। কিন্তু কখনও কখনও তাঁরা নিজেকে মেটিরিয়েলাইজ অর্থাৎ জড়দেহসম্পন্ন করে থাকেন। তাঁদের এমন ক্ষমতা আছে যে বায়ু থেকে, গাছপালা থেকে, ভূমি থেকে, এমন কি কাছাকাছি মানুষের দেহ থেকে, আবশ্যক পদার্থগুলি সংগ্রহ করে নিজ দেহ ধারণ করেন। সুতরাং সে অবস্থায় বুকে ছুরি

বসিয়ে দিতে পারা কিছুই আশ্চর্য নয়। আর এও বিবেচনা করুন না, যে হস্ত কলম ধরে চিঠি লিখতে সক্ষম, সে হস্ত ছবি ধরতে পারবে না কেন?"

ক্ষেত্রমোহনবাবু কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন। শেষে বলিলেন, "দেখুন, এ পত্রগুলো জাল কি না সেটা একবার ভাল করে তদন্ত করতে হচ্ছে। আমি বলি কি, এই যে কলকাতা থেকে হস্তলিপি বৈজ্ঞানিক আমাদের দায়রার মোকর্দমার সাক্ষি দিতে আসছেন, তাঁকে দিয়ে এ চিঠিগুলো একবার পরীক্ষা করালে হয় না?"

থিওজফিস্ট বাবুটি ক্ষেত্রমোহনের এ সন্দেহবাদে মনে মনে বিরক্ত হইলেন। প্রকাশ্যে বলিলেন, "তা যদি আপনার ইচ্ছা হয়, পরীক্ষা করাতে পারেন।"

পরদিন দায়রায় জালের মোকর্দমাটির বিচার আরম্ভ হইল। হস্তলিপি বৈজ্ঞানিক সফটমোর সাহেব সাক্ষ্য প্রদান করিলেন। দিনশেষে কাছারির পর, ক্ষেত্রমোহন ডাকবাঙ্গলায় গিয়া সফটমোর সাহেবকে ভৌতিক পত্র তিনখানি দিলেন। তুলনার জন্য বসময়ীর কয়েকখানি পুরাতন আসল পত্র দিয়া আসিলেন। সাহেব বলিলেন "কল্য প্রাতে পরীক্ষার ফলাফল জানাইব।"

পরদিন প্রাতঃকালে সরকারি উকিল মনোহরবাবুকে সঙ্গে লইয়া ক্ষেত্রমোহন আবার ডাকবাঙ্গলায় উপস্থিত হইলেন। সাহেব বলিলেন, "পরীক্ষাধীন পত্র তিনখানি এবং আসল পত্রগুলি সমস্তই এক হস্তের লেখা।

ইহা শুনিয়া ক্ষেত্রবাবুর মুখখানি ছোট হইয়া গেল। মনোহরবাবু বলিলেন, সাহেব অনুগ্রহ করিয়া একখানি সার্টিফিকেট লিখিয়া দিতে পারেন?"

সাহেব মনে করিলেন নিশ্চয়ই এ পত্র লইয়া একটা মামলা মোকর্দমা হইবে। আবার সাক্ষী দিতে আসিয়া ফী পাওয়া যাইবে।—সুতরাং আহ্লাদের সহিত তিনি সার্টিফিকেট লিখিয়া দিলেন।

বাসায় যাইতে যাইতে মনোহরবাবু ক্ষেত্রবাবুকে বলিলেন, 'এই চিঠিগুলির নকল আর সাহেবের সার্টিফিকেট যদি আমাদের থিয়জফিক্যাল রিভিউ নামক মাসিকপত্রে ছাপাতে পারাই তাতে আপনার কোনও আপত্তি আছে কী? –আমরা যাকে স্পিরিট-রাইটিং বলি তার সুন্দর অকাট্য প্রমাণ হবে।"

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন 'তাতে আমার আপত্তি নেই।"

পরবর্তী সংখ্যা থিয়জফিক্যাল রিভিউ পত্রে সার্টিফিকেটসহ চিঠিগুলি ছাপা হইয়া গেল। নানা স্থান হইতে বড় বড় থিয়জফিস্টগণ ক্ষেত্রমোহনবাবুকে পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ হুগলীতে আসিয়া পত্রগুলি স্বচক্ষে দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

থিয়জফিস্ট মহলে ক্ষেত্রবাবুর পশারের আর সীমা নাই—কিন্তু ইহাতে তিনি কিছুমাত্র সান্ত্বনা লাভ করিলেন না। পত্রগুলি জাল প্রমাণ হইলে তিনি বিবাহ করিয়া সুখী হইতে পারিতেন। ভয়ে গয়ায় গিয়া পিণ্ডদান করিতেও পারিলেন না। তাঁহার অদৃষ্টে বুঝি বিবাহ আর নাই।

চৈত্র মাস আসিল—বসন্তেব বাতাস বহিতেছে। দোল উপলক্ষে কাছাবি বন্ধ। ক্ষেত্রমোহন বাড়িতে বসিয়া নিজ দূবদৃষ্টেব বিষয় চিন্তা কবিতেছিলেন, এমন সময় একজন আসিয়া সংবাদ দিল হালিশহবে তাঁহাব শ্বশুববাড়িতে মহাবিপদ উপস্থিত। দোল উপলক্ষে বাজি পোড়াইতে গিয়া, একটা বোম ফুটিয়া তাঁহাব ছোট সম্বন্ধী সুবোধ বিশেষ আঘাত প্রাপ্ত হইযাছে। তাহাকে হুগলীব হাসপাতালে আনা হইযাছে।

শুনিযা ক্ষেত্রবাবু থাকিতে পাবিলেন না—গাড়ি ভাড়া কবিয়া হাসপাতাল অভিমুখে ছুটিলেন। সেখানে গিযা দেখিলেন ছেলেটিব অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। বিছানাব নিচে মেঝেব উপব বসিযা বিধবা বিনোদিনী বোদন কবিতেছেন। ক্ষেত্রমোহনকে দেখিয়া তিনি আবও বোদন কবিতে লাগিলেন।

সমস্ত দিন ঔষধ প্রয়োগ ও শুশ্রূষা চলিল। সন্ধ্যাব দিকে ডাক্তাবেরা বলিলেন আব প্রাণেব আশঙ্কা নাই।

ক্ষেত্রমোহন শ্যালিকাকে বলিলেন "সাকিনাঝি সন্ধ্যা হল – এইবাব বাড়ি চল।"

বিনোদিনী বলিলেন "আমি সুবোধকে ছেড়ে বাড়ি যেতে পাবব না।"

"সমস্ত দিন অনাহাবে আছ – স্নানাহাব পর্যন্ত হল না।"

"তা না হোক। আমি যেতে পাবব না।"

অবস্থা বুঝিযা হাসপাতালেব ডাক্তাবেবা বলিলেন, "আপনাকে বাড়ি যেতে হবে। এখানে ত বাত্রে থাকতে পাবেন না। কাল সকালে আবাব আসবেন এখন। আব কোন ভয় নেই। বিপদ যা তা কেটে গেছে। আমবা সেবা শুশ্রূষা কবব—আপনাব কোন চিন্তা নেই – আপনি বাড়ি যান।"

অনেক বুঝাইতে, বিনোদিনী সম্মত হইলেন। ক্ষেত্রমোহনকে বলিলেন "তুমি তবে আমায হালিশহবে নিয়ে চল। বাতে সেখানে থাকব। কাল ভোবে আবাব এখানে আমায পৌঁছে দিতে হবে।"

ক্ষেত্রমোহন তাহাই কবিলেন। হালিশহবে বাত্রি কাটিল।

ভোবে উঠিযা স্বহস্তে এক ছিলিম তামাক সাজিযা ক্ষেত্রমোহন ধূমপান আবম্ভ কবিযাছেন, এমন সময বাড়িব বাহিবে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। তাড়াতাড়ি হুকা বাখিযা বাহিবে গিযা দেখিলেন, লাল পাগড়িতে বাড়ি ঘেবাও কবিযা ফেলিযাছে। অশ্বপৃষ্ঠে স্বয়ং পুলিসেব সুপাবিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব দুযাবে দাঁড়াইয়া। সঙ্গে কয়েকজন দাবোগা ও হেডকনস্টেবলও আছে।

পুলিস সাহেবেব সঙ্গে ক্ষেত্রবাবুব পবিচয ছিল। নত হইযা সাহেবকে সেলাম কবিলেন।

সাহেব চুরুট মুখে বলিলেন, "হেল্লো মুখার্টিযাব টুমি হেখানে খি খড়িতেছ?"

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, "হুজুব এই আমাব শ্বশুববাড়ি।"

"ইহা টোমাব শ্বশুববাড়ি আছে? উট্টম, হামি টোমাব শ্বশুববাড়ি সার্চ খড়িবে।"

"কেন হুজুব?"

"হেখানে বোমা টৈযাড়ি হয কিনা ডেখিবে। ইহা সার্চ-ওযাবেণ্ট

আছে।"—বলিয়া সাহেব সার্চ-ওয়ারেন্টখানি ক্ষেত্রবাবুর হস্তে প্রদান করিলেন।

ক্ষেত্রবাবু সেখানি উল্টিয়া পাল্টিয়া দেখিয়া, সাহেবের হাতে ফিরাইয়া দিলেন। বলিলেন, "হুজুর মালেক—যা ইচ্ছে করিতে পারেন।"

সাহেব বলিলেন, "স্ত্রীলোক ঘনকে লুকাইয়া রাখ।"

পুলিস গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। স্ত্রীলোকগণের মধ্যে কেবল বিনোদিনী। তিনি পুলিসের ভয়ে কোথাও লুকাইবার প্রয়োজন দেখিলেন না। হরিনামের মালাটি হাতে করিয়া উঠানে তুলসীতলায় বসিয়া রহিলেন।

খানাতল্লাশি আরম্ভ হইল। বন্দুক, বারুদ, ডিনামাইট, বোমা, বর্তমান রণনীতি, যুগান্তর, গীতা, দেশের কথা, রিভিউ অব রিভিউজ প্রভৃতি কিছুই বাহির হইল না। বাহির হইল—হিন্দু সৎকর্মমালা, গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা কাশীদাসী মহাভারত এবং একখানা বটতলার ছেঁড়া উপন্যাস। ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কোনও দেশনায়কের কোনও ছবি বাহির হইল না বাহির হইল কেবল খানকতক কালীঘাটের পট এবং একখানা আর্ট স্টুডিওর গণেশ মূর্তি। জমিদারের খানকতক পুরাতন দাখিলা এবং একটা ধূলিমলিন চিঠির ফাইল বাহির হইল। বিনোদিনীর বাক্স হইতে বাহির হইল এক বাণ্ডিল চিঠি এবং খানকতক ঠিকানা লেখা শাদা খাম।

সমস্ত জিনিস উঠানে আনিয়া জমা করা হইল। একজন দারোগা কাগজপত্রগুলির ফিরিস্তি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। ক্ষেত্রমোহনও সেইখানে বসিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, সাদা খামগুলির প্রত্যেক খানিতে তাঁহারই শিরোনামা লেখা এবং রসময়ীর হস্তাক্ষর। পুলিস সাহেবের অনুমতি লইয়া খাম ও চিঠিগুলি ক্ষেত্রবাবু পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। খান কুড়ি চিঠি রহিয়াছে—সমস্তই বেগুনী রঙের ম্যাজেন্টা কালিতে, রসময়ীর হস্তাক্ষরে লিখিত। কয়েক খানি চিঠি খুলিয়া ক্ষেত্রবাবু পাঠ করিলেন। নানা অবস্থা কল্পনা করিয়া অনুমানে পত্রগুলি লিখিত। কোন কোনটাতে বটগাছে বাসস্থানেরও উল্লেখ আছে। একখানাতে আছে—"গয়ায় পিণ্ডদান করিয়া আসিয়াছ বলিয়া মনে করিও না আমি আর তোমার অনিষ্ট করিতে পারি না। এখনও রসি বামনী তোমার ঘাড় মটকাইতে পারে।" একখানাতে রহিয়াছে, "শুনিলাম বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে, এখনও সাবধান।" একখানাতে আছে, কল্য তোমার বিবাহ। এত মানা করিলাম কিছুতেই শুনিলে না। আচ্ছা বাসরঘরে আগুন জ্বালাইয়া তোমাকে ও তোমার বধূকে পোড়াইয়া মারিব।" ইত্যাদি।

সমস্ত ব্যাপারটা দিনের আলোর মত তখন ক্ষেত্রমোহনের নিকট পরিষ্কার হইয়া গেল।

বিনোদিনী তুলসীতলায় বসিয়া সমস্ত দেখিতেছিলেন। ক্ষেত্রমোহন বলিলেন—"ঠাকুরঝি, এসব কী?"

ঠাকুরঝি আপন মনে মালা জপ করিয়া যাইতে লাগিলেন।

বলবান জামাতা

নলিনীবাবু আলিপুরে পোস্টমাস্টার। বেলা অবসান প্রায় ; আপিসে নলিনীবাবু ছটফট করিতেছিলেন। আশ্বিন মাস—সম্মুখে পূজা—নলিনীবাবু ছুটির দরখাস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু এখনও হেড আপিস হইতে কোনও হুকুম আসিল না। যদি আজ পাঁচটার মধ্যেও হুকুম আসে, তবে আজই মেলে এলাহাবাদ রওনা হইবেন। এলাহাবাদে তাঁহার শ্বশুরালয়। নলিনীবাবু এই প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাইবেন। জিনিসপত্র কিনিয়া, বাক্স তোবঙ্গ সাজাইয়া, প্রস্তুত হইযা বসিয়া আছেন, কিন্তু এখনও ছুটির হুকুম আসিল না। বেলা চারিটা বাজিল। হঠাৎ টং টং করিয়া টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। বড় আশা করিয়া নলিনীবাবু টেলিফোনের নল মুখে দিয়া বলিলেন—"Yes."

কিন্তু হায়, ছুটির হুকুম আসিল না। একটা মনিঅর্ডার সম্বন্ধে কী গোলমাল ঘটিয়াছিল, তাহারই সংক্রান্ত একটা প্রশ্ন।

নলিনী হতাশ হইয়া আবার চেয়ারে আসিয়া উপবেশন করিলেন। দুই একটা টুকিটাকি কার্যের পর পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন। পত্রখানি তাঁহার স্ত্রীর লেখা। ইতিপূর্বেই সেখানি বহুবার পাঠ করা হইয়াছিল ; আবার পড়িলেন—

(একটি পাখির ছবি)
নিম্নে সোনার জলে মুদ্রিত
"যাও পাখি যেথা মম আছে প্রাণপতি"

প্রিয়তম,

তোমার সুধামাখা পত্রখানি পাইয়া মনপ্রাণ শীতল হইল। নাথ, এতদিনের পর কি দীর্ঘ-বিরহের অবসান হইবে? তোমাব চাঁদমুখখানি দেখিবার জন্যে আমার চিত্তচকোর উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে। আজ দুই বৎসর আমাদের বিবাহ হইয়াছে, এখনও একদিনের তরে পতিসেবা করিতে পাইলাম না। ছুটি হইলে শীঘ্র চলিয়া আসিও। দুঃখিনী আশাপথ চাহিয়া রহিল। দিনাজপুর হইতে মেজদি আজ আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। কতদিনে তোমার ছুটি হইবে? পঞ্চমীর দিন যাত্রা করিতে পারিবে কি? আজ তবে আসি। মনে রেখ, ভুল না।

তোমারই
সরোজিনী

নলিনীবাবু পত্রখানি উলটিয়া পালটিয়া পাঠ করিলেন। শেষে পুনর্বার তাহা পকেটে রাখিয়া দিলেন।

পাঁচটা বাজিতে আর অধিক বিলম্ব নাই। আজও ছুটির কোনও সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। নলিনীবাবু একটি মৃদু রকমেব দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার কার্যে মন দিতে চেষ্টা করিলেন। যাহা হউক, আজ চতুর্থী মাত্র। যদি আগামী কল্যও ছুটি আসে, তবুও পঞ্চমীর দিন যাত্রা করিতে সমর্থ হইবেন।

পাঁচটা বাজিতে আব যখন দুই এক মিনিট বাকি আছে, তখন আবার টেলিফোন কল ঝঙ্কাব করিয়া উঠিল। আবার নলিনীবাবু নলে মুখ দিয়া বলিলেন—"Yes"!

২

ছুটি!—ছুটি!—ছুটি!—নলিনীবাবু দুই সপ্তাহের বিদায় পাইয়াছেন। ডেপুটি পোস্টমাস্টাবকে চার্জ বুঝাইয়া দিয়া আজই রাত্রে নলিনীবাবু রওনা হইতে পাবিবেন।

সবোজিনীব পত্রে প্রকাশ, 'দিনাজপুরের মেজদি' আসিয়াছেন। ইঁহার আসিবার কথা পূর্বেই নলিনীবাবু অবগত ছিলেন, এবং সেইজন্যই বিশেষত এবার এলাহাবাদ যাইবার জন্য তাঁহার এত অধিক আগ্রহ। 'দিনাজপুরের মেজদি'র উপর তাঁহার বিলক্ষণ রাগ আছে—তাই তাঁহার সহিত এখন একবার সাক্ষাতের জন্য তিনি বড় ব্যস্ত। কিন্তু সে ব্যাপারটি কি, বুঝাইতে হইলে, মেজদির একটু পবিচয় এবং নলিনীর বিবাহ-বাসরের একটু ইতিহাস বিবৃত করা আবশ্যক।

মেজদির স্বামী মহা সাহেব-লোক -তিনি দিনাজপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। মেজদির নামটি উল্লেখ করিলেই সকলেই তাঁহাকে অনায়াসে চিনিতে পারিবেন। শ্রীমতী কুঞ্জবালা দেবীর স্বাক্ষরিত ওজস্বিনী স্বদেশী কবিতাগুলি বর্তমান সময়ের মাসিক পত্রাদিতে কে না পাঠ করিয়াছেন? সৌভাগ্যবশত ফুলার সাহেব বাঙ্গালা জানেন না, জানিলে এতদিন কুঞ্জবালার স্বামীর চাকুরিটি লইয়া টানাটানি হইত।

কুঞ্জবালা বিদুষী, সুতরাং বলাই বাহুল্য তাঁহার রসনাটি ক্ষুরধার। তিনি ইংরাজিতে শিক্ষিতা, সুতরাং তাঁহার 'আইডিয়াল' সর্ববিষয়ে সাধারণ বঙ্গললনা

হইতে বিভিন্ন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, একবার তাঁহার এক দেবর এক শিশি সুগন্ধি কিনিয়া আনিয়াছিল। দেখিয়া কুঞ্জবালা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কার জন্যে এনেছিস?"

"নিজে মাখব।"

"দূর—ও জিনিস ত কেবল স্ত্রীলোকে আর বাবুতে মাখে,—পুরুষমানুষ কখনও সুগন্ধি ব্যবহার করে?"

বালক দেবরটি, বউদিদির তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ বুঝিতে না পারিয়া ভালমানুষের মত বলিয়াছিল, "কেন? বাবুরা কি পুরুষ নয়?"

নলিনীবাবুর যখন বিবাহ হয়, তখন তাঁহার মূর্তিটি দিব্য গোলগাল নন্দদুলালি ধরনের ছিল। গাল দুইটি টেবো-টেবো, হাত দু'খানি নবনীতোপম, প্রকোষ্ঠদেশের কোমল অস্থিগুলি কোমলতর মাংসে সম্পূর্ণভাবে প্রচ্ছন্ন। শীলতার অনুমোদিত না হইলেও, বিবাহ-বাসরে কুঞ্জবালা নলিনীর দেহখানির প্রতি বিদ্রূপের তীক্ষ্ণবাণ নিক্ষেপ করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রবাবুর কাব্য কিছু কিছু পরিবর্তন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন

নলিনীর মত চেহারা তাহার
নলিনী যাহার নাম
কোমল কোমল কোমল অতি
যেমন কোমল নাম।
যেমন কোমল তেমনি বিকল,
তেমনি আলস্য ধাম,—
নলিনীর মত চেহারা তাহার
নলিনী যাহার নাম

একটি শ্লেষবাক্য মনুষ্যকে যেমন সচেতন করে দশটি উপদেশবচনেও সেরূপ হয় না। সেই শ্লেষবাক্য যদি সুন্দরীমুখনিঃসৃত হয় এবং সেই সুন্দরী যদি সম্পর্কে শ্যালিকা হন তাহা হইলে একটি শ্লেষবাক্যের ফল শতগুণ সাংঘাতিক হইয়া উঠে।

বিবাহের পর নলিনীবাবু কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহার শ্বশুর মহাশয়ও সপরিবারে কর্মস্থান এলাহাবাদে চলিয়া গেলেন। কিন্তু বিদুষী শ্যালিকার ব্যঙ্গ নলিনী কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারিলেন না।

একদা সন্ধ্যায় পোস্ট অফিস হইতে বাসায় ফিরিয়া, ইজিচেয়ারে পড়িয়া, নলিনীবাবু ধূমপান করিতেছিলেন, এমন সময় সহসা তাঁহার মনে একটা মতলবের উদয় হইল—কেন, তিনি ত চেষ্টা করিলেই এ কলঙ্ক মোচন করিতে পারেন—শরীর পুরুষোচিত দৃঢ় করিতে পারেন। পরদিন বাজার হইতে তিনি স্যাণ্ডোর ডাম্বেলাদি ক্রয় করিয়া আনিয়া, বাড়িতে রীতিমত ব্যায়াম অভ্যাস করিতে যত্নবান হইলেন। নিজ দৈনিক খাদ্যতালিকা হইতে মিষ্ট, দুগ্ধ, ঘৃত ও তণ্ডুল যথাসম্ভব কাটিয়া দিয়া, তৎস্থানে রুটি, মাংস, ডিম্ব প্রভৃতি যোজনা করিলেন। প্রথম প্রথম পাঁচ সাত মিনিটের অধিক ব্যায়াম করিতে পারিতেন না—ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন। অভ্যাসের গুণে ক্রমে প্রভাতে ও সন্ধ্যায় অর্ধঘণ্টা

কাল ধবিযা নিযমিতভাবে ব্যাযাম কবিতে লাগিলেন।

এক বৎসব এইরূপ কবিযা তাঁহাব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি বিলক্ষণ দৃঢ় হইল। তখন স্বীয় মূর্তি আবও অধিক মাত্রায পুরুষ কবিবাব অভিপ্রাযে তিনি দাড়ি কামানো বন্ধ কবিযা দিলেন। দুই একটি শিকাবী বন্ধুব সহিত মিলিত হইযা মধ্যে মধ্যে পল্লীগ্রামে গিযা হংস, বন্যশূকবাদি শিকাব কবিতেও অভ্যাস কবিলেন।

এইরূপ কবিযা দুই বৎসব কাটিযাছে। এখন আব সে নলিনী নাই। এখন তাঁহাব কপোলদেশ বসাশূন্য, চিবুকাগ্রভাগ সূক্ষ্মতাপ্রাপ্ত, হস্তপদাদি অস্থিবহুল হইযাছে, ফলত তিনি নামেব এখন সম্পূর্ণ অযোগ্য হইযা উঠিযাছেন। এমন সময় একবাব কুঞ্জবালাব সহিত সাক্ষাৎ আকাঙ্ক্ষিত। হায নামটাও যদি পবিবর্তন কবিবাব উপায থাকিত। নলিনীবাবু মনে কবিযাছেন, তাঁহাব পুত্র জন্মিলে তাহাব নাম বাখিবেন—খুব একটা ভীষণ বকমেব—কী নাম বাখিবেন এখনও স্থিব কবিতে পাবেন নাই।

৩

পবদিন বেলা দুইটাব সময, নলিনীবাবু এলাহাবাদ স্টেশনে অবতবণ কবিলেন। তাঁহাব পবিধানে পাযজামা ও লম্বা পাঞ্জাবি কোট মস্তকে পাগড়ি। হস্তে একটি বৃহদাকাব যষ্টি দেখা যাইতেছিল। জিনিসপত্রেব সঙ্গে একটি বন্দুকেব বাক্স। ইচ্ছা ছিল ছুটিতে কিঞ্চিৎ শিকাবও কবিযা যাইবেন।

স্টেশনে নামিযা চতুর্দিকে চাহিযা দেখিলেন—কই কেহ ত তাঁহাকে লইতে আসে নাই গত কল্য যাত্রা কবিবাব পূর্বে তিনি যে শ্বশুবমহাশযেব নামে চাবি আনাব টেলিগ্রাম* একটি পাঠাইযাছিলেন তাহা পৌঁছে নাই কি?

কুলি ডাকিযা জিনিসপত্র লইযা নলিনীবাবু স্টেশনেব বাহিবে গেলেন। একজন গাড়োযানকে জিজ্ঞাসা কবিলেন "মহেন্দ্রবাবু উকিলকা বাসা জানতা?"

গাড়োযান উত্তব কবিল "হা বাবু—আইযে।"

"চলো"—বলিযা নলিনী গাড়িতে আবোহণ কবিলেন

এলাহাবাদে নলিনীবাবু পূর্বে কখনও আসেন নাই, এমন কি এই তিনি প্রথম বঙ্গদেশেব বাহিবে পদার্পণ কবিযাছেন পশ্চিমেব শহবেব নূতন দৃশ্য দেখিতে দেখিতে তিনি চলিলেন।

অর্ধ ঘণ্টা পবে গাড়ি একটি বৃহৎ কম্পাউণ্ডযুক্ত বাড়িতে প্রবেশ কবিল। সম্মুখেই বাহিবটাটী বাবান্দায একটি নয দশ বৎসবেব বালিকা খেলা কবিতেছিল। বাবান্দাব নিম্নে বামে, একটা কূপ সেখানে বসিযা একজন পশ্চিমা ভৃত্য সজোবে একটা কটাহ মাজিতেছিল

গাড়ি হইতে অবতবণ কবিযা, সেই ভৃত্যকে সম্বোধন কবিযা নলিনীবাবু বলিলেন—"এই মহেন্দ্রবাবু উকিলেব বাড়ি?"

"হাঁ বাবু।"

---

* দিনকতক এইরূপ টেলিগ্রাফ প্রবর্তিত হইযাছিল কিন্তু এগুলি ছিল চিঠিব অধম।

"বাবু আছেন ?"

"না। তিনি কিদাববাবু উকিলেব বাডি পাশা খেলতে গিযেছেন।"

"আচ্ছা—ভিতবে খবব দাও—বল জামাইবাবু এসেছেন।"

এই কথা শুনিবামাত্র, যে মেযেটি বাবান্দায খেলা কবিতেছিল, সে ছুটিযা বাডিব মধ্যে গিযা গগন বিদীর্ণ কবিযা বলিল, "ওগো, তোমাদেব জামাইবাবু এসেছেন।"

ভৃত্যটিব নাম বামশবণ। সে এই কথা শুনিযা, দন্ত বিকশিত কবিযা বলিল, "আবে! জামাইবাবু ?" বলিযা সে চটপট হাত ধুইযা ফেলিযা, নলিনীকে একটি দীর্ঘ সেলাম কবিল।

তাহাব পব বামশবণ জিনিসপত্র গাডি হইতে নামাইযা ফেলিল। এদিকে বাডিব ভিতব হইতে নানা আকাবেব বালকবালিকাগণ আসিযা উঁকি মাবিযা জামাই দেখিতে লাগিল।

বামশবণ নলিনীবাবুকে বৈঠকখানাব ঘবে লইযা গিযা বসাইল। বলিল, বাবু চান কবা হোবে কি ?"

নলিনী বলিল "হ্যাঁ—স্নান কবব। তুমি গোসলখানায জল দাও।'

এই সময একজন বাঙ্গালী ঝি আসিযা নলিনীকে প্রণাম কবিযা বলিল, "ভাল ছিলেন ত ?"

'হ্যাঁ ভাল ছিলাম। তোমবা কেমন ছিলে ?'

হাসিযা ঝি বলিল, "যেমন বেখেছেন। আজ ছ'মাস আমি এ বাডিতে চাকবি কবছি, দিদিমণিকে বোজ জিজ্ঞাসা কবি, জামাইবাবু কবে আসবেন গো ?'—জামাইবাবু কবে আসবেন গো ?'—দিদিমণি বলেন এই ছুটি হলেই আসবেন। তা এতদিনে মনে পডল সেও ভাল। আপনি চান কবে ফেলুন। মা ঠাককণ জিজ্ঞাসা কবলেন, এখন কি জলটল খাবেন, না ভাত চডিযে দেওযা হবে ?

নলিনী মোগলসবাই স্টেশনে, কেলনাবেব কল্যাণে, প্রাতবাশ সমাধা কবিযা আসিযাছিলেন, বলিলেন, "এখন ভাত চডাতে হবে না,—জলটল খাব এখন।"

ঝি বলিল, "আচ্ছা তবে স্নান কবে ফেলুন। পবে আপনাকে একটি নতুন জিনিস দেখাব। আমাব বখশিসেব জন্যে কি গহনা টহনা এনেছেন বেব কবে বাখুন।" বলিযা ঝি নলিনীব প্রতি বমণীজন-সুলভ কটাক্ষপাত কবিযা, মৃদু হাস্য কবিল।

বামশবণ বলিল, "তুই বখশিস্ লিবি, হামি বুঝি বখশিস লেব না ?"

নলিনী ইহাব অর্থ কিছুই বুঝিতে পাবিল না, কেবল গম্ভীবভাবে ঘাডটি নাডিতে লাগিল।

স্নানান্তে ফিবিযা আসিযা নলিনী দেখিল, কতকগুলি বালকবালিকা তাহাব বন্দুকেব বাক্স খুলিযা বন্দুকটি বাহিব কবিযাছে। সকলে মিলিযা তাহাব ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি জোডা দিবাব চেষ্টা কবিতেছে।

তাহাদেব হাত হইতে বন্দুকটি লইযা নলিনী সাবধানে স্থানান্তবে বাখিযা দিল।

এমন সময় পূর্ব কথিত ঝি আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার কোলে একটি অল্প-বয়স্ক শিশু। তাহার মুখখানি সদ্য পরিষ্কৃত, চক্ষুযুগল এই মাত্র কজ্জলিত, মাথার চুলগুলি সাবধানে আঁচড়াইয়া দেওয়া।

ঝি শিশুটিকে হাতে করিয়া তুলিয়া নাচাইয়া বলিল, "দেখ জামাইবাবু দেখ, কেমন সোনার চাঁদ হয়েছে। যেন রাজপুত্তুরটি। নাও—একবার কোলে কর।"

নলিনী কখনই ছোট শিশু পছন্দ করিত না। তথাপি ভদ্রতাব খাতিরে বলিল, "বাঃ—বেশ ছেলেটি ত!" বলিয়া কোলে লইল।

ঝি বলিল, "বেশ ছেলেটি বললেই হয় না, এখন কি দিয়ে মুখ দেখবে দেখ।"

নলিনী পকেট হইতে দুইটি টাকা বাহির করিয়া শিশুর বদ্ধমুষ্টির মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিল।

কলিকাতাব ঝি তদ্দর্শনে গালে হাত দিয়া বলিল, "ওমা ওমা ওকি? লোকে বলবে কি গো! রূপো দিয়ে সোনার চাঁদের মুখ দেখা!"

সমবেত বালকবালিকাগণ খিলখিল করিয়া হাস্য করিয়া উঠিল। অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া, আর কোনও কথা খুঁজিয়া না পাইয়া, নলিনী বলিল, "সোনা ত আনিনি।" মনে মনে স্বীয় পত্নীর উপরও রাগ হইল। তাহার কি উচিত ছিল না পত্রে নলিনীকে লেখা যে, অমুকের সন্তান হইযাছে, তাহার মুখ দেখিবার জন্য একটা গিনি আনিও?

ঝি বলিল. "সে কথা শোনে কে? তা হলে আজই সেকরা ডেকে সোনাব গহনাব ফবমাস দাও। ছেলেব বাপ হলেই হয় না।"

নলিনীব বুদ্ধিসুদ্ধি ইতিপূর্বেই যথেষ্ট গোলমাল হইয়া গিয়াছিল; শেষের এই কথা শুনিযা সে একেবারে দিশেহাবা হইযা পড়িল। 'ছেলের বাপ হলেই হয় না' ইহাব অর্থ কী? তবে নলিনীই কি ছেলেব বাপ নাকি?

শিশুকে ঝিব কোলে ফিরাইযা দিয়া সভয়ে নলিনী জিজ্ঞাসা করিল, "ছেলেটি কবে হল?"

ঝি পুনর্বার গালে হাত দিযা বলিল, "অবাক কল্লে যে! তোমার ছেলে কবে হল তুমি জান না, পাড়ার লোককে জিজ্ঞাসা করছ?"

যে দুইটি বালকবালিকা উহারই মধ্যে একটু বয়ঃপ্রাপ্ত ছিল, তাহারা ঝির এই ব্যঙ্গোক্তি শুনিযা হাসিয়া উঠিল। ক্ষুদ্রতর বালকবালিকাগণ তাহাদের দেখাদেখি, উচ্চতব হাস্য কবিয়া মেঝেতে লুটোপুটি করিতে লাগিল।

সদ্যস্নাত নলিনীর ললাট তখন ঘর্মসিক্ত হইয়া উঠিযাছে। সে, মনের বিস্ময় মনে চাপিযা রাখিবাব প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। এ গূঢ় রহস্য ভেদ করিবার ক্ষমতা তাহাব নাই।

এই সময়ে একটি বালিকা আসিয়া, নলিনীর হাতে একটি গেলাস দিয়া বলিল, "জামাইবাবু! একটু সরবত খাও।"

নলিনী গেলাসে মুখ দিয়া দেখিল, জলটা লবণাক্ত। গেলাস নামাইয়া রাখিল। তখন হঠাৎ তাহার মনে হইল, তাহার প্রতি এই পিতৃত্ব আরোপটাও, জামাই ঠাট্টারই একটা অংশ হইবে। এই মীমাংসায় উপনীত হইয়া, নলিনীর মন একটু শান্ত হইল। তাহার কুঞ্চিত ভ্রূযুগল আবার সমতা প্রাপ্ত হইল।

সেই বৈঠকখানাব একটা কোণে, একটা কবাট খুলিবাব শব্দ হইল। কবাটেব সম্মুখস্থিত পর্দা অপসৃত কবিযা বামশবণ ভৃত্য বলিল, "বাবু আসুন—জলখাওযা দেওযা হযেছে।"

নলিনী চাহিযা দেখিল, অন্দব মহলেব একটি কক্ষ দৃশ্যমান। উঠিযা সেই কক্ষে প্রবেশ কবিল। কক্ষেব মধ্যস্থলে সুন্দব কার্পেটেব আসন পাতা বহিযাছে। তাহাব সম্মুখে রূপাব রেকাবি বাটি গেলাসে ভবা নানাবিধ খাদ্য ও পানীয়। নলিনী ধীবে ধীবে আসনখানিব উপব উপবেশন কবিযা জলযোগে মন দিল।

এমন সময কক্ষান্তব হইতে মলেব ঝুমঝুম শব্দ উত্থিত হইল একটি ক্ষুদ্র বালিকা দ্বাবপথে মুখ দিযা বলিল, "মেজদি আসছেন।"

নলিনী বুঝিল, কুঞ্জবালা আসিতেছেন। নিজ দক্ষিণ হস্তেব আস্তিন সে ভাল কবিযা গুটাইযা লইল। কুঞ্জবালা আসিযা দেখুন, তাহাব হাতেব কব্জি এখন আব সুগোল নহে মাংসল নহে পবন্তু তাহা সুপুষ্ট অস্থি ও শিবায সমাকীর্ণ।

মলেব শব্দ নিকটে হইতে নিকটতব হইতে লাগিল। "কি ভাই এ ক' দিনে মনে পড়ল?"—বলিতে বলিতে যুবতী আসিযা কক্ষমধ্যস্থলে দণ্ডাযমান হইলেন

কিন্তু তাহা একমুহূর্তেব জন্য মাত্র। চাবি চক্ষে মিলিত হইতেই সেই মহিলা একহাত ঘোমটা টানিযা দ্রুতপদে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইযা গেলেন

নলিনী দেখিল তিনি কুঞ্জবালা নহেন।

পার্শ্বেব কক্ষ হইতে দুই-তিনটি বমণীব উত্তেজিত কণ্ঠস্বব নলিনীব কাণে আসিল

কি লো পালিযে এলি যে?

'ওমা ও যে অন্য লোক

অন্য লোক কি লো আমাদেব শবৎ নয?

না শবৎ হবে কে

'কে তবে?

"আমি জানি?

এ কি কাণ্ড অচেনা লোক?

যে বকম চোযাড়ে চেহাবা আশ্চর্য নয

'ওমা কি কাণ্ড! জামাই সেজে কে এল

একজন বালকেব কণ্ঠস্বব শুনা গেল একটা বন্দুক নিযে এসেছে

'অ্যাঁ—ওমা কি সর্বনাশ হল গো! ওবে বামশবণা—বামশবণা কোথা গেলি! যা শীগগিব বাবুকে খবব দে।—বমণীগণেব দ্রুত পদধ্বনি শ্রুত হইল তাহাব পব নলিনী আব কিছু শুনিতে পাইল না।

এই সমযেব মধ্যে, অদবস্থিত একটি পুস্তকেব আলমাবিব প্রতি নলিনীব দৃষ্টি পড়িযাছিল। সাবি সাবি বাঁধান ল-বিপোর্ট প্রত্যেকখানিব নিম্নে সোনাব জলে নাম লেখা—এম এন ঘোষ।

এখন সমস্ত ব্যাপাব নলিনী দিনেব আলোকেব মত স্পষ্ট বুঝিতে পাবিল। তাহাব শ্বশুবেব নাম মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায। ইনি মহেন্দ্রনাথ ঘোষ! তবে ভ্রমক্রমে সে অন্য লোকেব শ্বশুববাড়িতে চড়াও কবিযাছে।

নলিনী তখন মনে মনে হাস্য করিতে করিতে নিশ্চিন্তমনে একে একে জলখাবারের পাত্রগুলি খালি করিয়া ফেলিল।

৪

এদিকে রামশরণ ভৃত্য ঊর্ধ্বশ্বাসে বাবুকে খবর দিতে ছুটিল। কেদারবাবু উকিলের বাসায়, ছুটির সময়, প্রায়ই পাশা খেলার আড্ডা জমিয়া থাকে। অদ্য এখানে বড় মহেন্দ্রবাবু, ছোট মহেন্দ্রবাবু (নলিনীর আসল শ্বশুর) এবং অন্যান্য অনেকগুলি উকিল সমবেত হইয়াছেন।

পাশা খেলা চলিতেছিল, এমন সময় ঝড়ের মত আসিয়া রামশরণ সেখানে প্রবেশ করিল। নিজ প্রভুকে দেখিয়া বলিল, 'বাবু—বাবু—জলদি বাড়ি আসুন—"

তাহার মুখ চক্ষু দেখিয়া ভীত হইয়া মহেন্দ্র ঘোষ বলিলেন ' কেন রে—কার অসুখ বিসুখ ?"

"বাড়িমে একঠো ডাকু এসেছে।'

সকলেই উৎসুক হইয়া উঠিলেন।

মহেন্দ্র ঘোষ বলিলেন, "ডাকু ? দিনের বেলায় ডাকু ?"

রামশরণ বলিল, "ডাকু হোবে কি জুয়াচোর হবে কি পাগল আদমি হোবে কিছু ঠিকানা নাই। সে বলে কি হামি বাবুর দামাদ আছি।'

ইহা শুনিয়া অন্য সকলে হাস্য করিলেন। কিন্তু মহেন্দ্র ঘোষ উত্তেজিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কখন এল ? কি করছে ?

"এই তিন বাজে এসেছে। একঠো লাঠি এনেছে, একঠো বন্দুক এনেছে—অন্দরমে গিয়ে জল উল খেয়েছে মাইজি লোগকো বড়া ডর হয়েছে।"

'বন্দুক এনেছে ? লাঠি এনেছে ?—হতভাগা পাজি শয়ার—তুই বাড়ি ছেড়ে এলি কার জিম্মায় ?" বলিয়া ক্ষিপ্তের মত মহেন্দ্রবাবু বাহির হইলেন। গাড়ি প্রস্তুত ছিল। লম্ফ দিয়া গাড়িতে উঠিয়া হাঁকিলেন, ' জোরসে হাঁকাও।"

কয়েকজন উকিল সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিয়াছিলেন। কেহ বলিলেন—"বোধ হয়, পাগল হবে।" কেহ বলিলেন—' না, পাগল হলে বন্দুক আনবে কেন ? কোনও বদমায়েস গুণ্ডা হবে।" ছোট মহেন্দ্রবাবু (নলিনীর শ্বশুর) বলিয়া দিলেন, "পাগলই হোক, গুণ্ডাই হোক, ধরে পুলিসে হ্যাণ্ডোভার করে দিও।"

গাড়ি নক্ষত্রবেগে ছুটিল—বাড়িতে পৌঁছিলে, গাড়ি হইতে লাফাইয়া পড়িয়া মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, "কই ? কোথায় ?'

এমন সময় নলিনী কক্ষ হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। গৃহস্বামীকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "আপনিই মহেন্দ্রবাবু ? আপনার কাছে আমার একটা ক্ষমাপ্রার্থনা করবার আছে।"

নলিনীর ভাবভঙ্গি ও কথাবার্তায় মহেন্দ্রবাবু একটু থতমত খাইয়া গেলেন। বাড়ি পৌঁছিয়াই যেরূপ প্রহারের বন্দোবস্ত করিবেন ভাবিয়াছিলেন, তাহাতে বাধা

পড়িয়া গেল।

মহেন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আপনি ?"

"আমার নাম নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়। আমি মহেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জামাতা। মহেন্দ্রবাবু উকিলের বাড়ি গাড়োয়ানকে বলেছিলাম, সে আমাকে এখানে এনে ফেলেছে। আমি আমার ভুল এই অল্পক্ষণ মাত্র জানতে পেরেছি। এতক্ষণ চলে যেতাম। আপনাকে আনতে লোক গিয়েছে—আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে তবে যাব, এইজন্যে অপেক্ষা করছি।"

এই কথা শুনিয়া মহেন্দ্র ঘোষের রাগ জল হইয়া গেল। তিনি নলিনীর হাত দু'খানি নিজ হস্তে ধারণ করিয়া হো-হো শব্দে অনেকক্ষণ হাস্য করিলেন। শেষে বলিলেন, "মহিনের জামাই তুমি ? বেশ বেশ। দেখ, এখানে দু'জন মহেন্দ্রবাবু উকিল থাকাতে, মক্কেল নিয়ে মাঝে মাঝে গোলমাল হয় বটে। হয়ত মফস্বল থেকে কোনও উকিল, আমার কাছে এক মোকর্দমা পাঠিয়ে দিলে, মক্কেল কাগজপত্র নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হল তোমার শ্বশুরবাড়িতে। কিন্তু জামাই নিয়ে গোলমাল এই প্রথম !"—বলিয়া মহেন্দ্র ঘোষ অপরিমিত হাস্য কবিতে লাগিলেন।

তাহার পর নলিনীকে লইয়া বৈঠকখানায় বসাইলেন। কিঞ্চিৎ গল্প গুজবের পর,'নলিনীর জন্যে একটি ভাড়াটিয়া গাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। নলিনী তখন বিদায় গ্রহণ করিয়া নিজ শ্বশুরালয় অভিমুখে যাত্রা কবিল।

৫

এদিকে কেদারবাবু উকিলের বাড়িতে, সে অপরাহ্ণে পাশা খেলা আর ভাল জমিল না। মহেন্দ্র ঘোষ প্রস্থান করিলে, সে সভায় অনেকে অনেক আশ্চর্য জুয়াচুরির গল্প করিলেন। অনেক পাগলেব গল্পও হইল। ক্রমে সভাভঙ্গ হইল। উকিলগণ একে একে নিজ আলয়ে ফিরিয়া গেলেন।

মহেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি শাগঞ্জ মহল্লায়। তিনি বাড়ি ফরিয়া, চা ও তাওয়াদার তামাক হুকুম করিলেন। আপিস কক্ষে ইজিচেয়ারে বসিয়া, চা-পান করিতে লাগিলেন। ভৃত্য একটি বৃহদাকার ছিলিম আলবোলায় চড়াইয়া, গুলের আগুনে মৃদু মৃদু পাখার বাতাস করিতে লাগিল।

চা-পান শেষ হইলে, মহেন্দ্রবাবু আলবোলার নলটি মুখে করিয়া আরামে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ এইরূপে কাটিলে পর, একটি ভাড়াটিয়া গাড়ি কম্পাউণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিল। উকিলের বাড়ি, কত লোক আসে যায়, মহেন্দ্রবাবু কিছুই ব্যস্ত হইলেন না, কিন্তু চক্ষু উন্মীলন করিয়া রহিলেন।

বাহির হইতে শব্দ শুনিলেন, একটি অপরিচিত কণ্ঠস্বর বলিতেছে, "এই মহেন্দ্রবাবুর বাড়ি ?"

"হাঁ বাবু !"

"খবর দাও, বল বাবুর জামাই এসেছেন।"

এই 'জামাই' শুনিয়াই মহেন্দ্রবাবু কেদারা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। জানালার পর্দা তুলিয়া দেখিলেন—বৃহৎ যষ্টিহস্তে ষণ্ডামার্কা আকারের একজন লোক দাঁড়াইয়া আছে, গাড়োয়ান গাড়ির ভিতর হইতে একটা বন্দুকের বাক্স বাহির করিতেছে।

দেখিয়াই মহেন্দ্রবাবু হাঁকিলেন, "কোই হ্যায় রে ?"—বলিতে বলিতে বাহিরে আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইলেন।

তাঁহার মূর্তি দেখিয়া বেচারা নলিনী একটু থতমত খাইয়া গেল। মহেন্দ্রবাবু দাঁতমুখ খিচাইয়া সপ্তমে বলিলেন, "পাজি বেটা জুয়াচোর—ভাগো হিঁয়াসে। আভি ভাগো। ঘুরে ফিরে শেষে আমার বাড়িতে এসেছ ? শ্বশুর পাতাবার আর লোক পেলে না ? বেটা বদ্‌মায়েস গুণ্ডা !"

ইতিমধ্যে অনেকগুলি ভৃত্য দারোয়ান আসিয়া পড়িয়াছিল। মহেন্দ্রবাবু হুকুম দিলেন, "মারকে নিকাল দেও। গর্দান-পাকড়কে নিকাল দেও।"

ভৃত্যগণ নলিনীকে আক্রমণ করিবার উপক্রম করিল। তাহা দেখিয়া নলিনী তাহার বৃহৎ যষ্টি মস্তকোপরি ঘূর্ণিত করিয়া বলিল, "খবরদার ! হাম চলা যাতা হ্যায়। লেকেন্ যো হাম্‌কো ছুঁয়েগা, উস্‌কা হাড্ডি হাম চুরচুর কর ডালেঙ্গে।"

নলিনীর মূর্তি ও লাঠি দেখিয়া ভৃত্যগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নলিনী মহেন্দ্রবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আপনি ভুল করছেন। আমি আপনার জামাই নলিনী।"

এ কথা শুনিয়া মহেন্দ্রবাবু অগ্নিশর্মা হইয়া বলিলেন, "বেটা জুয়াচোর ! তুমি শ্বশুর চেন আর আমি জামাই চিনিনে ? আমার জামাইয়ের এ রকম গুণ্ডার মত চেহারা ?—ভাগো হিঁয়াসে—নিকালো হিঁয়াসে—নয়ত আভি পুলিশমে ভেজেঙ্গে—"

নলিনী আর দ্বিরুক্তি করিল না। গাড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়া গাড়োয়ানকে বলিল, "চলো স্টেশন।"

৬

গোলমাল থামিলে, তাওয়াদার তামাকটা শেষ করিয়া মহেন্দ্রবাবু বাড়ির মধ্যে গেলেন।

তাঁহার গৃহিণী তাঁহাকে দেখিবামাত্র বলিলেন, "মদ খেয়েছ নাকি ? জামাইকে তাড়ালে ?"

মহেন্দ্রবাবু গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "জামাই কাকে বল ? সে একটা জুয়াচোর !"

"জুয়াচোর কিসে জানলে ?"

তখন মহেন্দ্রবাবু, পাশা খেলিবার কালে কেদারবাবুর বাসায় যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন, সবই বলিলেন।

শুনিয়া গৃহিণী বলিলেন, "বেশ ত, কিন্তু তাতেই কি প্রমাণ হয়ে গেল যে সে জুয়াচোর ? দু'জনেরই এক নাম—বাড়ি ভুল করে সেখানে গিয়ে ওঠাই কি

আশ্চর্য নয় ?"

স্ত্রীর মুখে এ যুক্তি শুনিয়া মহেন্দ্রবাবু একটু দমিয়া গেলেন। লাঠি ও বন্দুক দেখিয়াই হঠাৎ তিনি বুদ্ধিহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন—এ সকল কথার ভালরূপ বিচার করিয়া দেখিবার অবসর পান নাই।

একটু ভাবিয়া মহেন্দ্রবাবু বলিলেন "সে যদি হত—তাহলে খবর দিয়ে আসত—আমরা স্টেশনে তাকে আনতে যেতাম। কথা নেই, বার্তা নেই, হঠাৎ কখনও জামাই প্রথমবার শ্বশুরবাড়ি এসে উপস্থিত হয় ? সে জুয়াচোর—জুয়াচোর।"

"কেন আসবার কথা থাকবে না ? আসবার কথা ত রয়েছে। পুজোর আগেই আসবে আমরা ত জানি—তবে ঠিক করে আসবে তা খবর ছিল না বটে।"

পিতার এই বিপদ দেখিয়া, কুঞ্জবালা বলিলেন, "ওগো সে নলিনী নয়—আমি তাকে দেখেছি।"

মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, "তুই দেখিছিস নাকি ? বল ত।—বল ত। কোথা থেকে দেখলি ?"

'যখন ওই গোলমালটা হল, আমি দোতলায় উঠে জানালা দিয়ে দেখলাম। নলিনী আমাদের ননীর পুতুল। এ ত দেখলাম একটা কাটখোট্টা জোয়ান।'

" মহেন্দ্রবাবু অত্যন্ত আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন ' ঠিক বলেছিস। আমি ত সে কথা তার মুখের উপরেই বলে দিয়েছি। আমি আমার জামাই চিনিনে ? তার কি অমন মিরজাপুরী গুণ্ডার মত চেহারা ? তার দিব্যি নধর নধর বাবু চেহারাটি। বিয়ের সময় একদিন মাত্র দেখেছি বটে—তা বলে এমনিই কি ভুল হয় ?"

এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে এমন সময় একজন ভৃত্য আসিয়া বলিল "বাবু, টেলিগেরাপ এসেছে "

টেলিগ্রাম পড়িয়া মহেন্দ্রবাবুর মুখ শুকাইয়া গেল। ইহা সেই নলিনীর প্রেরিত গতকল্যকার চাবি আনা মলোর টেলিগ্রাম।

গৃহিণী বলিলেন 'খবর কী ?

নিতান্ত অপরাধীর মত, মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে মহেন্দ্রবাবু বলিলেন 'এই ত টেলিগ্রাম এসেছে। সে তবে দেখছি জামাই ই বটে "

গৃহিণী বলিলেন, তবে এখন ফেরাবার কি উপায় হবে ''

'যাই নিজে গিয়ে দেখি। যাবার সময় গাড়োয়ানকে বলেছিল, স্টেশনে চল এখন ত কলকাতা যাবার কোনও গাড়ি নেই। বোধ হয় স্টেশনে গিয়ে বসে আছে। যাই গিয়ে বাপু বাছা বলে ফিরিয়ে আনি "

বাড়ির লোকে মনে করিয়াছিল নলিনী এই ব্যাপার লইয়া শালীশালাজকে ঠাট্টা করিয়া গায়ের ঝাল মিটাইবে। কিন্তু নলিনী ফিরিয়া আসিয়া একদিনের জন্যও সে কথা উত্থাপন করে নাই। যে ভুল হইয়া গিয়াছে তাহার জন্য তাহার শ্বশুরবাড়ির সকলেই লজ্জিত অনুতপ্ত—তাহাই নলিনীরপক্ষে যথেষ্ট হইয়াছিল। একদিন কেবল অন্য প্রসঙ্গে মহেন্দ্র ঘোষ উকিলের কথা উঠিলে সে বলিয়াছিল—"যা হোক, পরের শ্বশুরবাড়িতে উঠে যে আদর যত্ন পেয়েছিলাম—অনেকে সে রকম নিজের শ্বশুরবাড়িতে পায় না।"

নিষিদ্ধ ফল

বাগবাজারের দুর্গাচরণবাবু তাঁহার দ্বাদশবর্ষীয়া সুসজ্জিতা সালঙ্কারা কন্যাটির হস্তধারণ করিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "এইটি আমার মেজ মেয়ে রায় বাহাদুর।" কন্যাকে বলিলেন, "মা, একে প্রণাম কর।"

ভবানীপুর নিবাসী রায় প্রফুল্লকুমার মিত্র বাহাদুর পারিষদগণ পরিবৃত হইয়া দরিদ্র দুর্গাচরণের তক্তপোশে বসিয়া বাঁধা হুকায় ধূমপান করিতেছিলেন। মেয়েটি সলজ্জভাবে তাঁহার পায়ের কাছে মাথা ঠেকাইয়া, নতনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল।

রায় বাহাদুরের বয়স পঞ্চাশৎ বর্ষ হইবে। দিব্য গৌরবর্ণ পুরুষ, মোটাসোটা, হাস্যোজ্জ্বল বড় বড় চক্ষু, গোঁফ ও দাড়ি দুই-ই কামানো। খুব চওড়া হাসিয়াযুক্ত বহুমূল্য শালের জোড়া গায়ে দিয়া বসিয়া ছিলেন। প্রসন্নদৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত কন্যাটির পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "বাঃ বেশ মেয়ে, খাসা মেয়ে, বেঁচে থাক মা সুখে থাক। দিব্য মেয়েটি, নয় হে সুরেশ?"

সুরেশ নামা পারিষদ বলিল, "আজ্ঞে তার আর সন্দেহ কী?"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "মা, তোমার নামটি কী বল ত?"

মেয়েটির ওষ্ঠযুগল ঈষৎ কম্পিত হইল, কিন্তু কোন শব্দ উচ্চারিত হইল না। দুর্গাচরণবাবু উৎসাহ দিয়া তাহাকে বলিলেন, "বল মা বল।"

মেয়েটি তখন অর্ধস্ফুট স্বরে বলিল, "শ্রীমতী নন্দরাণী দাসী।"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "নন্দরাণী? বেশ। নামটিও বেশ। কেমন হে যতীনদাদা?"

যতীন্দ্র-নামধারী পারিষদ বলিল, "খাসা নাম।"

দুর্গাচরণবাবু বলিলেন, "নন্দরাণী নাম—বাড়িতে সবাই রাণী বলে ডাকে।"

"রাণী ? তা আপনার মেয়ে রাজরাণী হওয়ারই উপযুক্ত বটে। মুখখানি নিখুঁৎ। চোখ দুটিও চমৎকার। ঘোষাল মশায় কী বলেন ?"

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "এ মেয়ে আপনারই পুত্রবধূ হবার উপযুক্ত।"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "তা মা, দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? বস, এখানে বস। দুর্গাচরণবাবু, আপনিই বা দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ? বসুন।"

মেয়েটি ইতস্তত করিতেছিল। তাহার পিতা বলিলেন, "বস মা, বস।" বলিয়া নিজেও উপবেশন করিলেন। মেয়েটিও মাথা নিচু করিয়া পিতার কাছ ঘেঁষিয়া বসিল।

রায় বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কী পড় মা ?"

"আখ্যানমঞ্জরী দ্বিতীয় ভাগ, পদ্যপাঠ প্রথমভাগ আর সরল শুভঙ্করী।"

"পান সাজতে জান ?"

"জানি ?"

দুর্গাচরণ বলিলেন, "আমার বড় মেয়ে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে অবধি বাড়ির সব পান ঐ ত সাজে। যা খেলেন, ওরই সাজা পান।"

রায় বাহাদুর রুপার ডিবা হইতে একটা পান লইয়া কপ করিয়া মুখে দিয়া চিবাইতে চিবাইতে বলিলেন, "বেশ পান। রান্না-বান্না কিছু শিখেছ মা ?"

রাণী বলিল, "শিখেছি।"

"তাও শিখেছ ? বেশ বেশ। আলুভাজা, পটলভাজা, মাছের ঝোল—এ সব রাঁধতে পার ?"

মেয়েটি ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "পারি।"

রায় বাহাদুর তাহার স্কন্ধদেশে সস্নেহে মৃদু মৃদু আঘাত করিতে করিতে বলিলেন, "এরই মধ্যে শিখেছে ? লক্ষ্মী মেয়ে!"

দুর্গাচরণবাবু বলিলেন, "আমি আর বাপ হয়ে কী বলব রায় বাহাদুর—যদি আমার মেয়েটিকে গ্রহণ করেন তবে দেখতেই পাবেন। গত মাসে আমার স্ত্রী যখন আঁতুড়ে, বড় মেয়েটি শিবপুরে, অনেক কাকুতি, মিনতি করাতেও বেয়াই মশাই তাকে পাঠালেন না, রাণীই আমাদের সংসার চালিয়ে দিয়েছে। ওকে যদি নেন, সবই জানতে পারবেন।"

মাথাটি দুলাইতে দুলাইতে সহাস্যে রায় বাহাদুর বলিলেন, "নেব না ? নেব না ? লুফে নেব। এমন মেয়ে পেলে কেউ ছাড়ে ? কী বল হে সতীশ ?"

সতীশ বলিল, "আজ্ঞে তার আর সন্দেহ কী!"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "আচ্ছা, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তার পর মাকে ছুটি দিই।" বলিয়া নন্দরাণীর স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া তাহার দিকে ঝুঁকিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ মা, আমার মাথার পাকাচুল তুলে দিতে পারবে ? দুপুরবেলা, খেয়ে যখন আমি শোব, বিছানায় তোমার এই বুড়ো নতুন বাবাটির কাছে বসে বসে, একটি একটি করে পাকাচুল তুলে দিতে পারবে কী ? এটি বোধ হয় শেখনি, কি বল মা ? তোমার বাবার মাথায় ত পাকাচুল নেই!" বলিয়া তিনি উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।

নন্দরাণীর মুখেও ঈষৎ হাস্যসঞ্চার হইল'। মুখটি তুলিয়া সে রায় বাহাদুরের মস্তকখানির দিকে চাহিল। দেখিল, সেখানে "কলো সুজনা ইব" চুলের সংখ্যা খুবই কম এবং দুব দূরান্তে অবস্থিত।

তাহার মৌনতাতেই সম্মতিজ্ঞান করিয়া রায় বাহাদুরে বলিলেন, "আচ্ছা মা, সে পরীক্ষাও হবে। যাও এখন বাড়ির ভিতরে যাও।"

বাহিরে ঝি দাঁড়াইয়া ছিল। নন্দরাণী তক্তপোশ হইতে নামিবামাত্র, সে আসিয়া তাহার হস্তধারণ করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বৈঠক হইতে হুঁকাটি তুলিয়া লইযা প্রায় এক মিনিট কাল রায় বাহাদুর নীরবে ধূমপান করিলেন। পরে হুঁকা দুর্গাচরণবাবুর হাতে দিয়া বলিলেন, "তার পর ভায়া, কবে বিয়ে দেওয়া যায় তোমার মত বল। ঐ যা, একবারে আপনি থেকে তুমি বলে ফেললাম!"

দুর্গাচরণবাবু বলিলেন, "তুমিই বলুন। 'আপনি' বললেই বরং আমাকে লজ্জা দেওয়া হয়। আমি আপনার চেয়ে সব বিষয়েই ছোট। বয়সে—ধনে—মানে—"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "হ্যাঁ হে, হ্যাঁ, তুমি বয়সে আমার চেয়ে ছোট তা ত স্বীকারই করছি। তা বল্লে, চুল পেকেছে বলেই আমি যে খুব বুড়ো হয়ে গেছি তা ভেব না—হা হা হা।" বলিয়া তিনি দুর্গাচরণবাবুর পৃষ্ঠ চাপড়াইয়া দিলেন। পারিষদগণও খুব হাসিতে লাগিল।

দুর্গাচরণবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "যবে অনুমতি করেন তবেই বিবাহ হতে পারে। এই ফাল্গুন মাসেই হোক। তবে আমি অতি সামান্য লোক—গরীব—"

রায় বাহাদুর বলিতে লাগিলেন, "গরীব ত হয়েছে কী? গরীব ত হয়েছে কী? গরীবই বা কিসের? তুমি কী কারু কাছে ভিক্ষা চাইতে গিয়েছ? আর হলেই বা গরীব? গরীবের মেয়ের কী বিয়ে হবে না? সে আইবুড়ো থাকবে? হিন্দুশাস্ত্রের এমন বিধান নয়। তুমি বোধ হয় আজকালের বরপণ প্রথা ভেবে এ কথা বলছ? সে প্রথার আমি বিরোধী—ভয়ঙ্কর বিরোধী।"

দুর্গাচরণবাবু বলিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই কথা শুনেই ত—"

"শুনেই ত কী? পড়নি? আমার 'সামাজিক-সমস্যা-সমাধান' কেতাব পড়নি? তাতে বরপণ বলে একটা চাপ্টারই যে রয়েছে। বরপণ প্রথাকেই আমি যাচ্ছেতাই করে গালাগালি দিয়েছি—একেবারে যাচ্ছেতাই করে—পড়নি?"

দুর্গাচরণবাবু বলিলেন, 'পড়েছি বই কী। আপনার বই কে না পড়েছে? আপনি একজন বিখ্যাত গ্রন্থকার।"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "কোথা বিখ্যাত? হ্যাঁ—বঙ্কিম একজন বিখ্যাত গ্রন্থকার বটে। সে আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু কিনা। প্রেসিডেন্সি কলেজে একসঙ্গে আইন পড়তাম। আজকের কথা? বঙ্কিমের খুব নাম হয়েছে বটে।

তাব একখানি নতুন বই বেবিয়েছে, বাজসিংহ। পড়েছ ? হু হু কবে বিক্রী হচ্ছে। অথচ আমাব বই পোকায কাটছে, কেউ কিনছে না। তাই বঙ্কিমকে বলছিলাম সেদিন।"

একজন ঔৎসুকেব সহিত জিজ্ঞাসা কবিল, "কী কথা হল ?"

বায বাহাদুব বলিতে লাগিলেন "বঙ্কিমকে বললাম, ওহে তোমাব যে বকম নাম হযেছে, তুমি এখন ঐ সব লভ আব লড়াই ছেড়ে, এমন খানকতক উপন্যাস লেখ যাতে দেশেব উপকাব হয। আমাব কথা ত কেউ শোনে না, তোমাব কথা শুনবে। এই যে ববপণ প্রথাটি সমাজেব মধ্যে প্রবেশ কবেছে, ক্রমে যে সর্বনাশ হযে যাবে। ববপণ প্রথাব দোষ দেখিযে চুটিযে একখানা নভেল লেখ দেখি। আব একখানা লেখ যা পড়ে বাঙ্গালীব বিলাসিতা—বিশেষ চা খাওযাটা—একটু কমে। একখানা লেখ, যৌথ কাববাব সম্বন্ধে। কেন বাঙ্গালীব যৌথ কাববাব ফেল হযে যায, কী কী উপায অবলম্বন কবলে তা সফল হতে পাবে, তাব বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটি বেশ কবে বুঝিযে দাও। প্লটও তোমায বলে দিচ্ছি। তাতে দেখাও যে জনকতক বাঙ্গালী যুবক কলেজ থেকে বেবিযে, এক সঙ্গে মিলে যৌথ কাববাব আবম্ভ কবলে, আব দিন দিন তাদেব খুব উন্নতি হতে লাগল। ক্রমে তাবা এক একটি লক্ষপতি হযে দাঁড়াল গভর্ণমেণ্ট থেকে খেতাব পেলে ইত্যাদি। তা নয খালি লভ আব লড়াই—লভ আব লড়াই। ও সব লিখে দেশেব কি উপকাব হবে বল দেখি ?"

ঘোষাল মহাশয জিজ্ঞাসা কবিলেন, "বঙ্কিমবাবু কী বললেন ?

হুকাটি হাতে লইযা বায বাহাদুব বলিলেন "হাসতে লাগল। বললে—'আচ্ছা তা হলে যৌথ কাববাবেব নভেলটাই আবম্ভ কবি। কাঁচা মালেব কা দব আব কোথায কোন জিনিস পাওযা যায বেলভাড়াই বা কত সেগুলোও পবিশিষ্ট কবে ছেপে দেব কী ?' বিদ্রূপ হল। 'তোমাব যা খুশি তাই কব', বলে বাগ কবে আমি চলে এলাম।'

বায বাহাদুবেব মুখখানি অত্যন্ত অপ্রসন্ন দেখাইতে লাগিল। প্রায পাঁচ মিনিট কাল তামাক খাইযা তবে তিনি কতকটা প্রকৃতিস্থ হইলেন।

দুর্গাচবণবাবু বলিলেন, "টাকাকড়ি সম্বন্ধে আমাব প্রতি অনুগ্রহ যদি কবেন, তা হলে ত আব কোন বাধাই নেই। যে দিন অনুমতি কবেন সেই দিনেই বিবাহ হতে পাবে সামনে ফাল্গুন মাসে—'

বায বাহাদুব বলিলেন, "বও—বও। আবও কথা আছে। আসল কথাটাই ভুলে যাচ্ছিলাম। বিবাহ সম্বন্ধে আমাব আব একটি মত আছে। সে বিষযে যদি তুমি স্বীকাব হও, তবেই আমি ছেলেব বিবাহ দিতে পাবি।"

দুর্গাচবণবাবু একটু শঙ্কিত হইযা বলিলেন, "কী মত, আজ্ঞা করুন।'

বায বাহাদুব একটু নড়িযা চড়িযা ভাল কবিযা বসিযা বলিলেন, "সামাজিক সমস্যা সমাধান কেতাবে বাল্যবিবাহ বলে একটি পবিচ্ছেদ আছে। পড়েছ ?"

দুর্গাচবণবাবু বিপন্নভাবে বলিলেন, "আজ্ঞে—বোধ হয—কী জানি—ঠিক মনে পড়ছে না।"

"সে প্রবন্ধে আমি দেখিযেছি, বাল্যবিবাহ খুব ভাল জিনিস। আমাদেব

সমাজে এই একান্নবর্তী পরিবার-প্রথা যতদিন প্রচলিত থাকবে, ততদিন বাল্যবিবাহ ভিন্ন উপায় নেই। কেবলমাত্র স্বামীটিই স্ত্রীলোকের পরিজন নয়, তার শ্বশুর শাশুড়ি ভাসুর দেওর্ ননদ ভাজ—এ সব নিয়ে ঘরকন্না করতে হবে। সুতরাং ছোটবেলা থেকেই বউকে সেই পরিবারভুক্ত হতে হবে। কেমন কিনা?"

দুর্গাচরণবাবু বলিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ—ঠিক কথা।"

"আচ্ছা, প্রমাণ হল, বাল্যবিবাহ আমাদের সমাজের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। এটা অনেকেই স্বীকার করেন। কিন্তু—এর মধ্যে একটু কিন্তু আছে ভায়া। সেটি আমার আবিষ্কার। কী বল দেখি? কিন্তু—কী?"

দুর্গাচরণবাবু মাথা চুলকাইতে লাগিলেন। কিছুই বলিতে পারিলেন না।

রায় বাহাদুর বলিতে লাগিলেন, "বাল্যবিবাহ হবে বটে, কিন্তু একটু বয়স না হ'লে স্বামী স্ত্রীর দেখা সাক্ষাৎ হবে না। আমার কেতাবে, মেয়ের বয়স ষোল বৎসর আর ছেলের বয়স চব্বিশ—নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। এর পূর্বে তাদের একত্র হতে দেওয়া উচিত নয়। ডাক্তারি-শাস্ত্র খুলে দেখ, আমার মত যথার্থ কী না বুঝতে পারবে।" বলিয়া রায় বাহাদুর একটু গর্বের হাসি হাসিয়া, মুখখানি উন্নত করিয়া রহিলেন।

দুর্গাচরণবাবু অধোমুখে কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, "কথাতে ঠিকই। কিন্তু বড় মুস্কিল যে! আমার রাণীর বয়স, এখন ধরুন বারো, শ্রাবণ মাসে বারো পেরিয়ে তেরোয় পড়বে। তবে কী তিন চার বছর এখন জামাই আনতে পাব না? বাড়ির মেয়েরা তা হলে যে—"

রায় বাহাদুর বাধা দিয়া বলিলেন, "কেন জামাই আনতে পাবে না? অবশ্যই পাবে। যে দিন বলবে, তোমার জামাইকে পাঠিয়ে দেব। তাকে খাওয়াও দাওয়াও, আদর কর যত্ন কর—বাড়ির মেয়েরা আমোদ আহ্লাদ করুক—কিন্তু ঐ নিয়মটি প্রতিপালন করতে হবে।"

দুর্গাচরণবাবু বলিলেন, "বড় সমস্যার কথা।"

রায় বাহাদুর উৎসাহে উচ্চ হইয়া বসিয়া বলিলেন, "সমস্যাই ত! সমস্যাই ত! এই রকম সব সমস্যার সমাধান ক'রেছি বলেই ত আমার কেতাবের নাম 'সামাজিক-সমস্যা-সমাধান।' এর সুন্দর উপায় আমি বের করেছি। যদিও হঠাৎ সেটা কারু মনে আসে না, আসলে উপায়টি কিন্তু খুবই সোজা।"

"কী উপায়?"

"বউ অন্দরে থাকবে, ছেলে বাইরের ঘরে শোবে। বাস, হয়ে গেল। কেমন, সহজ উপায় নয়?" বলিয়া রায় বাহাদুর হা হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

দুর্গাচরণবাবু কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন, "লোকত ধর্মত সেটা কী ভাল হয়?"

কেহ কথার প্রতিবাদ করিলে রায় বাহাদুর অত্যন্ত রাগিয়া যান। বলিলেন, "আমি ভাল বুঝেছি—তাই লিখেছি। তোমার ভাল বোধ না হয়, অন্যত্র তোমার মেয়ের বিয়ের চেষ্টা দেখতে পার। আমার এক কথা। পাহাড় নড়ে ত নড়বে, প্রফুল্ল মিত্তিরের কথা নড়বে না।" বলিয়া তিনি গম্ভীর ভাবে বসিয়া রহিলেন।

রায় বাহাদুরের এই ভাবান্তর দেখিয়া দুর্গাচরণবাবু ভীত হইয়া পড়িলেন।

পাত্রটি হাতছাড়া হইলে বড দুঃখের বিষয় হইবে। বৎসরে চল্লিশ হাজার টাকা জমিদারির আয়, কলিকাতায় দুই তিনখানি বাড়ি আছে, রায় বাহাদুরের ঐ একমাত্র পুত্র, বি-এ পড়িতেছে, সুশীল, সচ্চরিত্র, সুপুরুষ—এক পয়সা পণ দিতে হইবে না—এমন সুযোগটি আব কোথায় পাওয়া যাইবে? তাই সবিনয়ে, নানা মিষ্ট কথায় দুর্গাচরণবাবু তাঁহার ভাবী বৈবাহিকের মনস্তুষ্টি সম্পাদনে যত্নবান হইলেন। "বাড়িতে" পরামর্শ করিয়া, যেমন হয়, আগামী কল্য প্রাতে গিয়া রায় বাহাদুরকে জানাইয়া আসিবেন বলিলেন।

রায় বাহাদুব তখন, হাসিতে হাসিতে স-পারিষদ বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার বৃহৎ ল্যাণ্ডো গাড়ি, যুগল ওয়েলারেব পদভরে দুর্গাচরণবাবুর ক্ষুদ্র গলি কাঁপাইয়া সদর রাস্তায় বাহির হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ফাল্গুন মাসেই শুভবিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। রায় বাহাদুরের পুত্রের নাম শ্রীমান হেমন্তকুমার।

ফুলশয্যা হয় নাই? হইয়াছিল বইকি। কিন্তু তাহাব পর যে কয়টি দিন বধূ সেখানে রহিল, বরেব সহিত আব তাহাব সাক্ষাৎ হইল না। রায় বাহাদুব পূর্বেই তাঁহার স্ত্রী ও পরিবারস্থ অন্য সকলেব প্রতি তাঁহাব ভীষণ আজ্ঞা প্রচাব করিয়া রাখিয়াছিলেন। গৃহিণী নিজেব স্বামীকে বেশ চিনিতেন, সুতবাং হুকুম রদ করাইবার জন্য আর বৃথা চেষ্টা করিলেন না।

সপ্তাহ কাল থাকিয়া রাণী পিত্রালয়ে চলিয়া গেল।

দুর্গাচরণবাবু জামাতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনা বুদ্ধির কার্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন না। গৃহিণী কর্তৃক এ বিষয়ে বারবার অনুরুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "দেখ, জামাইকে সকালবেলা নিয়ে এসে বেলাবেলি ফিরে পাঠাতে পারি। কিন্তু তাঁর ছেলের সঙ্গে বউয়ের দেখা হয়নি এ কথা বেয়াই যদি বিশ্বাস না করেন, আমি তখন সাফাই সাক্ষী পাব কোথা? বেয়াইয়ের মেজাজ জান ত?"

জ্যৈষ্ঠমাসে জামাই-ষষ্ঠী হইল। দুর্গাচরণবাবু রাণীকে শিবপুরে তাঁহার বড় মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে রাখিয়া মাতব্বর এলিবাই সাক্ষী সৃষ্টি করিয়া আসিয়া, তাহার পর হেমন্তকুমারকে গৃহে আনিয়া জামাতার্চনা করিলেন।

আষাঢ় মাসে রায় বাহাদুর বধূকে নিজ বাটীতে আনয়ন করিলেন। হেমন্ত এতদিন অন্তঃপুরেই শয়ন করিত, এইবার বহির্বাটীতে নির্বাসিত হইল। এ বৎসর তাহার এগজামিনের পড়া, কিন্তু মেঘদূত মুখস্থ করিয়া ও পয়ারাদি বিবিধ ছন্দে বিরহমূলক নানা কবিতা লিখিয়া সে বর্ষাযাপন করিতে লাগিল।

দুইবার জলযোগ ও দুইবার আহার করিবার জন্য মাত্র হেমন্তকুমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিত। বধূ আসিবার দিন-পনেরো পরে একদিন হঠাৎ উভয়ের চোখাচোখি হইয়া গেল।

মাঝে মাঝে এইরূপ চোখাচোখি হইতে লাগিল। নির্দিষ্ট চারিবার ভিন্ন, আরও দুই-তিনবার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার অছিলা হেমন্ত আবিষ্কার করিয়া লইল।

সন্ধ্যার পূর্বে একদিন জল খাইয়া ফিরিবাব পথে হেমন্ত দেখিল, বধূ একস্থানে জড়সড হইয়া ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আশে পাশে কেহ নাই। যাইবাব সময় সে বধূর শাড়িটি স্পর্শ করিয়া গেল।

ইহার পর হইতে প্রায় প্রতিদিনই এরূপ ঘটিত। ক্রমে পত্র বিনিময়, তাম্বুল বিনিময় এবং আরও কী কী বিনিময় ঠিক জানি না।—সেই ক্ষণিক মিলনেই সম্পন্ন হইতে লাগিল।

বর্ষা কাটিল, শবৎকাল আসিল। ভাদ্রেব শেষ সপ্তাহে, (মাসের পয়লা তারিখে কাগজ বাহির হওয়া তখনও বেওয়াজ হয় নাই) "বঙ্গবাসী" মাসিক পত্রিকায় "চকোরের ব্যথা" শীর্ষক হেমন্তের এক কবিতা ছাপা হইল। নিম্নে তাহার নাম স্বাক্ষরিত ছিল। কবিতাটি কেমন করিয়া রায় বাহাদুরের চক্ষে পড়িয়া যায়। পরদিন তিনি বৈবাহিককে পত্র লিখিলেন, "বধূমাতা অনেকদিন আসিয়াছেন। মার জন্য বোধ হয় তাঁহার অত্যন্ত মন কেমন করে। অতএব আশ্বিন মাস পড়িলেই তাঁহাকে তুমি কিছুদিনেব জন্য লইয়া যাইবে।" দুর্গাচরণবাবু আসিযা কন্যাকে গৃহে লইয়া গেলেন।

চতুর্থ পবিচ্ছেদ

কার্তিক মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজ খুলিবাব দুই তিনদিন পবে ক্লাসে বসিয়া হেমন্ত একখানি পত্র পাইল। শিবোনামাব হস্তাক্ষব অপবিচিত—বাঙ্গালায় লেখা এবং স্ত্রীলোকের লেখা বলিয়া বোধ হইল।

দেখিয়া হেমন্ত একটু আশ্চয হইল, কাবণ কলেজের ঠিকানায় কখনও তাহার পত্রাদি আসে না। টিকিটেব উপব মোহব দেখিল—শিবপুব। পার্শ্বোপবিষ্ট জনৈক ছাত্র বলিল, "গিন্নীর চিঠি নাকি?" "না"—বলিযা পত্রখানি হেমন্ত কোটের বুকপকেটে লুকাইয়া বাখিল এবং অধ্যাপকের বক্তৃতার প্রতি বিশেষ মনঃসংযোগের ভান করিয়া রহিল।

আসলে তাহাব মনেব মধ্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি উদিত হইতেছিল—

(১) শিবপুবে আমার বড শালার শ্বশুববাড়ি, সেখান হইতেই কী পত্র আসিল?

(২) কখনও ত আসে না, আজ আসিল তাহার কারণ কী?

(৩) রাণী কী তাহাব দিদির মাবফৎ তাহাকে চিঠি পাঠাইয়াছে?

(৪) তাহাই যদি হয়, তবে দিদিব মাবফৎ তাহাকে এ চিঠি লেখা আমার উচিত হইবে কী না?

(৫) যদি লিখি তবে বাবার তাহা ধরিয়া ফেলিবার সম্ভাবনা আছে কী না?

(৬) সকলের বাবা যেরূপ, আমার বাবা সেরূপ নহেন কেন? এমন কঠিন এমন নিষ্ঠুর কেন?

এই সকল দুরূহ বিষয় চিন্তা করিতে করিতে, হঠাৎ হেমন্ত পিপাসা অনুভব করিল। ক্লাসের শেষ দিকে এবং দরজার অতি নিকটেই সে বসিয়া ছিল—সুরুৎ করিয়া বাহির হইয়া গেল। জলের জন্য দ্বারবানের নিকট তাহাকে যাইতে হইল

না—কাবণ পকেটেব ভিতব লেফাপাব মধ্যেই তাহাব তৃষাহব পদার্থটি ছিল। বাগানে নামিযা গিযা পত্রখানি খুলিযা সে পাঠ কবিল।

তাহাতে লেখা ছিল—

১৭ নং বিনোদ বোসেব গলি,
শিবপুব।
২৫শে কার্তিক।

কল্যাণববেষু,

ভাই হেমন্ত, আমাকে চিনিতে পাবিবে কী না বলিতে পাবি না, কাবণ একদিন মাত্র বাসবঘবে আমায তুমি দেখিযাছিলে, প্রায ৮/৯ মাস পূর্বে। আমি তোমাব দিদি হই তোমাব শ্বশুব মহাশযেব জ্যেষ্ঠা কন্যা। উপবে লিখিত ঠিকানায আমাব শ্বশুবালয।

আমাব দিদিশাশুডি তোমায দেখেন নাই—একবাব দেখিতে ইচ্ছা কবেন। তোমাব কলেজ হইতে শিবপুব এমন ত কিছুদূব নহে—বড জোব এক ঘণ্টাব পথ শিবপুব ঘাটে নামিযা, যাহাকে আমাদেব ঠিকানা বলিবে, সেই পথ দেখাইযা দিতে পাবিবে তোমাব সঙ্গে আমাবও অনেক আবশ্যক কথা আছে—অতএব যত শীঘ্র পাব, অবশ্য অবশ্য একদিন আসিবে বেলা বাবোটা হইতে দুইটাব মধ্যে আসিলেই ভাল হয আমাব শ্বশ্রূঠাকুবাণীব অনুমতি অনুসাবে এ পত্র তোমায লিখিতেছি।

আশীর্বাদিকা
তোমাব দিদি যামিনী।

পুঃ - বাণী গতকল্য হইতে এখানে। আগামী ববিবাব বাবা আসিযা তাহাকে লইযা যাইবেন।

পত্রখানি বিশেষতঃ শেষ দুই লাইন দুই তিনবাব পাঠ কবিযা হেমন্ত ক্লাসে ফিবিযা গেল। অধ্যাপক মহাশয একদিন সনেটেব স্বরূপ বুঝাইযা বলিতেছিলেন—শেষ দুই লাইনেই সনেটেব সমস্ত মিষ্ট বসটুকু জমা হইযা থাকে।

সেদিন কলেজে বাকী কয ঘণ্টা কী যে বক্তৃতা হইল হেমন্ত তাহা কিছু বলিতে পাবে না।

বাত্রে শযন কবিযা সে ভাবিতে লাগিল বাণী আসিযাছে বলিযা কী দিদি ডাকিযা পাঠাইলেন ? না তাঁহাব দিদিশাশুডি সত্য সত্যই আমাকে দেখিবাব জন্য ব্যাকুল ? সেখানে গেলে, বাণীব সঙ্গে আমাব দেখা হইবে কী ? যে বকম কপাল ভবসা হয না। "পিতৃসত্য বক্ষা কবিবাব জন্য বামচন্দ্র বনে গিযাছিলেন—আমি কন্যা হইযা বাবাব সত্যভঙ্গ কবাই কেন" এইরূপই যদি দিদিব মনেব ভাব হয ? হয হউক। তাহাবা যদি আমায জল খাওযাইবাব জন্য পীড়াপীড়ি কবে, কখনই খাইব না। একটা পান পর্যন্ত খাইব না। আবাব তাহাব মনে হয—না, দেখা হইবে বইকি, অবশ্যই হইবে। সকল কথা জানিতে পাবিযাই বোধ হয দিদি আমাকে সেখানে লইযা যাইতেছেন। দিদিব বাবাই সত্যবদ্ধ—দিদি ত আব সত্যবদ্ধ হন নাই। বোধ হয আমাদেব দুঃখে প্রাণ কাঁদিযাছে—তাই এ কৌশল অবলম্বন কবিযাছেন। নহিলে, বাডিব ঠিকানায চিঠি না লিখিযা কলেজেব

ঠিকানায় চিঠি লিখিলেন কেন ? বাণী সেখানে রবিবার অবধি আছে, এ কথাই বা বিশেষ করিয়া লিখিবার কারণ কী ? দেখা বোধ করি হইতে পারে।

এইরূপ নানা চিন্তায় রাত্রি প্রভাত হইল। হেমন্ত আজ স্নানাহার একটু তাড়াতাড়ি সারিয়া লইল—অন্যদিন অপেক্ষা একঘণ্টা পূর্বেই আজ কলেজ যাত্রা করিল। আজ নাকি এগারটা হইতেই লেকচার আরম্ভ।

পৌনে এগারটার সময় কলেজের সম্মুখে গাড়ি হইতে নামিয়া কোচম্যানকে হেমন্ত বলিল, আজ বাড়ি ফিরিতে তাহার দেরী হইবে, চারিটার পূর্বে গাড়ি আনিবার প্রয়োজন নাই।

গাড়ি চলিয়া গেল। দ্বারবানের নিকট পুস্তকাদি রাখিয়া হেমন্ত একখানি ঠিকাগাড়ি লইল। তখনও কলিকাতায় বৈদ্যুতিক ট্রাম হয় নাই—ঘোড়ার ট্রাম—মাঝে মাঝে অচল হইয়া পড়িত। ট্রামকে বিশ্বাস করিতে পারিল না।

ঠিকাগাড়িতে চাঁদপাল ঘাট—সেখান হইতে নৌকাযোগে শিবপুর। গঙ্গাবক্ষ হইতে শিবপুর দেখা যাইতে লাগিল। হেমন্ত সেইদিকে ব্যাকুল ভাবে চাহিয়া রহিল। নৌকাখানা চলিতেছে—একেবারে গজেন্দ্রগমনে। দাঁড়ি বেটারা কুঁড়ের বাদশাহ।

শিবপুর ঘাটে নামিয়া বাড়ি অনুসন্ধান করিয়া লইতেও কিছু সময় নষ্ট হইল। শুনিল, গৃহকর্তা হাওড়ার উকিল। তাঁহার পুত্র—বাগবাজারে যাহার বিবাহ হইয়াছে—সে কলিকাতায় কোন হাউসের নায়েব খাজাঞ্চি। পথের লোকের নিকটেই এ সকল সংবাদ হেমন্ত সংগ্রহ করিল।

১৭ নম্বরের সম্মুখীন হইবামাত্র হেমন্ত ঘড়ি খুলিয়া দেখিল—কলেজ হইতে আসিতে এক ঘণ্টা কুড়ি মিনিট লাগিয়াছে।

ডাকাডাকিতে একজন ভৃত্য আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। পরিচয় লইয়া অন্তঃপুরে সে সংবাদ দিতে গেল। ক্রমে একজন ঝি আসিয়া বলিল "জামাইবাবু ভাল আছেন ত ? আসুন, বাড়ির ভিতর আসুন।" তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ হেমন্ত ক্রমে দ্বিতলের একটি কক্ষে উপনীত হইল।

অল্পক্ষণ পরেই "কা ভাই চিনতে পার ?" বলিয়া উনিশ কিংবা কুড়ি বৎসর বয়সের গৌরবর্ণা হাস্যময়ী এক যুবতী আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার কোলে এক বৎসরের একটি শিশু।

হেমন্তের মনে পড়িল, বাসরঘরে ইহাকে দেখিয়াছিল বটে। "যামিনী দিদি ?" বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইল।

যামিনী বলিল, "হয়েছে ভাই আমি অমনিই তোমায় আশীর্বাদ করছি। আর, আশীর্বাদের দরকারই বা কী ? . . ন সঙ্গে যেদিন তোমার বিয়ে হয়েছে—সেইদিনই তো রাজা হয়েছ।" বলিয়া যামিনী সুমিষ্ট হাসির লহরী তুলিল। সঙ্গে সঙ্গে, রুদ্ধ-জানালার বাহিরে বারান্দা হইতে একাধিক তরুণীকণ্ঠে চাপা হাসির একটা গুঞ্জনধ্বনিও শুনা গেল। "কে লা ছুঁড়িগুলো—পালা বলছি এখান থেকে" বলিয়া যামিনী বাহির হইবামাত্র, ঝম ঝম শব্দ করিতে করিতে কয়েকজোড়া চরণ সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

যামিনী ফিরিয়া আসিলে হেমন্ত জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, আমায় ডেকেছেন

কেন ?”

“কেন বল দেখি ? যদি বলতে পার ত—সন্দেশ খাওয়াব”, বলিয়া যামিনী হাসিতে লাগিল।

“বলতে পারলাম না দিদি—সন্দেশ আমার ভাগ্যে নেই”, বলিয়া হেমন্ত খোকাকে লইবার জন্য হাত বাড়াইল।

খোকা এই অপরিচিত ব্যক্তির কোলে যাইতে রাজি হইল না। তাহার মা তাহাকে কত করিয়া বুঝাইল “যাও বাবা—কোলে যাও, তোমার মেছোমছাই হন, তোমায় কত ভালবাসেন, কত আদর করবেন, লক্ষ্মি বাবা—যাও বাবা। পাজি হতভাগা ছেলে, কোলে না গেলি তো ওঁর বয়েই গেল।”

বাড়ির কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর যামিনী বলিল, “হ্যাঁ ভাই ক’টা অবধি তুমি এখানে থাকতে পারবে ?”

হেমন্ত এ অঙ্কটি পূর্বেই মনে মনে করিয়া রাখিয়াছিল। বলিল, “বেলা আড়াইটের সময় আমাকে বেরুতে হবে দিদি।”

ঘরে ক্লক ছিল, যামিনী দেখিল সাড়ে বারো প্রায় বাজে। বলিল “আচ্ছা, দিদিমাকে তবে ডেকে আনি।”

দুই মিনিট পরে হেমন্ত শুনিল ঝুম ঝুম করিয়া মলের শব্দ নিকটে আসিতেছে। হেমন্ত ভাবিল, যামিনী দিদির পায়ে ত একগাছি করিয়া ডায়মন-কাটা মল দেখিয়াছি—ঝুম ঝুম করিয়া কে আসে ? দিদিমার আওয়াজ কী এ রকমটা হইবে ?

সে শব্দ কিন্তু ঘর অবধি আসিল না বাহিরেই থামিয়া গেল। যামিনী একাকিনী প্রবেশ করিয়া হাসিয়া বলিল, “দিদিমার এখন অবসর হ’ল না ভাই—এখনও তাঁর আহ্নিক সারা হয়নি। অন্য কাউকে তোমার যদি দরকার হয় ত বল। আর কাউকে চাই ?”

হেমন্তের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। আশায় আনন্দে তাহার বুকটি ঢিব ঢিব করিতে লাগিল।

যামিনী হাসিয়া বাহির হইতে যাহাকে টানিয়া আনিল কুসুম রঙের শাড়িতে তাহার আপাদমস্তক আবৃত। তাহাকে ভিতরের দিকে ঠেলিয়া দিয়া সে বলিল, “এই নাও—তোমার রাণী নাও ভাই রাজা। রাজা ও রাণীর অভিনয় আমরা কেউ আড়ি পেতে দেখব না—সে আমরা থিয়েটারেই দেখে নিয়েছি। আমি এখন চললাম, নিশ্চিন্ত হয়ে দুটো অবধি তুমি রাজত্ব কর। আমি ততক্ষণ তোমার জন্যে জলখাবার তৈরি করিগে।” বলিয়া যামিনী কোনও উত্তরের অপেক্ষা মাত্র না করিয়া, সশব্দে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কার্তিক মাস কাটিল, অগ্রহায়ণ আসিল। রাণী পিত্রালয়ে। এখন আর হেমন্তের কলেজ নাই, বক্তৃতা সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে, ফাল্গুন মাসে পরীক্ষা। কয়েকদিন বাড়িতে থাকিয়া হেমন্ত বলিল, “এখানে গোলমালে আমার পড়াশুনোর বড়ই ব্যাঘাত হচ্ছে। কলকাতায় মেসে গিয়ে এ ক’টা মাস আমি থাকি।”

পুত্রের এই অধ্যয়নস্পৃহায় পিতা কোনও বাধা দিলেন না।

হেমন্ত মেসে গিয়া রহিল। ইতিমধ্যে তাহার শ্যালীপতি কুঞ্জলালের সহিতও আলাপ হইয়াছিল। মাঝে মাঝে আপিসের পর কুঞ্জ আসিয়া তাহাকে শিবপুরে 'ধরিয়া' লইয়া যাইত। যামিনীর ভগিনীস্নেহও এ সময় অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছিল—প্রায়ই সে রাণীকে পিতৃগৃহ হইতে আনাইয়া নিজের কাছে রাখিত।

ফাল্গুন মাসে হেমন্তের পরীক্ষা হইল. রায় বাহাদুরও বধূকে নিজ বাটীতে পুনরানয়ন করিলেন।

বৈশাখের শেষে বি-এ পরীক্ষার ফল বাহির হইল। হেমন্তের নাম গেজেটে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

গ্রীষ্মের ছুটির পর কলেজ খুলিলে রায় বাহাদুর পুত্রকে বলিলেন, "বাড়িতে গোলমালে পড়াশুনো ভাল হবে না। তুমি বরং কলকাতায় মেসে গিয়ে থাক।"

পিতাকে হেমন্ত কিছু বলিতে সাহস করিল না। মার কাছে গিয়া, মেসে থাকা যে কী কষ্ট, আহারাদির বন্দোবস্ত সেখানে যে কিরূপ শোচনীয় ও স্বাস্থ্যহানিকর, সমস্তই সবিস্তারে বর্ণনা করিল। গৃহিণী সভয়ে স্বামীর নিকট এ কথা উত্থাপন করিয়া তর্জিত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। মেসেই হেমন্তকে যাইতে হইল।

পিতৃ-আজ্ঞা অনুসারে প্রতি রবিবার প্রাতে হেমন্ত বাড়ি আসে, জলযোগাদির পর বৈকালে আবার বাসায় ফিরিয়া যায়। অন্তঃপুরে যাতায়াতের পথে রাণীর শাড়ির বঙটি পর্যন্ত আর সে দেখিতে পায় না।

দুই রবিবার এইরূপে কাটিল, বাড়ির একজন ঝিকে ঘুষ দিয়া, স্ত্রীর নিকট হেমন্ত পত্র পাঠাইল। রবিবারে ঝির মারফত উভয়ের পত্রব্যবহার চলিতে লাগিল।

ক্রমে পূজা আসিল। ছুটিতে হেমন্ত বাসা ছাড়িয়া বাড়ি আসিল। বড আশা করিয়াছিল, অন্তত বিজয়ার প্রণাম করিবার উপলক্ষেও রাণী একবার তাহার কাছে আসিতে পাইবে—কিন্তু তাহার সে আশাও বিফল হইল। হেমন্ত এখন হইতে বড়ই হতাশ্বাস হইয়া পড়িল। যখন বাড়ি আসে চুপ করিয়া উদাসনেত্রে বসিয়া থাকে। কখনও কখনও মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবে।

এক রবিবারে ঝি নিরবিলি পাইয়া হেমন্তকে বলিল, "দাদাবাবু বউদিদিমণি রোজ রাত্রে কাঁদেন।"

হেমন্ত বলিল, "কেন ঝি? কাঁদে কেন?"

ঝি বলিল, "হাজার হোক দাদাবাবু, সোয়ামি ত! বউদিদিমণি বলেন, এমন কপাল করে ভারতে এসেছিলাম যে সোয়ামিকে চোখেও একবার দেখতে পাইনে।"

"তুই কী করে জানলি ঝি?"

"যে ঘরে বউদিদিমণি শোন, আমিও সেই ঘরের মেঝেতে বিছানা করে শুই কিনা।"

পর রবিবারে ঝি বলিল," দাদাবাবু, একটিবার আপনি বউদিদিমণির সঙ্গে দেখা করুন।"

হেমন্ত বলিল, "উপায় কী?"

"আপনি যদি এক কাজ কবেন ত হয।"

"কী কাজ, ঝি ?"

"আপনি যেমন ববিবাবে আসেন, একদিন যদি বলেন আমাব শবীব খাবাপ হয়েছে কী কিছু হয়েছে. এই বলে যদি থেকে যান, তাহলে অনেক বাত্রে সবাই ঘুমুলে, আমি আস্তে আস্তে উঠে এসে আপানকে দোব খুলে দিতে পাবি।'

হেমন্ত বসিযা ভাবিতে লাগিল। বাণী যে ঘবে শযন কবে, সিঁডি দিযা দুতলাই উঠিযা সেই প্রথম ঘব। তাহাব পিতাব শযনঘব সেখান হইতে কিছু দবে। খুব সাবধানে যাইতে পাবিলে বোধ হয় সফল হওযা বিচিত্র নহে। কিন্তু বড ভয কবে। যদি ধবা পডিযা যাই—ছি ছি—সে বড কেলেঙ্কাবি।

ঝি বলিল, "কী বলেন দাদাবাবু ?"

"তোমাব বউদিদিমণি কী বলেন ?"

"তিনি বলেন. না ঝি ওসবে কাজ নেই আমাব বড ভয কবে।

আচ্ছা আমি ভেবে দেখব" বলিযা ঝিকে হেমন্ত আপাতত বিদায দিল।

বাসায ফিবিযা গিযা 'বোমিও জুলিযেট নাটক পডিতে পডিতে হঠাৎ তাহাব মনে হইল যদি দডিব মই পাই তবে বাগান দিযা পশ্চাতেব জানালাব পথে আমিও বাত্রে বাণীব ঘবে প্রবেশ কবিতে পাবি। অনেক সন্ধানে জানিতে পাবিলে সাহেববাডিতে ১৫ মূল্যে দডিব মই কিনিতে পাওযা যায। কালবিলম্ব না কবিযা সেই মই একটি হেমন্ত কিনিযা আনিল।

পববর্তী ববিবাবে ছোট একটি হাত-ব্যাগেব মধ্যে সেই মইটি লুকাইযা হেমন্ত বাডি গেল যথাসময়ে ঝিব দ্বাবায সেই মই এব একখানি পত্র স্ত্রীব নিকট চালান কবিযা দিল

পত্রে এই প্রকাব লেখা ছিল

হৃদযেব বাণী আমাব

একবৎসব কাল বিচ্ছেদ সহিলাম আব পাবি না। তোমায একটিবাব দেখিতে না পাইলে এইবাব আমি পাগল হইযা যাইব ঝি যে উপায বলিযাছিল তুমি তাহাতে অমত কবিযাছিলে। আমিও অনেক ভাবিযা চিন্তিযা দেখিলাম তাহা নিবাপদ নহে। এবাব কিন্তু একটি সুন্দব উপায আমি আবিষ্কাব কবিযাছি তুমি যদি সাহস কব তবেই আমাদেব মিলন হইতে পাবে।

ঝিব হাতে যে জিনিসটি পাঠাইলাম তাহা একটি দডিব মই উহাব একটা প্রান্ত তোমাব ঘবেব বাগানেব দিকে যে জানালা আছে সেই জানালায বাঁধিযা যদি নিম্নে ঝুলাইযা দাও তবে আমি বাগান হইতে ঐ মই দিযা অনাযাসে তোমাব ঘবে উঠিযা যাইতে পাবি। দডি খুব শক্ত—ছিঁডিবাব কোনও ভয নাই। এখন তুমি সাহস কবিলেই হয।

কল্য বাত্রি এগাবোটাব সময মইটি জানালায বেশ শক্ত কবিযা বাঁধিযা উহা নীচে ফেলিযা দিবে। এগাবোটা হইতে সাডে এগাবোটাব মধ্যে আমি প্রাচীব ডিঙাইযা বাগানেব ভিতব দিযা তোমাব জানালাব নিকট গিযা পৌঁছিব।

এ প্রস্তাবে তুমি যদি সম্মত না হও তাহা হইলে আমাব মর্মান্তিক কষ্ট হইবে জানিও। লক্ষ্মীটি আমাব, ইহাতে অমত কবিও না। কোনও ভয নাই. বিপদেব

কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই। আবার ভোরবেলায় ঐ মই দিয়া নামিয়া আমি কলিকাতায় চলিয়া যাইব।

তোমার স্বামী

ঘণ্টা দুই পরে ঝি আসিলে হেমন্ত জিজ্ঞাসা করিল "কী ঝি, মত হয়েছে?"

ঝি বলিল, "হয়েছে, কিন্তু অনেক কষ্টে।"

"তবে, কাল রাত্রে এগারোটার পর আমি আসব?'

"আসবেন।'

"আচ্ছা তবে কথা রইল। তোমরা ঠিক থেক।"

"ঠিক থাকব দাদাবাবু।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কলিকাতায় শীতটা এবার বড় শীঘ্রই পড়িয়া গিয়াছে। যদিও এখনও অগ্রহায়ণ শেষ হয় নাই, তথাপি জলের দাঁত বেশ তীক্ষ্ণ হইয়াছে, সন্ধ্যারাত্রেও গায়ে লেপ সহ্য হয় দিবসেও লোকে গরম মোজা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সংবাদপত্রে প্রকাশ, কোহাট গিরিবর্ত্মে তুষারপাত হইয়া গিয়াছে।

অন্ধকার রাত্রি। বির্জিতলার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া এগারটা বাজিল। ভবানীপুরে যে অংশে রায় বাহাদুর প্রফুল্ল মিত্রের বাস তাহা রসা রোড হইতে কিছুদূর পশ্চিমে। সদর রাস্তা কটি বড় রাস্তার উপর বাড়ির পশ্চাতের বাগানের দুই দিক দিয়া অপেক্ষাকৃত জনহীন পথ বাগানের পশ্চিম দিকের পথটি ত আরও জনহীন কারণ তাহার অপর পারে কয়েকটা সুরকির কল রাত্রে সেখানে কেহ বড় থাকে না।

এগারটা বাজিবার অল্পক্ষণ পরেই কাঁসারিপাড়া রাস্তার মোড়ে একখানি ঠিকা গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল। র‍্যাপারে আলোয়ানে আবৃত দেহ একব্যক্তি গাড়ি হইতে নামিয়া কোচম্যানকে ভাড়ার টাকা দিল। গাড়ি তখন সেখান হইতে ধীরে ধীরে সরিয়া গেল।

বলা বাহুল্য যুবক আর কেহ নহে বিরহজ্বরাক্রান্ত আমাদেরই হেমন্ত।

হেমন্ত তখন দ্রুতপদক্ষেপে তাহাদের বাগানের পশ্চাতের রাস্তাটির দিকে চলিল। কাছাকাছি আসিয়া সে নিজ গতিবেগ কিঞ্চিৎ হ্রাস করিয়া দিল।

রাস্তাটি যেখানে বাঁকিয়া বাগানের দিকে গিয়াছে সেখানে হেমন্ত দেখিল একজন কনস্টেবল কম্বলের ওভারকোট গায়ে দিয়া এক বাড়ির দেউড়ীতে বসিয়া সিগারেট খাইতেছে। চোরের মত হেমন্ত আড়চোখে তাহার পানে চাহিতে চাহিতে গেল।

সেই মোড়ের উপর যে লণ্ঠন ছিল, কিছুদূর অবধি বাগানের প্রাচীর তদ্দ্বারা আলোকিত। তাহার পর অন্ধকার। হেমন্ত ভাবিল, ঐ অন্ধকার অংশের কোনও একটা সুবিধামত স্থানেই প্রাচীর লঙ্ঘন করিতে হইবে।

অনেক বয়স অবধি সে জিমন্যাস্টিক করিয়াছিল এখনও রীতিমত ফুটবল খেলে-তাহার হাতে পায়ে বিলক্ষণ বল। প্রাচীর লঙ্ঘনের উপযোগী একটা

স্থান সে অন্বেষণ করিতে লাগিল।

এমন সময়ে দূরে কাহার পদশব্দ শুনিল। সুতরাং অপেক্ষা করিতে হইল। অথচ এক স্থানে দাঁড়াইয়া থাকাও চলে না। যে দিক হইতে পদশব্দ আসিতেছিল, সেই দিকেই হেমন্ত যাইতে লাগিল। ক্রমে দেখিল, দোকানী অথবা মিস্ত্রী শ্রেণীর একজন লোক তাহাকে অতিক্রম করিয়া গেল।

হেমন্ত আবার ফিরিল। যে স্থানটা সে লঙ্ঘনের জন্য নির্বাচিত করিয়াছিল, তাহার অপর দিকে বাগানে একটা বৃহৎ জামরুল গাছ আছে। প্রাচীর হইতে লাফ দিয়া সেই গাছের একটা ডাল ধরিয়া ঝুলিয়া পড়াই তাহার অভিপ্রায়।

অনেক কষ্টে হেমন্ত প্রাচীরে উঠিল। উঠিতে তাহার হাঁটু ছড়িয়া গেল, কনুইয়ে আঘাত লাগিল। আহা, কবি সত্যই বলিয়াছেন, প্রেমের পথ মসৃণ নহে!

প্রাচীরে বসিয়া, ডাল ধরিবার চেষ্টায় হেমন্ত হাত বাড়াইল। কিন্তু কোনও ডাল নাগাল পাইল না। একে অন্ধকার, তাহাতে ডালগুলাও কালো কালো।

এবার হেমন্ত কষ্টেসৃষ্টে প্রাচীরের উপর দণ্ডায়মান হইল। হাত বাড়াইল, তথাপি ডাল ধরিতে পারে না।

এমন সময় আর এক ব্যক্তির পদধ্বনি সে শুনিতে পাইল। ভাবিল, প্রাচীরে দাঁড়াইয়া থাকিলে ও নিশ্চয় দেখিতে পাইবে, অন্ধকারে এইখানে ঘুপ্‌টি মারিয়া বসিয়া থাকি, বসিবার সময় প্রাচীরের সিমেন্ট কিছু খসিয়া নিম্নে পড়িয়া গেল।

যে আসিতেছিল, সে এই শব্দে দাঁড়াইল, ভাবিল বোধ হয় জামরুল পড়িয়াছে। সে এই পাড়ারই লোক, পূর্বেও এখান হইতে জামরুল কুড়াইয়া খাইয়াছে। জামরুল খুঁজিতে খুঁজিতে ঊর্ধ্বে দৃষ্টি করিয়া, "বাবা গো, চোর!" বলিয়া সে দৌড় দিল।

তাহার কীর্তি দেখিয়া হেমন্তের হাসি পাইল। কিন্তু পরক্ষণেই ভয়ের কারণ উপস্থিত হইল। শুনিল, মোড়ের উপর হইতে একটা গম্ভীর স্বর, "আরে কৌন হায়? ক্যা হায় রে?"

কম্পিত স্বর, "একঠো চোর হায় কনেস্টবলজি।"

"কাঁহা কাঁহা?"

"ঐ হুঁয়া। মিত্তিরবাবুদের পাঁচিলমে একঠো চোর বৈঠা হায়। বৈঠ্‌কে বৈঠ্‌কে জামরুল খাতা হায়।"

এই কথা শুনিবামাত্র "জোড়িদার হো" বলিয়া কনেস্টবল এক ভীষণ চীৎকার ছাড়িল।

হেমন্ত প্রাচীরে বসিয়া প্রমাদ গণিল। পরক্ষণেই শুনিল, নাগরা জুতার আওয়াজ ছুটিয়া আসিতেছে। বুলস্-আই লণ্ঠনের তীব্র আলোকও পথে পড়িল।

হেমন্ত তখন নিরুপায় হইয়া বাগানের ভিতর লাফ দিল। সেখানে কতকগুলো ভাঙ্গা ইঁট পড়িয়াছিল, তাহাতে হেমন্তের শরীরের স্থানে স্থানে আঘাত লাগিল।

কনস্টেবলটা ছুটিতে ছুটিতে সেইখান বরাবর আসিয়া দাঁড়াইল। প্রাচীরের উপর গাছের উপর তীব্র আলোকপাত করিয়া, আবার ছুটিতে ছুটিতে ফিরিয়া

গেল।

হেমন্ত তখন আস্তে আস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। বাড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, দ্বিতলের একটি জানলা হইতে সামান্য আলোক আসিতেছে—অপর সমস্ত জানালাগুলি একেবারে অন্ধকার!

দাঁড়াইয়া. ধুতিখানি হেমন্ত খুলিয়া ফেলিল। নিম্নে ফুটবল খেলিবার হাঁটু অবধি পা-জামা পরিয়া আসিয়াছিল, কারণ ধুতি লটর-পটর করিয়া দড়ির মইয়ে চড়া অসুবিধা হইবে। ধুতিখানি সে জামরুল গাছের ডালে টাঙ্গাইয়া রাখিল, ভোরে ফিরিবার সময় আবার পরিয়া যাইবে। কোমরে আলোয়ানখানি যেমন বাঁধা ছিল, তেমনি বাঁধা রহিল।

এই অবস্থায় হেমন্ত জানালার দিকে অগ্রসব হইল। কোনও ফুলগাছ পাছে মাড়াইয়া নষ্ট করিযা ফেলে, এই ভয়ে অত্যন্ত সাবধানে, আলপথ খুঁজিযা খুঁজিয়া যাইতে লাগিল।

যখন অর্দ্ধপথ অতিক্রম কবিয়াছে, তখন হঠাৎ বাগানেব দবজা খুলিযা গেল। তিন চারিজন লোক লণ্ঠন হস্তে প্রবেশ কবিযা বলিতে লাগিল, "কাঁহা—কাঁহা কনেস্টবলজী ?" কনস্টেবল বলিল, "জামরুলকে পেড়োযা ভিরে।" তখন লোকগুলো ধীরে ধীরে জামকল গাছেব দিকে অগ্রসব হইল।

হেমন্ত একটা গাছেব আড়ালে দাঁড়াইল। কণ্ঠস্বরে চিনিল, তাহাদের বাড়ির জমাদাব মহাবীর সিং এবং দুইজন দ্বাববানের সঙ্গে কনস্টেবলটা আসিয়াছে।

কিযদ্দূব গিযা মহাবীব সিং বলিল, "কেহ তো না বুঝাযহে।"

কনস্টেবল বলিল, "ভাগ গেলই কা ? আপন আঁখিযাসে হাম কুদতে দেখলি হো, তোহব্ কির্।" এক মুহূর্তে পবে—"উ কা হায়—উ কা হায়" বলিতে বলিতে সকলে জামরুল গাছের দিকে চলিল। কযেক মুহূর্ত পরে হেমন্ত দেখিল, বৃক্ষশাখা হইতে লম্বিত তাহার সেই শ্বেত বস্ত্রখানার উপবে লণ্ঠনেব আলোক পড়িয়াছে। সেই বিপদেব সমযেও তাহার হাসি পাইল।

"ধৌগো হো—পাকড়লি চোব" বলিযা তাহারা হাল্লা করিয়া সেই বস্ত্রাভিমুখে ছুটিল। নিকটে গিযা তাহাবা বলিল, "ধত্তেবিকে—ই ত খালি লুগা বুঝাহে।" বস্ত্রখানা তাহাবা নামাইয়া লইযা লণ্ঠনেব আলোকে পবীক্ষা কবিতে লাগিল।

এমন সময দ্বিতলেব আব একটা জানালা খুলিয়া আলোকবশ্মি বাহিব হইল। রায বাহাদুরের কণ্ঠস্বব শুনা গেল, "ক্যা হায ? ক্যা হায মহাবীর সিং ?"

কনস্টেবল প্রভৃতি সেখান হইতে চিৎকার করিয়া বলিল, "হুজুব বাগিচা মে চোব ঘুষা হায়।"

রায় বাহাদুব হাঁকিলেন, "খোঁজ খোজ —পাকড়ো।"

তখন তাহারা লণ্ঠন লইয়া বাগানের ভিতর খুঁজিতে আরম্ভ করিল।

হেমন্ত দেখিল, বিপদ—এখনি উহাবা আসিয়া পড়িবে। এখন উপায় কী ? প্রাচীব লঙ্ঘন কবিয়া পলাযন ভিন্ন উপায নাই। হেমন্ত জুতা খুলিযা ফেলিল। ইহারাও যেমন বাগানের ভিতব প্রবেশ করিতেছে, সেও গাছেব আড়ালে আড়ালে প্রাচীরের দিকে অগ্রসব হইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে একজন চিৎকার করিযা উঠিল, "উ কা শারোয়া ভাগে হে!"

সেখানে একটা কৃত্রিম পাহাড় ছিল। হেমন্ত একটা পাথর তুলিয়া সজোরে তাহাদের দিকে ছুঁড়িয়া দিল।"

"আরে বাপ্‌রে বাপ্‌—জান গইল রে বাপ", বলিয়া একজন আর্তনাদ করিয়া উঠিল। রায় বাহাদুর হাঁকিলেন, "ক্যা হুয়া ?"

এই সময় আরও দুই তিনখানা প্রস্তর সবেগে আসিয়া পড়িল। লোকগুলা হটিয়া গেল। বলিল, "হুজুর—পাথলসে মহাবীর সিংকা কপার ফোর দিহিস হে।"

"আচ্ছা রহো, হাম বন্দুক নিকালতেহে" বলিয়া রায় বাহাদুর সশব্দে জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন।

হেমন্ত দেখিল, প্রাচীরের নিকট যাওয়া এখন আর নিরাপদ নহে, রাণীর শয়নকক্ষের জানালা বরং কাছে। কোনও গতিকে যদি সে জানালার কাছে পৌঁছিতে পারে, তবে মই দিয়া উঠিয়া যায়,—ওরা পর বাগানে যত ইচ্ছা উহারা খুঁজুক—বাবা আসিয়া যত পারেন বন্দুক আওয়াজ করুন। এই ভাবিয়া সে গাছের আড়ালে আড়ালে গুটি গুটি জানালার দিকে অগ্রসর হইল। ক্রমে মই পাইয়া উঠিতে আরম্ভ করিল।

সে যখন অর্ধপথে উঠিয়াছে, তখন খিড়কী দরজা হইতে গুড়ুম করিয়া বন্দুকের আওয়াজ হইল। লণ্ঠনবাহী ভৃত্যসহ রায় বাহাদুর বাগানে প্রবেশ করিলেন। বধূর জানালার দিকে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইবামাত্র তিনি হাঁকিলেন, 'কে রে ? কে রে ?"

বলিতে বলিতে হেমন্ত জানালায় পৌঁছিয়া গেল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া তৎক্ষণাৎ মই টানিয়া তুলিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিল

রায় বাহাদুর হাঁকিলেন, "চোর ঘরমে ঘুষা - চোর ঘরমে ঘুষা। দৌড়ো-- সব আদমি ভিতরে চলো —পাকড়ো", বলিয়া তিনি সদলবলে বাড়ির মধ্যে ছুটিয়া আসিলেন। লোকগুলা উঠানে ঘাঁটি দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তিনি বন্দুক হস্তে ছুটিয়া গিয়া উপরে বধূর শয়ন কক্ষের দ্বার ঠেলিলেন।

ঝি কাঁপিতে কাঁপিতে দ্বার খুলিয়া দিল

রায় বাহাদুর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন মেঝের উপর তাঁহার পুত্রবধূ মূর্চ্ছিত অবস্থায় পড়িয়া, চোর পালঙ্কের উপর লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া আছে।

পরদিন রায় বাহাদুর "সামাজিক সমস্যা সমাধান" পুস্তকের একস্থান খুলিয়া "চতুর্বিংশতি" কথাটি কাটিয়া "দ্বাবিংশতি' এবং 'ষোড়শ' কথাটি কাটিয়া "চতুর্দশ" করিয়া দিলেন। যদি কখনও বহিখানির দ্বিতীয় সংস্করণ হয় তবে এইরূপ সংশোধিত আকারেই ছাপা হইবে।

| ফাল্গুন ১৩২২ |

প্রণয় পরিণাম

হিন্দু বয়েজ স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র মানিকলাল, প্রতিবেশী বালিকা কুসুমলতার সঙ্গে প্রেমে পড়িয়া গিয়াছে।

কবি গাহিয়াছেন, 'কে এমন প্রেমিক আছে, যে প্রথম দর্শনেই ভালবাসে নাই ?'—কেন, আমাদের মানিকলাল। কুসুমের সঙ্গে বাল্যকাল হইতে সে কত খেলা করিয়াছে, গাছের মগডালে উঠিয়া তাহাকে ছানাসুদ্ধ পাখির বাসা পাড়িয়া দিয়াছে, ঘোড়া সাজিয়া পৃষ্ঠে তাহাকে বহন করিয়াছে, কিন্তু তখন ত সে কোনোরূপ চিত্তচাঞ্চল্য অনুভব করে নাই। কে জানে, হয়ত সে মনের মনে, হৃদয়ের হৃদয়ে ভালবাসিত, অন্তরের সুগোপন অন্তরালে সে প্রচ্ছন্ন প্রবাহের অস্তিত্ব নিজেও অবগত ছিল না।

মানিকলাল নিজের কাছে নিজে ধরা পড়িয়াছে সম্প্রতি মাত্র। সেদিন মানিক কুসুমদের বাগানে, পেয়ারা পাড়িতে গাছে উঠিয়াছিল। কুসুম মাতার সঙ্গে গঙ্গাস্নান করিয়া বাড়ি ফিরিতেছে। কুসুমের পরিহিত বসনখানি জলসিক্ত, পৃষ্ঠলম্বিত ঘন কৃষ্ণ কেশরাজির প্রান্ত দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতেছে, আর্দ্র মুখখানি প্রভাতের সোনালি রৌদ্র লাগিয়া প্রতিমার মত চিকচিক করিতেছে। দেখিয়া মানিক হৃদয় হারাইল।

ইহারা চলিয়া গেলে পর, মানিক তাহার অন্তরে যেন এক অপূর্ব আলোকের রশ্মি প্রতিভাত দেখিল। সে-আলোক তাহার মনোদেহের প্রতি পরমাণুটিকে যেন বেড়িয়া নৃত্য করিতে লাগিল। আলোক মন অতিক্রম করিয়া ক্রমে তাহার চক্ষুযুগলে আসিয়া উপনীত হইল এবং নিমেষের মধ্যে নিখিল বিশ্বচরাচরে

ছড়াইয়া পড়িল। সেই নবীন আলোকে মানিক আকাশের পানে চাহিল—আকাশ আশ্চর্য নীল—এমন কখনও দেখে নাই। বসুন্ধরার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, বসুন্ধরা আজ পরমা সুন্দরী। দূরে দীর্ঘিকাতীরে ঘুঘু ডাকিতেছে—উকু পাখি কলরব করিতেছে, বউ-কথা-কও মাঝে মাঝে ঝঙ্কার দিতেছে ; পাখির ভাষায় যেন আজ নূতন প্রাণ, নূতন সুর। মানিক নিশ্বাস ফেলিয়া, গাছ হইতে নামিয়া আসিল।

তাহার কোঁচার খুঁটে গোটা দশেক পেয়ারা। ভাল দেখিয়া গোটা দুই রাখিয়া, বাকি সমস্ত বাগানে ছড়াইয়া দিল। পেয়ারায়—বিশেষত কোষো পেয়ারায়—আর তাহার চিত্ত নাই।

সেদিন রবিবার ছিল—স্কুল যাইতে হইবে না। আহতবৎ মন্থরপদে বাড়ি আসিয়া মানিক পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিল। পড়িবার জন্য ? হায়, না, পুড়িবার জন্য, চিন্তার অনলে নিজের হৃদয়কে আহুতি দিবার জন্য। শতরঞ্জ বিছানো মেঝেতে ওয়েবস্টার ডিক্সনারি মাথায় দিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

মানিকের বয়স চতুর্দশ বৎসর। এই বয়সেই সে বাঙ্গলা উপন্যাস পড়িয়াছে রাশি রাশি। 'মৃণালিনী', 'চন্দ্রশেখর', 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' হইতে আরম্ভ করিয়া বটতলার 'পারুলবালা', 'সোহাগিনী', 'বউরানী' প্রভৃতি কিছুই আর বাকী নাই।

শুইয়া শুইয়া মানিক আকাশ পাতাল চিন্তা করিতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, দুঃখ যেন তাহার হৃদয়ে ধরিতেছে না—উথলিয়া যেন গ্রন্থ হইয়া বাহির হইতেছে। 'কেন দেখিলাম ! হরি হরি কী দেখিলাম ! দেখিলাম ত মরিলাম না কেন ? আমার মনে এ আগুন—এ কুলকাঠের আঙার— কে জ্বালিল রে ? নিবিবে কি ? কতদিনে—হায় কতদিনে ?'—ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিয়ৎক্ষণ পরে শিস দিতে দিতে লম্ফ দিয়া মানিকের সহপাঠী বন্ধু বিপিন ও শরৎ প্রবেশ করিল। বিপিন আসিয়া একেবারে মানিকের চুল ধরিয়া বলিল, "কি রে ইস্টুপিট্‌ ঘুমুচ্ছিস নাকি ? মার্বেল খেলবিনে ?"

মানিক উঠিয়া বিপিনের গালে হঠাৎ এক চড় কসাইয়া দিল।

বিপিন হতভম্ব। শরৎ বলিল, "তোর হয়েছে কি ? মারামারি করতে চাস, আয়", বলিযা শরৎ আস্তিন গুটাইতে লাগিল।

বিপিন বলিল, "আঃ, শরতা কি করিস।" মানিকের পানে ফিরিয়া বলিল, "লেগেছে ভাই, রাগ করেছিস ?"

মানিক বলিল, "মানুষ শুয়ে রয়েছে, চুল ধরে টানলি কি বলে ?"

শরৎ মানিকের চুল ধরিয়া টানিয়া বলিল, "আহা এ-রকম করে টানলে বুঝি আবার লাগে ?"—তাহার আশা ছিল, তাহাকেও মানিক চড় মারিবে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ শরৎ তাহার সহিত ঘুঁসি লড়িতে আরম্ভ করিবে।

কিন্তু শরতের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না। মানিকের ক্রোধ নিরীহ বিপিনের উপরেই সবটা খরচ হইয়া গিয়াছিল। মানিক সটান আবার শুইয়া পড়িল।

শরৎ বলিল, "না খেলিস—না খেলবি। ভারি ত বয়েই গেল কিনা।" বলিয়া বিপিনের হাত ধরিয়া বলিল, "চল্‌ রে বিপনে।"

বিপিন যাইবার সময় বলিয়া গেল, "মানিক রাগ করিসনে ভাই—যদি লেগে থাকে তোর, বিলক্ষণ শোধ ত নিয়েছিস।"

মানিক আর ফুটবল খেলে না—জিম্‌ন্যাস্টিক করা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে। দ্বিপ্রহরে ইস্কুল পলাইয়া গঙ্গাতীরে বসিয়া কবিতা লেখে। প্রভাতে, সন্ধ্যায় নানা ছলে কুসুমদের বাড়ি গিয়া কুসুমকে দেখিয়া আসে।

কুসুম মেয়েটি দেখিতে খুব সুন্দরী না হউক, মুখখানি বেশ ফুটফুটে। পিতামাতার শেষের সন্তান—ভারি আদরের মেয়ে। কুসুম এই কার্তিক মাসে এগারো বছরে পড়িয়াছে। দুই এক স্থানে বিবাহের কথাবার্তা হইতেছে, কিন্তু এখনও পাকাপাকি কোথাও স্থির হয় নাই।

মানিক ক্রমাগত কুসুমের সঙেগ দেখা করিয়া, কথা কহিয়া, জিনিস দিয়া তাহার সঙ্গে একটু বেশ ঘনিষ্ঠতা করিয়া লইল। মানিকের প্রতি কুসুমেরও একটা টান যেন দেখা যাইতে লাগিল।

বৈশাখের শেষে, কলেজ বন্ধ হওয়াতে, মানিকের এক পিসতুতো ভাই প্রভাস আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রভাস মানিক অপেক্ষা তিন বৎসরের বড়। মানিক তাহাকে কতকটা গুরুজন বলিয়া গণ্য করিত এবং ভয় করিয়া চলিত। প্রভাস আসিলেই মানিককে পড়া জিজ্ঞাসা করিত, আঁক কষিতে দিত, পিতা-মাতার প্রতি ভক্তি, অসৎসঙ্গের দোষ, অধ্যবসায় প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশাদি দিত।

কিন্তু কলিকাতার বন্ধুগণের মধ্যে প্রভাস একজন নীরব কবি বলিয়া বিখ্যাত। তাহার মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রোমান্স, কেবল প্রেমপাত্রীর অভাবে কোনও মতে প্রেমে পড়া হইতে বিরত আছে।

সে আসিয়া মানিকের ভাবগতি দেখিয়া বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—ব্যাপারটা কি?

মানিক তা কিছুই স্বীকার করে না। সন্ধান করিয়া করিয়া শেষে একদিন প্রভাস মানিকের কবিতার খাতা হাতে পাইল। কবিতা পড়িয়া ব্যাপার কিছুই বুঝিতে বাকি রহিল না। মানিকের উপর তাহার ভারি ভক্তি ও সৌহার্দ্য বোধ হইল।

সেদিন জলখাবার খাইয়া প্রভাস মানিককে বলিল, "গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে আসা যাক চল।"

মানিক প্রথমে আপত্তি করিয়াছিল- -কিন্তু প্রভাস অনেক জিদ্ করিল, কিছুতেই ছাড়িল না।

গঙ্গাতীরে কিয়ৎক্ষণ বেড়াইয়া, তীরে উঠানো এক ভাঙ্গা নৌকার গায়ে দুইজনে উপবেশন করিল।

প্রভাস বলিল, "আমি সব জানতে পেরেছি।"

মানিক আশ্চর্য হইয়া বলিল, "কী?"

"তোমার গোপন কথা।"

মানিক ভাবিল—নিশ্চয়ই সিগারেটের বিষয়। ডেস্কের মধ্যে লুকানো বার্ডসাই, কাগজ প্রভৃতি প্রভাসদাদা বোধ হয় দেখিতে পাইয়াছে, সুতরাং সন্দিগ্ধভাবে বলিল, "বেশী চালাকি করো না, যাও।"

প্রভাস বলিল, "এ চালাকির কথা নয়—খুব গুরুতর কথা। জীবন মরণের

সমস্যা।"

এবার মানিক যথার্থ বিষয়টি সন্দেহ করিল। বলিল, "কী হয়েছে কী ? কী বিষয় বলই না।"

প্রভাস দূরস্থিত মৃদুগামী নৌকাব পালে দৃষ্টি বদ্ধ করিযা বলিল, "তোমার ভালবাসার বিষয়।"

মানিক ভাবিল—নিশ্চয়ই বাবাকে বলিয়া দিবে এবং মার খাওয়াইবে, সুতরাং শত্রুভাব ধারণ করিয়া মুখ খিচাইয়া বলিল, "আহা, যা বল্লে আর কি ! ইয়ার্কি ভাল লাগে না।"

প্রভাস বলিল, "ভাই—আমার কাছে আর লুকাও কেন ? আমি সব জেনেছি। তোমাদের দুঃখে আমি খুব দুঃখী। তোমাদের সঙ্গে আমার আন্তরিক সহানুভূতি।"

মানিক কতকটা আশ্বস্ত হইল। একটু অপ্রতিভও হইল। বলিল, "কে বললে তোমায় ?"

নৌকার গায়ে জুতার গোড়ালি ঠুকিতে ঠুকিতে প্রভাস বলিল, "তোমার কবিতার খাতা দেখেছি। আমাদের অতুল বাঁড়ুয্যের মেয়ে কুসুম ত ?"

মানিক ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—তাই বটে।

"তোমার কবিতা থেকে যেন বোঝা যাচ্চে, আকর্ষণটা উভয়ত প্রবল—তাইকি ?"

মানিক বলিল, "মনে ত হয়।"

"স্পষ্ট কখনও বলেছে ?"

"না।"

"তুমি কখনও তাকে স্পষ্ট করে বলেছ ?"

"না।"

ইহাব পর দুইজনে কিযৎক্ষণ নীরব হইয়া বসিয়া রহিল। শেষে প্রভাস বলিল—"দেখ, ওরা আমাদের স্বঘব। মিলন হওয়া কিছুই আশ্চর্য নয়। কিন্তু মা বাপকে জানানোর আগে কুসুমের মন জানা দরকার। অনুমান-ফনুমান নয়, স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করতে হবে।"

মানিক বলিল,"সে কখনও পারা যায় ?"

প্রভাস ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "সে না পারলে চলবে কেন ? তুমি যদি সত্যিই ওকে লাভ করতে চাও, তা হলে এ বিষযে যা কিছু কর্তব্য, সব তোমায় সম্পন্ন করতে হবে। তা না হলে কী করে হবে ? আর দেরি করলেও চলবে না। কুসুমের কত জায়গায় বিয়ের কথা হচ্চে, কোন্ দিন বিয়ে হয়ে যাবে। তখন চিরদিনটে তোমার আপশোস করতে হবে।"

এ কথা শুনিয়া মানিক চঞ্চল হইয়া উঠিল। এতদিন সে শুধু ভালই বাসিতেছিল। বিবাহ প্রভৃতির কল্পনা কখনও করে নাই। এখন মনে হইতে লাগিল, বিবাহ হইলে ত ভারি মজাই হয়।

"দাদা ! কী ক'রে তার কাছে কথা পাড়ি বল দিকিন ?"

"তা আমি শিখিয়ে দিচ্চি। এটু অবসর খুঁজে, আড়ালে পেলে, তার হাতখানি

এমনি করে ধরে, তাকে বলবে—'দেখ কুসুম—আমি তোমায় ভালবাসি। একটা দুরাশা মনে স্থান দিয়েছি, তুমি আমাকে ভালবাস কী?" যদি বলে 'বাসি'—তা হলে জিজ্ঞাসা করবে, 'তুমি আমার হবে কি—আমায় বিয়ে করবে কী?' যদি সে অনুকূল উত্তর দেয়—তা হলে তার হাতটি এই রকম করে ঠোঁটে তুলে চুমো খাবে।"

মানিক বলিল, "কিন্তু দাদা, সে যদি রাজি না হয়?"

প্রভাস বলিল, "তা প্রথমবারেই রাজি নাও হতে পারে। ও রকম অনেক কেতাবে পড়া গেছে। প্রথমবারে কেউ কেউ একেবারেই 'না' বলে। কেউ কেউ বা বলে—'ভারি সহসা বলেছ, সময়ে উত্তর পাবে।' যে রকম হয়—তখন আবার তোমাকে শিখিয়ে দেব।"

চাঁদ উঠেছিল। দুইজনে নানা জল্পনা করিতে করিতে বাড়ি ফিরিয়া আসিল।

৩

পরদিন হইতে মানিকলাল অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিল। কয়েক দিন চেষ্টার পর তাহা লাভও করিল। একদিন সকালে কুসুমদের বাড়ি গিয়া দেখে, বাড়িতে কেহ নাই, কুসুম রান্নাঘরে বারান্দায় পা ছড়াইয়া বসিয়া মুড়ি খাইতেছে।

মানিক বলিল, "কুসুম! বাগানে যাবে? তোমায় আম পেড়ে দিইগে চল।"

কাঁচা আমের নামে কুসুমের জিহ্বা জলসিক্ত হইয়া উঠিল। ঢোক গিলিয়া বলিল, "চল না মানিকদাদা।"

বাগানে প্রবেশ করিয়া, এদিকে ওদিক চাহিয়া মানিক বলিল, "আমি ভারি ফুল ভালবাসি।"

কুসুম বলিল, "খবরদার—খবরদার—ফুল তুলো না—ফুল তুললে দিদিমা যে বকে।"

মানিক বলিল, "না তুলাছনে। শুধু ফুল ভালবাসি তাই বলছি। ফুলকে ভাল কথায় কি বলে জান?"

কুসুম মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "আহ কে না জানে?—পুষ্প। আমাদের পদ্যপাঠে রয়েছে—

শাখীশাখে পুষ্পগুলি কিবা মনোহর,
পাখি ডাকে সুধা ঢালে শ্রবণ ভিতর॥

আচ্ছা মানিকদা, তুমি ত ইংরেজী পড়, শাখী মানে কি বল দিকিনি?"—কুসুমের চক্ষু দুইটি মানিকের পানে চাহিয়া হাসিতে লাগিল।

মানিক বলিল, "পুষ্প ছাড়া ফুলের আর কি নাম হয়?"

"আহা! তুমি আগে আমার কথার উত্তর দাও না, মশাই। শাখী মানে কি?"

"শাখী মানে বৃক্ষ।"

"জানে রে!" বলিয়া কুসুম হাসিতে হাসিতে মাথা নাড়িল।

মানিক বলিল, "এখন বল, পুষ্প ছাড়া ফুলের আর কী নাম হয়।"

"আর কী নাম? দাঁড়াও ভাবি।" বলিয়া কুসুম ঠোঁট নাড়িয়া বিজ্‌বিজ্ করিয়া

কী বকিতে লাগিল। বোধ হয় কোন কবিতা আবৃত্তি করিতেছিল।

মানিক বলিল—"কু—"

কুসুম বলিল—"কু ? কু কী ?

কুহু কুহু রব করি ডাকিছে কোকিল।

কুসুম—

ওহো মনে পড়েছে। ফুলের আর একটা নাম কুসুম গো কুসুম।

কুসুম দুলায়ে ধীরে বহিছে অনিল ॥

আচ্ছা, মানিকদাদা, অনিল মানে যদি বলতে পার তবে ত বুঝি !"

মানিক বলিল, "অনিল মানে বাতাস।"

বালিকার চক্ষে একটা আনন্দ ও প্রশংসার আলোক দেখা দিল।

মানিক যথাশিক্ষা কুসুমের হাতখানি ধরিল। ধরিয়া বলিল, "বুঝতে পারলে না ? আমি ফুল ভালবাসি বলেছি, তার মানে, আমি কুসুম ভালবাসি। আমি তোমায় ভালবাসি, কুসুম। তুমি আমায় ভালবাস ?"

কুসুম দ্বিধামাত্র না করিয়া বলিল, "হ্যাঁ।"

মানিক বলিল, "দেখ কুসুম, অনেক দিন থেকে একটা দুরাশা মনে স্থান দিয়েছি। তুমি আমায় বিয়ে করবে ?"

প্রথম কথাটার মানে কুসুম কিছুই বুঝিতে পারে নাই। দ্বিতীয় কথাটাব মানে বুঝিল। কিন্তু ওই কথাতেই সব মাটি হইয়া গেল।—"ধেৎ"—বলিযা মানিকেব হাত ছাড়াইয়া, কুসুম ছুটিয়া পলাইয়া গেল। তাহার পায়েব মল ঝম্‌ঝম করিযা বাজিতে লাগিল। যতক্ষণ দেখা গেল, মানিক তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

কুসুম চক্ষুর অন্তরাল হইলে মানিক ব্যাপাবটা মনে মনে পর্যালোচনা করিতে লাগিল। বিবাহেব নামে কুসুম অমন করিয়া ছুটিয়া পলাইল, তাহার অর্থ কী ? তবে কি কুসুম সম্মত নয ?

অধীত উপন্যাসগুলি মানিক একে একে স্মরণ করিতে লাগিল। ক্রমে মনে একটা মীমাংসাও পাইল। লজ্জা প্রণযের চির-সহচর। কুসুমের পলাযনেব কাবণ যে লজ্জা, সে সম্বন্ধে তাহার মনে আব কোনও সংশয় বহিল না।

৪

প্রভাস শুনিয়া বলিল—তবে আর কোনও চিন্তা নাই। ভালবাসে যখন স্বীকার করিয়াছে, তখন বিবাহে সম্মতি ধরিয়াই লওয়া যাইতে পাবে। এখন উভয় পক্ষের পিতামাতার সম্মতি করাইতে পারিলেই কার্যসিদ্ধি।

মানিক বলিল, "বাবাকে তুমি বললে বাবা রাজী হবেন ত ?"

প্রভাস বলিল, "দেখ, তার চেয়ে বরং তুমিই বল, আমার বলাটা তত ভাল দেখায় না। হাজার হোক তোমার বাবা—আমার মামা বই ত নয় ! বাবায় মামায় ঢের তফাৎ।"

মানিক বলিল, "সে আমি পারব না। তুমি গোড়া থেকেই বললে তুমিই প্রস্তাবটা করবে, এখন পিছুচ্চ কেন ?"

প্রভাস প্রথমটা মানিককে যে-পরিমাণ উৎসাহ দিয়াছিল, কার্যকালে তাহা রক্ষা করিতে পারিল না। মানিকের পিতা নন্দলালবাবু অত্যন্ত রাশভারি লোক। তাহার নিকট অগ্রসর হইয়া কথা পাড়ায় বিলক্ষণ সাহসের প্রয়োজন।

এইরূপে ইতস্তত করিতে করিতে সপ্তাহ খানেক কাটিল। মানিক ও প্রভাস যখনই নির্জনে থাকিত—তখন আর দুজনের অন্য কথা নাই। পূর্বে দুজনের মধ্যে গুরুশিষ্য গোছের যে একটা অনির্দিষ্ট সম্পর্ক ছিল, এখন তাহা ঘুচিয়া সখ্যে দাঁড়াইয়াছে।

একদিন মানিক কুসুমের নামে একটা মস্ত কবিতা লিখিল। প্রভাস তাহা পড়িয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। বলিল—স্বয়ং অনুভব করিয়া কবিতা না লিখিলে কি আর কবিতা! বলিল, ইহা কুসুমকে নিশ্চয়ই দেখান উচিত।

উত্তম চিঠির কাগজে লাল কালির বর্ডার টানিয়া, নীল কালি দিয়া মানিক কবিতাটি নকল করিল। তাহার পব আবার অবসব খুঁজিয়া কুসুমের সঙ্গে নির্জনে সাক্ষাৎ করিল।

কুসুম কবিতা লইয়া পডিল। কী বুঝিল সে জানে! মানিক বলিল, "কুসুম, তুমি এটি রাখবে?"

কুসুম বলিল, "রাখব বইকি।"

মানিক কুসুমের আগ্রহ দেখিযা আনন্দে অধীর হইযা বলিল, "কারুকে দেখাবে না ত কুসুম?"

কুসুম প্রবলভাবে ঘাড় নাডিযা বলিল, "কারুকে নয।"

"খুব লুকিয়ে নিয়ে যেও। কোথায় বাখবে?"

"কেন আমার বাক্সে।"

মানিক নিশ্চিন্ত হইয়া বাড়ি আসিল।

ওদিকে পবম সত্যবাদিনী কুসুম বাড়ি গিয়াই বলিল, "দিদি একটা কথা বলি শোন্।"

তাহাব দিদির নাম নলিনী। সে ষোল বৎসরের, বিবাহিতা; স্বামীর প্রেমে ভবপুর—মনেব সুখে হাস্য কৌতুকময়ী।

দিদি আসিলে কুসুম বলিল, "মেজদি একটা মজা দেখবি?"

"কী?"

কুসুম খামখানি বাহিব করিয়া বলিল, "কারুকে বলিবিনে?"

"কার চিঠি লা?"—বলিয়া নলিনী ছোঁ মাবিযা খাম কাড়িয়া লইল। মুহূর্ত মধ্যে তাহা খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল:

"কুসুমলতা
মনেব কথা
শুন সই।"

পড়িয়া নলিনী অবাক। পাতা উল্টাইয়া নাম খুঁজিল, কোনও নাম নাই। জিজ্ঞাসা করিল "এ কোথা পেলি?"

"মানিকদাদা দিয়েছে।"

"কে? ম্যানকা?"

"হ্যাঁ।"

নলিনী গালে হাত দিয়া বলিল, "ওমা কী হবে। তোকে এ সব লিখেছে কেন?"

কুসুম ভীত হইয়া বলিল, "তা কি জানি!"

"এ যে ভালবাসার কবিতা! তোদের ভালবাসা হয়েছে নাকি লো?"

কুসুম বলিল, "ম্যানকা আমায় একদিন বলছিল যে আমি তোকে ভালবাসি।"

নলিনী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, "আহা তা বেশ! ছেলেটির পছন্দ ভাল"—বলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল—

"কুসুমলতা
মনের কথা
শুন সই।
দিবা রজনী
তব মুখখানি
মনে লই।"

পড়িয়া নলিনী হাসিয়া কুটিকুটি। বলিল—"দুনিয়ার আর মিল খুঁজে পেলে না, শেষে লিখলে কিনা 'মনে লই'। তার চেয়ে 'চিঁড়ে দই' লিখলে ঢের বেশি সরস হত। কি বলিস কুসমি? শোন দিকিন--

কুসুমলতা
মনের কথা
শুন সই।
তব মুখখানি,
দিবা রজনী
চিঁড়ে দই।

অর্থাৎ কিনা চিঁড়ে দই দেখলে, কাক কারু যেমন খাবার লোভ হয়, তোমার মুখখানি দেখলে—আমারও সেই রকম--লোভ হয়।"—বলিয়া নলিনী খুব হাসিতে লাগিল।

হাসির শব্দে মা আসিয়া প্রবেশ করিলেন। বলিলেন, "অত হাসছিস কেন? হয়েছে কী?"

নলিনী মার হাতে চিঠি দিয়া বলিল "এই নাও মা, তোমার ছোট জামাই তোমার মেয়েকে কী লিখেছে দেখ।"

মা লেখার পানে চাহিয়া বলিলেন, "কথার ছিরি দেখ না। কী বলিস তার ঠিক নেই। কী এ?"

নলিনী মার কাছে সরিয়া গিয়া বলিল, "ভালবাসার চিঠি। এত বড় মেয়ে হল, বিয়ে দিচ্ছ না—তা মেয়ে নিজের বর নিজেই ঠিক করে নিয়েছে।"

মা ত অবাক। বলিলেন, "কে লিখেছে এ সব?"

"সে পরে বলব। আগে শোনাই না।"—বলিয়া মার হাত হইতে কবিতা লইয়া নলিনী পড়িতে আরম্ভ করিল.

"কুসুমলতা
মনেব কথা
শুন সই।
তব মুখখানি
দিবা রজনী
মনে লই।
শয়নে স্বপনে
কিম্বা জাগবণে
সদা সর্বদা
চিন্তা করি তোমা
রূপ নিরুপমা
ওগো প্রেমদা।
ভাবিয়া ভাবিয়া
নিদ্রা তেযাগিয়া
ফেলি অশ্রুজল।
যথা শুষ্ক তরু
হনু এবে সরু
দেহ্ টলমল।—"

মা বাধা দিলেন। বলিলেন, "কি পাগলামি কবছিস, বঙ্গ ভাল লাগে না। কে লিখেছে বল্ না?"

"চৌধুবীদেব ম্যান্‌কা লিখেছে।"

"ম্যানকা? আবে গেল যা। কী দস্যি ছেলে গো। এ কী বিদ্যে?"—বলিয়া মা কুসুমকে খুঁজিতে লাগিলেন, "কুসমি, কুসমি, কুসমি কোথা গেল?"

কুসুম গোলযোগ দেখিয়া পূর্বেই চম্পট দিয়াছিল।

ক্রুদ্ধা জননী বাহিব হইযা কুসুমকে গ্রেপ্তাব কবিলেন। বলিলেন "এ কি বে শতেকখোযারী?"

কুসুম গোঁ হইযা বলিল, "আমি কি জানি!"

"তুই জানিসনে ত কে জানে আবাগী?—খেযে খেযে দিনকেব দিন হাতি হচ্চেন—আর এই সব বিদ্যে হচ্চে। কি হযেছে বল।"

কুসুম বলিল, "হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া ম্যানকা আমায দিলে ত আমি কী কবব? —আমাব বুঝি দোষ, বা বে।"

"কী বলেছে দেবাব সময় তোকে?

'বলেছে মাকে কি কাউকে দেখাসনে—বাক্সতে লুকিয়ে রাখিস।"

মা তখন কুসুমকে অনেক জেবা করিলেন। জেরাব শেষে কুসুম বলিল, একদিন বাগানে ডেকে নিয়ে ম্যান্‌কা আমায বললে কি, তোকে আমি আম পেড়ে দেবো তুই আমায় বিয়ে কববি? 'দূর পোড়ারমুখো' বলে আমি পালিয়ে এলাম।"

এই কথা শুনিয়া, রাগেব মধ্যেও মার ওষ্ঠেব কোণে একটু হাসি দেখা দিল।

শেষে তিনি বলিলেন—"শোন্ বলছি। ফের যদি ম্যান্কার ত্রি-সীমানায় যাবি কি ওর সঙ্গে কথা ক'বি, কি খেলা করবি—তা হলে গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলব। বুঝেছিস ?"

কুসুম কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "বা রে। আমি কি করব ? আমায় দিলে কেন ?"

মা তখন সে কবিতা কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া উনানে ফেলিয়া দিলেন।

৫

অহো, কবি সত্যই বলিয়াছেন—যথার্থ প্রণয়ের পথ কখনও মসৃণ হয় নাই। যে ভালবাসিয়াছে, সেই কাঁদিয়াছে। প্রেম যে 'কেবলি যাতনাময়', তাহাতে যে 'কেবলি চোখের জল' এ কথা কে অস্বীকার করিবে ?

কুসুম ত বকুনি খাইয়াই নিস্তার পাইল, কিন্তু মানিকলালেব অদৃষ্টে আরও দুর্গতি লেখা ছিল।

মানিকের পিতা নন্দ চৌধুরী গ্রামেব ডাক্তার—খুব পশাব। প্রাতে রোগী দেখিতে বাহির হন, যখন বাড়ি আসেন তখন প্রায় বারোটা। স্নান আহাব করিয়া নিদ্রা যান।

সুতরাং প্রভাস ও মানিক পরামর্শ করিল, বৈকালে নিদ্রাভঙ্গের পর প্রভাস গিয়া কথাটা পাড়িবে।

দুইজনে বাহিরের ঘরে বসিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। একটা প্রবল আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তায় দুইজনের মুখই কালিমাময়।

শেষে চারিটা বাজিল শব্দ শোনা গেল, বিছানা হইতে নন্দ চৌধুরী হাঁকিলেন, "ওরে বুনো—তামাক নিয়ে আয়।"

আরও কয়েক মিনিট গেল। তার পর কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভাস গিয়া মামাবাবুর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল।

নন্দ চৌধুরী বিছানার উপর তাকিয়া হেলান দিয়া বসিয়াছেন। নিদ্রাভঙ্গে তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ। নিম্নে একটি ক্ষুদ্র চৌকিতে গুড়গুড়ি রক্ষিত। ধূমপান করিতেছেন।

প্রভাস প্রবেশ করিয়া, বিছানার কাছে একটা চেয়ার ছিল তাহাতে বসিল।

নন্দ চৌধুরী বলিলেন, "কি প্রভাস।" তাঁহার স্বর বৈকালিক নিদ্রার শ্লেষ্মাজড়িত।

প্রভাস কপালের ঘাম মুছিয়া বলিল, "আজ্ঞে একটা কথা আজ আপনাকে বলব মনে করেছি।"

নন্দ চৌধুরী উৎসুক হইয়া, গুড়গুড়ির নল মুখ হইতে খুলিয়া প্রভাসের পানে চাহিয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "কী ?"

প্রভাসের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। মনে হইতে লাগিল—কেন আসিলাম—কেন এ জালে নিজেকে জড়াইলাম ? কিন্তু আরম্ভ যখন করিয়াছে, আসরে নামিয়াছে, শেষ পর্যন্ত যাইতেই হইবে। সুতরাং বাক্যস্ফুরণ করিতে বাধ্য

হইল। বলিল, "আমাদের মানিকের জন্যে ভারি চিন্তিত হতে হয়েছে।"

"কেন ? কী হয়েছে ? কোনও ব্যারাম-স্যারাম নাকি ?" ডাক্তার মানুষ, ব্যাধির কথাটাই প্রথমে মনে হয়।

প্রভাস বলিল, "আজ্ঞে শারীরিক ব্যারাম নয়, মানসিক বটে।"

চৌধুরী গুড়গুড়ির নল পুনরায় মুখে লইয়া বলিলেন—"কী রকম ?"

"ও একটি মেয়ের সঙ্গে Love-এ পড়েছে।"

গুড়গুড়ির নল মুখ হইতে একেবারে বিছানায় ফেলিয়া নন্দ চৌধুরী উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন, "কী বললে ?"

প্রভাস তাঁহার ভঙ্গি দেখিয়া বিপদ গণিল। বলিল, "আজ্ঞে, একটি মেয়ের সঙ্গে প্রণয় হয়েছে।"

"প্রণয় হয়েছে ? সে আবার কী রকম ? ব্যাপারখানা কী ? কার সঙ্গে প্রণয় হয়েছে ?"

"আজ্ঞে, অতুল বাঁড়ুজ্যের যে কুসুমলতা বলে একটি মেয়ে আছে, তার সঙ্গে ও 'লভে' পড়েছে। তাই আপনাকে বলতে এসেছি, যদি ওর জীবনের সুখ চান, তবে কুসুমের সঙ্গে ওর বিবাহ দিন।"

নন্দ চৌধুরী শুনিয়া গম্ভীর হইয়া তামাক খাইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, স্বর একটু নামাইয়া বলিলেন, "কী রকম ক'রে 'লবে' পড়ল ?"

প্রভাস মনে মনে অত্যন্ত উৎসাহিত হইল। ভাবিল, তবে সন্তানের দুঃখে পিতার মন গলিয়াছে। বলিল, "আজ্ঞে, কী রকম করে পড়ল তা বলা বড় কঠিন—তবে এ পর্যন্ত বলতে পারি যে আর্কষণটা উভয়ত প্রবল।"

চৌধুরী বলিলেন, "উভয়ত প্রবল ?—বটে !"—বলিযা তামাক খাইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিয়ে করতে চায় ?"

মাথা নীচু করিয়া, ধীরে ধীরে প্রভাস বলিল, "আজ্ঞে এই ত একমাত্র স্বাভাবিক পরিণাম। মানিক বলেছে, যদি বিয়ে না হয়, তা হলে ওর জীবন মরুভূমি হয়ে যাবে।"

চৌধুরী বলিলেন, "মরুভূমি ? ওঃ।' বলিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন।

প্রভাস একটু অপেক্ষা করিয়া বলিল, "প্রথম প্রণয় প্রায়ই ভারি গভীর হয়। তাকে বাধা দিতে যাওয়া অনেক সময় সর্বনাশ।"

চৌধুরী বলিলেন, "ম্যান্‌কাকে ডাক।"

প্রভাস উঠিয়া পড়িবার ঘরে গেল। দেখিল, হাতে মুখ ঢাকা দিয়া মানিক শুইয়া আছে। একটু হাসিমুখে বলিল, "মানিক যাও ভাই মামাবাবু ডাকছেন।"

মানিক বলিল, "কি রকম বুঝলে ?"

"এ পর্যন্ত ত খুবই আশাপ্রদ। খুব সহৃদয় ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন।"

মানিকের কিন্তু বিশ্বাস হইল না। সত্যই কি এত সৌভাগ্য তাহার হইবে ? বলিল, "চল তবে।"

প্রভাস বলিল, "তুমি একা যাও। কারণ এ সময় কোনও তৃতীয় ব্যক্তির থাকাটা ঠিক নয়। বিষয়টা ভারি—কি বলে গিয়ে—ইয়ে কিনা।"

মানিক বলিল, "না ভাই তুমি এস—নইলে আমার ভারি ভয় করবে।"

প্রভাস বলিল, "আচ্ছা, মিনিট দশ পরে আমি যাচ্ছি"—বলিয়া মানিককে ঠেলিয়া দিল।

মানিক প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাহার পিতা আর্শির কাছে দাঁড়াইয়া একটা পাকা গোঁফ উঠাইবার চেষ্টা করিতেছেন। মানিকের ছায়া আর্শিতে পড়িল।

নন্দ চৌধুরী ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। মানিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর এগ্‌জামিন কবে?"

মানিক বলিল, "আর বারো দিন আছে।"

"কী রকম তৈরি হল?"

"আজ্ঞে, হয়েছে এক রকম।"

"পড়াশুনো করছিস বেশ মন দিয়ে? না খালি খেলিয়ে খেলিয়ে বেড়াচ্ছিস?"

"আজ্ঞে না, খেলা বেশি করিনে।"

"তবে কি করিস? 'লবে' পড়েছিস নাকি শুনলাম?"

মানিক তাঁহার স্বর ও ভঙ্গিমা দেখিয়া উত্তর করিতে সাহস করিল না। দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিল।

তাহার পিতা ধীরে ধীরে তাহার কাছে সরিয়া আসিলেন। আসিয়া, বাম হস্ত দ্বারা মানিকের দক্ষিণ কর্ণটি ধারণ করিলেন। করিয়া বলিলেন, "উত্তর দিচ্ছিসনে যে?"

মানিক কি একটা কথা বলিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু কথা বাহির হইল না।

তাহার পিতার রক্ত-চক্ষু দুইটা ঘুরিতে লাগিল। দন্তে দন্ত ঘর্ষিত হইতে লাগিল।

ঘূর্ণায়মান চক্ষু স্থির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, "ইস্টুপিড শূয়োর! আজ বাদে কাল এগজামিন—লেখা গেল পড়া গেল, লব্ হচ্চে?"—বলিয়া ঠাস ঠাস করিয়া তাহার গণ্ডদেশে কয়েকটা চড় কষাইয়া দিলেন।

প্রভাস এই সময়ে দুয়ারের কাছ বরাবর আসিয়াছিল। চড়ের শব্দ শুনিয়া সে অবিলম্বে চম্পট দিল।

মানিক দুই হাতে মুখ ও চক্ষু ঢাকিয়া অনুচ্চস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

নন্দ চৌধুরী তখন বালককে ছাড়িয়া বিছানায় আসিয়া বসিলেন। বলিতে লাগিলেন, "এ ক'দিন দিবেরাত্তির কেবল প্রভাসের সঙ্গে গুজগুজ ফুসফুস হচ্চেই হচ্চেই—আমি ভাবি ব্যাপারটা কি—এরা কুইনের রাজ্য নেবারই মতলব করছে—না কি করছে? হতভাগা পাজি নচ্ছার হনুমান। লবে পড়া হয়েছে! মরুভূমি হয়ে যাবে! এত কথা শিখলে কোথা—তাই ভাবি। আমরা বুড়ো হয়ে মরতে চললাম, এত কথা ত জানিনে? পড়াশুনোর নাম নেই। খাবি কী এর পরে? আমি এই সারা দুপুর রোদ্দুরটা মাথায় করে, রুগীর নাড়ি টিপে বেড়াচ্চি, দুটো পয়সার জন্য মুখে রক্ত উঠে মরছি—যতদিন বেঁচে আছি ততদিন মন দিয়ে পড়ে শুনে নিজের কাজ কিনে নে—তা নয় লবে পড়েছেন ছেলে আমার! আর প্রভাসটা যে কলেজে লেখাপড়া শিখে এত বড় বাঁদর হয়েছে তা ত জানতাম না! ওকালতনামা নিয়ে এসেছ! আরে গেল যা!—ফের যদি ওসব পাগলামি

শুনতে পাই ত জুতিয়ে পিঠ ছিঁড়ে দেবো।”

অতঃপর মানিক কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান করিল।

ডাক্তারবাবুর চিকিৎসা আশু ফলপ্রদ হইল। মানিক ছেলেটিকেও অতি সুবোধ বলিতে হইবে। উপন্যাসের অনুকরণে প্রেমে পড়িয়াছিল, কিন্তু উপন্যাসের অনুসারে গৃহ ত্যাগ করিল না—বিষও খাইল না। বিষ খাইল না বটে—তবে কুসুমের বিবাহের সময় লুচি খাইল বিস্তর। এত খাইল যে তাহার পরদিন অসুখ হইয়া পড়িল। সেই সুযোগে সপ্তাহখানেক স্কুলে গেল না। প্রভাস চলিয়া গিয়াছিল। প্রেমিকের আদর্শ খর্বতার জন্য মানিকের কাহারও নিকট জবাবদিহি করিবারও রহিল না। তাই অসুখ দুই দিনেই ভাল হইল—বাকি দিনগুলি অধিকাংশ সময় মানিক বৃক্ষের শাখায় শাখায় লম্ফ দিয়া অতিবাহিত করিল।

প্রতিজ্ঞা পূরণ

ভবতোষ কলেজে ইংরাজি পড়িতেছে বটে, কিন্তু সে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত। ইংরাজি বিদ্যার প্রতি তাহার তিলমাত্র শ্রদ্ধা নাই। ইংরাজি পড়িয়া পড়িয়াই দেশটা উৎসন্ন গেল ইহাই তাহার মত। দেশে 'আর্যভাব' ক্রমশই হ্রাস পাইতেছে, সে কালের সে শুভদিন ভারতে ফিরিবার আর উপায় থাকিতেছে না, এই বলিয়া ভবতোষ প্রায়ই আক্ষেপ করিত। আত্মীয়-স্বজনের তাড়নায় তাহাকে বাধ্য হইয়া ইংরাজি পড়িতে হয়, নহিলে তাহার ইচ্ছা নবদ্বীপ বা ভট্টপল্লীতে গিয়া কোনও টোলে প্রবেশ করে। যাহা হউক, ইংরিজি পড়া সত্ত্বেও ভবতোষ যেরূপ নিজের আচার ব্যবহার ও চিন্তাপ্রণালী অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে, আজিকালিকার দিনে সেরূপ দেখা যায় না।

ভবতোষ কলিকাতায় মেসের বাসায় থাকিয়া লেখাপড়া করিতেছিল, হঠাৎ একদিন পূজার ছুটি হইল। ভবতোষ বাড়ির জন্য নূতন বস্ত্রাদি খরিদ করিয়া, বাক্স পুঁটুলি বাঁধিয়া গৃহযাত্রা করিল। তাহাদের গ্রামটি কলিকাতা হইতে অধিক দূরে নহে।

পূজা হইয়া গেল, পূর্ণিমা আসিল। সেদিন ভোরে ভবতোষের বিধবা মাতা গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছিলেন। গঙ্গার ঘাট গ্রাম হইতে কিঞ্চিৎ দূরে। ঘাটে বহুসংখ্যক পুরস্ত্রীর সমাগম হইয়াছে। স্নানান্তে ঘাটে উঠিয়াছেন, এমন সময় ভবতোষের মাতা দেখিলেন, তাঁহার একটি বাল্যসখী, উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী।

"কী দিদি, ভাল আছ ত ?" বলিয়া উপেন্দ্রবাবুর স্ত্রী ভবতোষের মাতার কাছে

আসিলেন। দুই সখীতে কুশল প্রশ্নাদির পর, উপেন্দ্রবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "ভবতোষ বাড়ি এসেছে ?"

"এসেছে। তার ছুটিও ফুরিয়ে এল, আবার কলকাতায় আসবে গিয়ে।"

উপেন্দ্রবাবুর একটি সুন্দরী ত্রয়োদশবর্ষীয়া কন্যা আছে, তাহার নাম পুলিনা। মেয়েটি অবিবাহিতা। উপেন্দ্রবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "দেখ দিদি, আমার পুলিনার সঙ্গে তোমার ভবতোষের যদি বিয়ে দাও, তা হলে বেশ হয়।"

ভবতোষের মা বলিলেন, "আমারও তাই ত অনেক দিন থেকে ইচ্ছে বোন, ছেলে যে বিয়ে করতে চায় না, কি করি। কত সম্বন্ধ এসে ফিরে ফিরে গেল।"

"আচ্ছা, একবার বলে দেখ না। তোমার বড় ছেলেটি, একটি বউ আসবে, তোমার কত আহ্লাদ হবে, কেন বিয়ে করে না ?"

ভবতোষের মা বলিলেন, আচ্ছা বলিয়া দেখিবেন। ছেলে যদি রাজি হয়, তাহা হইলে এমন কি এই অগ্রহায়ণ মাসেই বিবাহ হইতে পারে।

মা যখন গৃহে ফিরিলেন, ভবতোষ তখন বৈঠকখানায় বসিয়া, 'বঙ্গবাসী'র উপহার পরাশর-সংহিতার একখানি তর্জমা মন দিয়া পাঠ করিতেছিল : মা আসিযা বলিলেন, "বাবা, বাড়ির ভিতর এস, একটা কথা আছে।"

ভবতোষ বহি রাখিয়া ধীরে ধীরে মাতার অনুগমন করিল।

নিজের কক্ষে লইয়া গিয়া মা পুত্রকে বলিলেন, "বাবা, এইবার একটা বিয়ে থাওযা করে ফেল। তুমি আমার বড় ছেলে, বউয়ের মুখ দেখব আমার কতদিনেব সাধ. সে সাধ পূর্ণ কর।"

বলিযাছি, পূর্বে ভবতোষ বিবাহ করিতে অত্যন্ত অসম্মত ছিল। পাঠদ্দশায় বিবাহ করা উচিত নয়, কিম্বা উপার্জনক্ষম না হইলে বিবাহ করা উচিত নয়, এরূপ কোনও 'বিলাতী আপত্তি' ভবতোষের ছিল না। তাহার আপত্তিটা অন্যরূপ এবং শাস্ত্রসঙ্গতও বটে। সে শুনিয়াছে (এবং সংবাদপত্রেও পাঠ করিয়াছে) যে আজিকালিকার নব্যস্ত্রীরা ৺.ব যথার্থ হিন্দু গৃহলক্ষ্মী-স্বরূপ আবির্ভূতা হন না। তাঁহারা অত্যন্ত বিলাসিনী ও "বাবু" হইয়া পড়িয়াছেন। শাস্ত্রীয় বীতি অনুসারে স্বামীদিগকে ভক্তিটক্তি আব করেন না, ‘রন্তু স্বামীর সহিত সখ্য ব্যবহার করিতে উদ্যত। আরও নানা প্রকার অভিযোগ সে শুনিয়াছে।

কিন্তু বিধবা মাতার একান্ত অনুরোধ—বেচারি কি করে ? মাতৃ-আজ্ঞা অবহেলা করিবার পাপও সে সঞ্চয় করিতে ইচ্ছা করে না। সুতরাং অল্পদিন হইতে স্থির করিয়াছে, মা এবার অনুরোধ করিলেই বিবাহ কবিবে কিন্তু সে নিজের আদর্শানুযায়ী একটি মেয়ে বিবাহ করিবে।

এখন, এ সম্বন্ধে ভবতোষের স্বাধীন।চিন্তা-প্রসূত অনেকগুলি মতাদি ছিল, তাহা তাহার বাসার সহপাঠীরা সকলেই বিলক্ষণ অবগত আছে। রাত্রে আহারের পর ছাদের উপব যখন বাসার ছেলেদের একটি দণ্ডায়মানসভা সমবেত হইত, যখন অনেকগুলি সিগারেটাগ্র যুগপৎ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত, তখন অনেক সময় এই বিষয়ের আলোচনা হইত। তর্কস্থলে ভবতোষ কতবার বলিয়াছে, "যদি আমি কখনও বিয়ে করি, যদি করি, তবে একটি কালো কুৎসিত মেয়ে বিয়ে করব।"

কাবণ সুন্দব মেযে প্রাযই দেমাকে হয। শ্বশুব শাশুড়ীকে ভক্তি শ্রদ্ধা কবে না, স্বামীকে গুরুজ্ঞান কবে না, সহধর্মিণী না হযে সহবিলাসিনী হযে ওঠে। তা ছাড়া, তাবা অত্যন্ত বাবু হয। একটু রূপ আছে বলে সে রূপকে ভাল কবে সাজিযে প্রকাশ করবাব জন্যে ব্যতিব্যস্ত হযে থাকে। সাবান চাই, সুগন্ধি চাই, পাউডাব চাই, ভাল ভাল শাড়ি চাই, সেমিজ চাই—স্বামী বেচাবীব প্রাণও ওষ্ঠাগত। দ্বিতীযত, লেখাপড়া জানা মেযেও বিযে কবব না। তাবা খালি নভেল পড়ে (কেউ কেউ নভেলও লেখে) আব তাস খেলে, স্বামীকে কবিতা কষে চিঠি লিখতেই দিন যায, গৃহকার্য হয না, ব্রত নিযমাদিব ত সমযই নেই—ছেলে মাটিতে পড়ে কাঁদে।" ইত্যাদি।

এইরূপ ওজস্বিনী বক্তৃতা শুনিযা ছেলেবা কেহ কেহ বলিত, "আচ্ছা ভবতোষবাবু কার্যকালে কি কবেন দেখা যাবে। ও বকম বলে অনেকে। বলায কবায ঢেব তফাত।"

এই সন্দেহবাদে ভবতোষ আগুন হইয্য বলিত, "আচ্ছা দেখবেন মশায, দেখে নেবেন। আমাব যে কথা সেই কাজ।"

মা যখন বাববাব অনুবোধ কবিতে লাগিলেন তখন ভবতোষ সম্মত হইল। বলিল, "আচ্ছা মা আমি বিযে কবব, কিন্তু নিজে দেখেশুনে বিযে কবতে চাই।"

শুনিযা মা অত্যন্ত খুশি হইলেন। বলিলেন, 'দেখেশুনে বিযে কবতে চাও ? তা বেশ ত। একটি খাসা সুন্দব মেযে আছে, তেবো বছবেব।

ভবতোষ শুনিযা চমকিযা বলিল, খুব সুন্দব নাকি ?'

মা সোৎসাহে বলিলেন "খুব সুন্দব। মুখখানি যেন একবাবে প্রতিমেব মত। যেমন নাক, তেমনি চোখ তেমনি কপালেব ভুরু। বঙটি যেন একবাবে গোলাপফুলেব মত।'

ভবতোষ ধীবে ধীবে গম্ভীবস্ববে বলিল, ' সে ত আমি বিযে কবব না মা।'

মা শুনিযা আশ্চয হইলেন। বলিলেন 'কেন কী হযেছে ?'

'সুন্দব মেযে আমি বিযে কবব না।

"তবে কী বকম মেযে বিযে কর্বি ?

"আমি একটি কালো কুৎসিত মেযে বিযে কবব। ভবতোষেব স্বব বজ্রেব মত দৃঢ়।

মা শুনিযা অধিকতব আশ্চয হইযা গেলেন। বলিলেন "পাগল ছেলে। সকলেই সুন্দব মেযে বিযে কবতে চায। লোকে পায না।'

"সকলে করুক , আমি একটু অন্য বকম কবব।" বলিতে বলিতে ভবতোষেব মুখমণ্ডল আত্মগৌববে প্রদীপ্ত হইযা উঠিল। সে কী সকলেব মধ্যে একজন ? সে কী সকলেব মত বিলাসেব জন্য বিবাহ কবিতেছে ?

মাকে একটু দুঃখিত দেখিযা ভবতোষ সমস্ত কথা তাঁহাকে খুলিযা বলিল। সুন্দবী মেযে যে আদর্শ হিন্দু-গৃহলক্ষ্মী কেন হইতে পাবে না, তাহা তাঁহাকে ভাল কবিযা বুঝাইযা দিল। শেষে বলিল, তাহাব প্রতিজ্ঞা স্থিব-অটল-অচল।

সেদিন আব জননী অধিক পীড়াপীড়ি কবিলেন না। ভবতোষেবও ছুটি

ফুবাইল, সে কলিকাতা যাত্রা কবিল।

দ্বিতীয় পবিচ্ছেদ

উপর্বিউক্ত ঘটনাব কযেক দিন পবে, একদিন পাল্কি কবিযা উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যাযেব স্ত্রী ভবতোষেব মাতাব সহিত সাক্ষাৎ কবিতে আসিলেন।

প্রথম অভ্যর্থনাব কুশলপ্রশ্নাদিব পব উপেনবাবুব স্ত্রী জিজ্ঞাসা কবিলেন 'দিদি, ভবতোষ বাজি হল ?"

ভবতোষেব মাতা বলিলেন, "বিযে কবতে ত বাজি হযেছে—কিন্তু তাব আবাব এক আজগুবি মত।'

"কী বকম ?"

"প্রথমে বলল আমি দেখেশুনে বিযে কবব। আমি বললাম তা বেশ ত, একটি খাসা সুন্দবী মেযে আছে দেখে এস সে বলে আমি সুন্দবী মেযে বিযে কবব না একটি কালো কুৎসিত মেযে বিযে কবতে চাই।

উপেন্দ্রবাবুব স্ত্রী শুনিযা বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, এমন অনাসৃষ্টি আবদাবও ত কখন শুনিনি। এ বকম আবদাব কেন তা কিছু বলল ?"

ভবতোষেব মাতা তখন পুত্রেব নিকট যেমন শুনিযাছিলেন সেইরূপ বলিলেন। উপেন্দ্রবাবুব স্ত্রী বসিযা ভাবিতে লাগিলেন।

কিযৎক্ষণ পবে বলিলেন দেখ তুমি এক কাজ কব দিকিন দিদি। ভবতোষকে এই শনিবাবে আসতে লেখ। লেখ যে তোমাব যে বকম মেযে বিযে কবা মত সেই বকম মেযে একটি স্থিব কবেছি তাকে দেখবে এস। তাবপব এলে ববিবাব দিন বিকেলে আমাব ওখানে পাঠিযে দিও। আমি সব ঠিক কবে নেব।

ভবতোষেব মাতা সম্মত হইলেন। ভাবিলেন হযত উপেন্দ্রবাবুব স্ত্রী মনে কবিযাছেন ভবতোষ পুলিনাকে দেখিলে আব বিবাহে অসম্মত হইতে পাবিবে না বাস্তবিক তাহা আশ্চর্য নয কাবণ মেযেটি খুবই সুন্দবী বটে।

তৃতীয় পবিচ্ছেদ

ভবতোষ শনিবাব বাডী আসিল। পবদিন বৈকালে একখানি ঘোডাব গাডি কবিযা চুল উস্কোখুস্কো কবিযা (কাবণ সেকালে মুনি ঋষিবা চুল আঁচডাইতেন না) গ্রামান্তবে উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যাযেব বাটীতে গিযা উপস্থিত হইল।

গিযা শুনিল সেদিন উপেন্দ্রবাবু বাডি নাই কায উপলক্ষে স্থানান্তবে গিযাছেন। একটি যুবক মহা সমাদবে তাহাকে নামাইযা লইল এবং বৈঠকখানায বসাইল। যুবকটি উপেন্দ্রবাবুবই ভ্রাতুষ্পুত্র।

কিযৎক্ষণ পবে ঝি আসিযা সংবাদ দিল, অন্দবে যাইতে হইবে। ঝি ভবতোষেব মুখেব পানে চাহিযা একটু ফিক কবিযা হাসিযা গেল।

যুবকটিব সঙ্গে ভবতোষ অন্তঃপুবে প্রবেশ কবিল। তাহাব মনে হইল, চাকব-বাকব সকলেই যেন হাসি লুকাইবাব চেষ্টা কবিতেছে।

ভবতোষ একটি কক্ষে নীত হইল। কক্ষটি উত্তমরূপে সাজানো। মধ্যস্থলে একখানি আসন পাতা রহিয়াছে। আসনের সম্মুখে রেকাবীতে ফল ও মিষ্টান্ন সজ্জিত। অল্প দূরে আর একখানি আসন পাতা রহিয়াছে।

অনুরোধক্রমে ভবতোষ মিষ্টান্নের থালার সম্মুখে বসিল। এমন সময়ে বাহিরে মলের ঝুম্ ঝুম্ শব্দ উঠিল। ঝি মেয়েটিকে লইয়া প্রবেশ করিল। মেয়েটি অপর আসনখানিতে বসিয়া, ঘরের চতুর্দিকে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

লজ্জায় ভবতোষের মস্তক অবনত। একটু একটু করিয়া ফল খাইতেছে এবং আড়চোখে আড়চোখে মেয়েটির পানে চাহিতেছে। মেয়েটির পরিধানে বেগুনে রঙের বোম্বাই শাড়ি। মাথাটি খোলা। চুলগুলি তেলে যেন চব্‌চব করিতেছে।

মেয়েটির রঙটি মসীনিন্দিত। চক্ষু দুইটি ছোট ছোট, কোটরান্তর্গত। সে দুটি আবার অবিশ্রান্ত ঘুরিতেছে। কপালটি উচ্চ। নাকটি চেপ্টা। চিবুক নাই বলিলেই হয়। সম্মুখের দাঁতগুলি কিঞ্চিৎ দেখা যাইতেছে।

ভবতোষের মনে হইল, রূপ সম্বন্ধে মেয়েটি তাহাব আদর্শের অনুযায়ী বটে। একটু গলা ঝাড়িয়া, সাহস সংগ্রহ কবিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাব নাম কি ?"

মেয়েটি হঠাৎ ভবতোষের পানে চাহিয়া, কিঞ্চিৎ জিহ্বা বাহির করিযা বলিল, "অ্যাঁ ?"

"তোমাব নাম কি ?"

"আমাব নাম জগদম্বা।"

এমন সময় যুবকটি ও সেই ঝি তাহার পানে সরোষ কটাক্ষপাত করিল। মেয়েটি তৎক্ষণাৎ বলিল, "জগদম্বা নয়. আমার নাম পুলিনা।

যুবকটি বলিল, "আগে ওর নাম ছিল জগদম্বা. এখন বদলে পুলিনা বাখা হয়েছে।"

ভবতোষ ভাবিল, পরিবর্তনটা ভাল হয় নাই। পুলিনা। গা জ্বলিয়া যায। তাহাব অপেক্ষা জগদম্বা ঢেব ভাল। পৌরাণিক নাম, ঠাকুব দেবতার নাম। বিবাহ করিয়া সে জগদম্বা নামই বহাল বাখিবে।

ভবতোষ জিজ্ঞাসা করিল. "তুমি কি পড ?"

বালিকা পূর্ববৎ জিহ্বা দেখাইয়া বলিল, "অ্যাঁ ?"

"তুমি কি পড ?"

"কিছু পড়িনে। আমার দাদা পাঠশালে—"

ঝি ও সেই যুবক তাহার প্রতি পুনবায সরোষ কটাক্ষপাত করায় বালিকা থামিয়া গেল।

শুনিয়া ভবতোষ আরও আশ্বস্ত হইল। এই ঠিক হইয়াছে। ইহাকেই যথার্থ হিন্দুগৃহিণী করিয়া তোলা সম্ভবপর হইবে। দেখিতে একটু—তাহা হউক। সেই ত তাহার প্রতিজ্ঞা। বিবাহের সময় বাসার ছেলেদের নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে হইবে।

ভবতোষ বলিল, "আচ্ছা তুমি যেতে পার।"

মেয়েটি জিহ্বাগ্রভাগ বিকশিত করিয়া পূর্ববৎ বলিল, "আঁ ?"

"যেতে পার।"

ঝি তখন তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল।

ভবতোষের জলযোগ ক্রমে শেষ হইল। এই সময় একটি ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা, রূপার ডিবায় ভরিয়া পান লইয়া আসিল। মেয়েটি দেখিতে অত্যন্ত সুন্দরী, একখানা দেশী কালাপেড়ে শাড়ি পরিয়া আসিয়াছে। পায়ে চারিগাছি মল। হাতে গিনি সোনার টুকটুকে দুইগাছি বালা। ভ্রূযুগলের মাঝখানে খয়েরের টিপ।

পান রাখিয়া মেয়েটি চলিয়া গেল। যাইবার সময় অন্যদিকে চাহিয়া একটু মুচকি হাসিয়া গেল।

ভবতোষ মনে মনে ভাবিল, দেখ, এই একটি সুন্দরী মেয়ে। ধর, যদি ইহার সঙ্গেই আমার বিবাহ হইত, তাহা হইলে কি আর রক্ষা ছিল ? আমার সকল আদর্শ, সকল সঙ্কল্প অতল জলে ডুবিয়া যাইত। বিলাস-বিভ্রমে মজিয়া হয়ত, আমি যে আমি, আমার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যাইত। না না, আমি সুখের জন্য, আমোদের জন্য, প্রণয়ের জন্য বিবাহ করিতেছি না, আমি ধর্মের জন্য, সংযমের জন্য আদর্শ হিন্দুগার্হস্থ জীবন যাপন করিবার জন্য বিবাহ করিতেছি। প্রতিজ্ঞা পূরণ জনিত আত্মগৌরব ভবতোষের মনে উছলিয়া উঠিতে লাগিল।

যুবকটির সঙ্গে ভবতোষ বাহিরে আসিল।

ঝি আসিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল "বাড়ির মেয়েরা জিজ্ঞাসা করছেন, মেয়ে পছন্দ হয়েছে ?'

ভবতোষ সগর্বে বলিল, 'হয়েছে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গাড়িতে আসিতে আসিতে ভবতোষ মনে মনে অপরাহ্ণের ঘটনাগুলি আলোচনা করিতে লাগিল। গ্রামের পথ দিয়া আসিতেছে। কত যুবতী মেয়ে কলসিতে জল ভরিয়া বাড়ি ফিরিতেছে। সে সকল মেয়ের মুখগুলি ভবতোষ একটু মনোযোগের সহিতই দেখিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে সুন্দর মেয়ে আছে, কালো মেয়েও অনেক আছে—কিন্তু জগদম্বার মত অত কুৎসিত একটি মুখও দেখিতে পাইল না।

গাড়ি ক্রমে মাঠের মধ্যে আসিয়া পড়িল। তখনও তাহার মন আত্মজয়ের উৎসাহে ভরপুর। তথাপি মনে মনে ভাবিতে লাগিল সে কালো মেয়ে বিবাহ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল বটে কিন্তু একেবারে এত কুৎসিত না হইলেও ক্ষতি ছিল না। যাহা হউক, পছন্দ হইয়াছে যখন বলিয়া আসিয়াছে, তখন সে আলোচনায় ফল কী ?

এই অবস্থায় ভবতোষ বাড়ি পৌঁছিল। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী বাবা, মেয়ে পছন্দ হল ?"

"হ্যাঁ, পছন্দ হয়েছে।"

"তবে সব ঠিক করি ?"

"কর।"

"এই অগ্রহায়ণ মাসেই হোক তাহলে ?"

"আচ্ছা।" বলিয়া ভবতোষ অন্যত্র চলিয়া গেল।

মা দেখিলেন, ছেলের মন যেন ভার। ভাবিলেন, সুন্দর মেয়ে বিবাহ করিব না বলিয়া অনেক লম্ফ ঝম্ফ করিয়াছিল, এখন রাজি হইয়াছে, তাই বোধ হয় ছেলের লজ্জা হইয়াছে।

ভবতোষ রাত্রে কিছু আহার করিল না। বলিল, উহাদের বাড়ি অনেক খাইয়া আসিয়াছে, ক্ষুধা নাই। তখন তাহার মন হইতে আত্মজয় ও প্রতিজ্ঞা-পূরণ-জনিত উৎসাহ অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে।

রাত্রে শয়ন করিয়া জগদম্বার মুখখানি যতই সে ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার বুকের ভিতরটা যেন হিম হইয়া উঠিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, যদি অত কুৎসিত না হইয়া শ্যামবর্ণের উপব মুখচোখগুলা একটু মানানসই হইত তাহা হইলে মন্দ হইত না।

সোমবারে উঠিয়া ভোরের ট্রেনে ভবতোষ কলিকাতা যাত্রা করিল। মা বলিয়া দিলেন, বিবাহের আর দশদিন মাত্র বাকী আছে ; দুই দিন পূর্বে ভবতোষ যেন বাড়ি আসে।

বাসায় পৌঁছিলে সহপাঠীরা দেখিল, ভবতোষের মুখখানি যেন মেঘের মত অন্ধকার। ভবতোষ গিয়া নিজ কক্ষ মধ্যে উপবেশন করিল।

"কি ভবতোষবাবু, খবব কী ?" বলিতে বলিতে রজনীবাবু, শরৎবাবু, রাখালবাবু, সতীশবাবু, কুমুদবাবু, নৃপেনবাবু প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভবতোষ বাড়ি যাইবাব সময় ইঁহাদের সকল কথাই বলিয়া গিয়াছিল।

"খবর কী ভবতোষবাবু ?"

ভবতোষ একটু কাষ্ঠহাসি হাসিযা বলিল, "খবব ভাল।"

তাহার পর সকলে প্রশ্ন করিয়া মেয়েটির রূপ, গুণ, বয়স প্রভৃতির সমস্ত খবর জানিয়া লইল। শরৎবাবু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়েটির নাম কী ?"

ভবতোষ নাম বলিল।

তাহা শুনিয়া সকলেরই মুখে একটু একটু হাসি দেখা দিল। কেবল নৃপেনবাবু আত্মসংযম হারাইয়া উচ্চস্বরে হাসিয়া ফেলিলেন, হা-হা-হা-জগদম্বা-হি-হি-হি-বেশ নামটি ত।"

শরৎবাবু বলিলেন, "নৃপেনবাবু, এটা এমনই কী হাসির কথা ? হাসছেন কেন ?"

নৃপেনবাবু বলিলেন, "না, হাসিনি। হি-হি-হি হাসব কেন ? হা-হা !"

রজনীবাবু বলিলেন, "না, নামটি মন্দ কী ? পৌরাণিক নাম। তোমাদের আজকালকার জ্যোৎস্নাময়ী, সরসীবালা, তড়িল্লতা, মণিমালিনী—এই সব নাটুকে নামই বুঝি ভাল ?"

ভবতোষ ইহা শুনিয়া গম্ভীরভাবে মাথাটি নাড়িতে লাগিল। এ সকল বিষয়ে

তাহার পূর্ব উত্তেজনা আজি যেন আর নাই।

বিবাহের আর নয়দিন বাকী আছে। এই নয়দিন যে ভবতোষের কী অবস্থায় কাটিল, তাহা সেই জানে। বাসার লোকেও কিছু কিছু জানিতে পারিয়াছিল। জগদম্বাকে ভবতোষ যতই মনের মধ্যে ভাবে, ততই তাহার বুকের ভিতরটা অন্ধকারে ভরিয়া যায়। ভবতোষ কলেজে যায়, কিন্তু লেক্‌চার কিছুই শুনিতে পায় না। ক্ষুধার জন্য বাসায় সে বিখ্যাত ছিল, এখন তাহার পাতের অন্নব্যঞ্জন অর্ধেকের বেশি পড়িয়া থাকে। ভবতোষ কাহারও সঙ্গে হাস্যালাপ করে না, সদাই অন্যমনস্ক থাকে। বাসার লোক তাহাকে বলিতে লাগিল, "ভবতোষবাবু, প্রেম-ব্যাধির সমস্ত লক্ষণগুলিই ক্রমে আপনার মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে।"

রাত্রে বিছানায় শুইয়া ভবতোষ আর সহজে নিদ্রা যায় না। কেবল এ-পাশ ও-পাশ করে। অতিকষ্টে যখন নিদ্রা আসে, তখন কেবল বিভীষিকাপূর্ণ স্বপ্ন দেখে। একদিন স্বপ্ন দেখিল, জগদম্বা যেন কালীমূর্তি ধারণ করিয়াছে। তাহার অল্প পরিমাণ রসনা ভবতোষ যাহা দেখিয়াছিল, তাহা যেন অর্ধেক বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাহার যেন দুইটা নূতন হস্ত উৎপন্ন হইয়াছে। তাহার এক হাতে যেন রক্তমাখা খড়্গ, অপরটাতে যেন ছিন্ন মুণ্ড দুলিতেছে। মুণ্ডটা যেন ভবতোষের মত দেখিতে। আর একদিন স্বপ্ন দেখিল, ভবতোষ যেন একটা কণ্টকময় জঙ্গলে পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে। আকুল হইয়া পথ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, এমন সময় একটা মহিষ যেন তাহাকে তাড়া করিয়া আসিল। মহিষের পরিধানে যেন একখানি বেগুনি রঙের বোম্বাই শাড়ি; তাহার মুণ্ডের স্থানে যেন জগদম্বার মুখ, কেবল তাহাতে দুইটা শৃঙ্গ বাহির হইয়াছে।

যখন বিবাহের আর তিন দিন মাত্র বাকী আছে, তখন ভবতোষ ভাবিল, মাকে একখানি পত্র লিখিয়া এ বিবাহ বন্ধ করিয়া ফেলিবে। সেদিন অসুস্থতার ভান করিয়া সে কলেজে গেল না। সমস্ত দিন একাকী ঘরে বসিয়া মাকে একে একে অনেকগুলি চিঠি লিখিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। বাসার লোকেরা যখন শুনিবে যে বিবাহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তখন তাহারা কী বলিবে? তাহাদের উপহাস, বিদ্রূপ সে কেমন করিয়া সহ্য করিবে?

সেদিন রাত্রে শুইয়া ভাবিতে লাগিল কাহাকেও কিছু না বলিয়া সে পশ্চিম পলাইয়া যাইবে। উঠিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া টাইমটেবল উল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। কিন্তু প্রভাতে আবার তাহার মতের পরিবর্তন ঘটিল। ছি ছি, শেষে কী এত কাণ্ড কারখানার পর সে ভীরু নাম গ্রহণ করিবে? তাহা হইবে না, প্রতিজ্ঞা সে পূরণ করিবেই, তাহার পর তাহার অদৃষ্টে যাহাই থাকুক।

যথাদিনে সে বাড়ি গেল। যথাসময়ে সে বিবাহমণ্ডপেও উপস্থিত হইল। সেখানকার লোকসমাগম, আলোক ও কোলাহলে, আজ দশদিন পরে তাহার চিত্ত অনেকটা স্থির হইল। যুদ্ধকাল সমাগত হইলে ভীরুতম সৈন্যও ভয় ভুলিয়া যায়।

বিবাহ আরম্ভ হইল। তখন ভবতোষের চিত্ত নির্বিকার। তখন তাহার মনে ভয় বা হর্ষ বা নৈরাশ্য কিছুই নাই।

ক্রমে স্ত্রী-আচারের সময় আসিল। শুভদৃষ্টির জন্য বর ও কন্যার মস্তকের উপর বস্ত্রাবরণ পড়িল। কন্যার পানে চাহিয়া দেখিয়া ভবতোষ আশ্চর্য হইয়া গেল। ইহা, তাহার দশদিনকার বিভীষিকা, নিদ্রার দুঃস্বপ্ন—জগদম্বা নহে। এ সেই চমৎকার সুন্দরী মেয়েটি যে রূপার ডিবায় পান রাখিয়া গিয়াছিল।

ফুলশয্যার রাত্রে যখন ভবতোষ তাহার নববধূকে কথা কহাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইল, তখন একটা বুদ্ধি করিল। সে শুনিয়াছিল, যে নববধূ কিছুতেই কথা কহে না, সেও আপনার আত্মীয়স্বজনের অপবাদ শুনিলে তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করিয়া থাকে। তাই ভবতোষ বলিল, "তোমার মা আমার সঙ্গে এ চাতুরি করলেন কেন ?"

পুলিনা তখন বলিল, "আমি সুন্দর বলে. তুমি নাকি আমায় বিয়ে করতে চাওনি ? কেমন জব্দ !"

ভবতোষ এ পর্যন্ত এ প্রহেলিকার মীমাংসা করিতে পারে নাই। তাই জিজ্ঞাসা করিল, "যাকে দেখেছিলাম, সে মেয়েটি কে ?"

"সে, পাড়ার কলুদের মেয়ে। কেমন জব্দ।"

ক্রমে এমন দিনও আসিল, যখন ভবতোষ ডাক আসিবার পূর্বে বাসার দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিয়া পিয়নের সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাগিল।

[ভাদ্র, ১৩১১]

পত্নী হারা

চুচুড়ায় গঙ্গাতীরে একটি সুন্দর ত্রিতল অট্টালিকা। তাহার একটি সুসজ্জিত কক্ষে সেই গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সপ্তদশবর্ষীয়া যুবতী শ্রীমতী সুনীতিবালা বসিয়া কবিতা পাঠ করিতেছেন। তাঁহার মুখখানি অতি সুন্দর চোখে এখনও বালিকাসুলভ চপলতা পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিতেছে। স্নান সমাপ্ত হইয়াছে চুল এখনও ভাল শুকায় নাই, তাই সেইগুলি খোলা অবস্থায় পিঠের কাপড়ের উপর পড়িয়া আছে। জানালা দিয়া গঙ্গার বায়ু আসিয়া সেগুলি শুকাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে।

বেলা ক্রমে বাড়িয়া উঠিল, নয়টা বাজিয়া গেল। কাব্য আর সেই সুন্দরী পাঠিকার মন তেমন বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। বাহির হইতে পদশব্দের আভাসমাত্র কানে আসিলেই তিনি চমকিত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। গঙ্গার ঘাটে বিস্তর স্নানার্থীর সমাগম হইয়াছে সুনীতি মাঝে মাঝে গবাক্ষপথে তাহাদের প্রতিও দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

তাঁহার এই মানসিক চঞ্চলতা শীঘ্রই বিদূরিত হইল। একখানি দৈনিক সংবাদপত্র হাতে করিয়া সহাস্যমুখে সুনীতির স্বামী প্রবেশ করিলেন।

সুনীতির স্বামীটি সম্পূর্ণভাবে সুনীতির উপযুক্ত। বিধাতা যোগ্যকে যোগ্যের সহিতই যোজনা করিয়াছেন, —ইহার অপেক্ষা সুবোধচন্দ্রের আর বেশি বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন।

কবিতাপুস্তকখানি পার্শ্বস্থ টেবিলের উপর ফেলিয়া সুনীতি জিজ্ঞাসা করিল, "অত হাসি কেন?"

সুবোধ হাসিযা বলিল, "সহ্য হয না নাকি ?"

"না।"

"কেন ?"

"তুমি বাইবে থেকে হাসতে হাসতে এসেছ। তা ত হবে না। আমাব কাছে এসে আমাকে দেখে তবে তুমি হাসবে।"

"তুমি কি শুধু ঘবে আছ ? তুমি কি বাইবে নেই ?"

সুনীতি হাসিযা বলিল, "আচ্ছা, পবাজয স্বীকাব কবলাম। 'বাজন ! তোমাবি আমি অন্তবে বাহিবে।' এখন ব্যাপাবখানা কি, বল দেখি শুনি ?"

"দেখবে আবাব শুনবে ?"

"চালাকি বাখ। কাগজে তোমাব বযেব সুখ্যাতি বেবিযেছে নাকি ?"

"আমাব বউযেব ?"

"কি জ্বালা ! তোমাব কেতাবেব গো মশাই কেতাবেব তোমাব ফুলহাবেব সুখ্যাতি কবে কাগজে কেউ সমালোচনা কবেছে বুঝি ?"

'যদি বলি তাই।'

"তবে আমি বাগ কবব '

'অপবাধ ?'

সুনীতি হাসিযা বলিল, আচ্ছা, পবাজয স্বীকাব কবলাম। বাজন ! তোমাবি স্পর্শ কববে কেন ?

সুবোধ হাসিযা বলিল, 'তবে তা নয "

"তবে কি ?'

'আন্দাজ কব

সুনীতি তাহাব সেই হাসিমাখা চক্ষু দুইটি উল্টাইযা দুই তিন বাব ঢোক গিলিযা শেষকালে বলিল, "বুঝেছি।'

"কী বল দেখি ?'

দুষ্টামিব হাসি হাসিযা সুনীতি বলিল 'বলব কেন ?"

সুবোধ বলিল, "না তোমায বলতেই হবে '

সুনীতি চক্ষু ঘুবাইযা বলিল, 'ইস ! হুকুম নাকি ?

"নযত কি ?"

"বটে ! জান না 'আমি বানী, তুমি মোব প্রজা'।'

"তবে তোমাব সখীদেব ডাক। আমায ফুলপাশে বেঁধে ফেলুক। দুটো গান শুনে নিই।" বলিযা সুবোধ সুব কবিযা আবম্ভ কবিল, "যদি আসে তবে কেন যে-এ-এ-তে চায।"

সুনীতি বাগ কবিযা বলিল, "বঙ্গ বাখ। কী হযেছে বল।"

"তুমি কী আন্দাজ কবেছ সেইটে আগে বল।"

'সে আমি বলব না। তুমি বল চাই নাই বল।"

সুবোধ বলিল, "না, সে আমি শুনব না। তোমায বলতেই হবে।"

সুনীতি মুখখানি গম্ভীব কবিযা বলিল, "নাঃ—যদি না মেলে, তবে তুমি ভাবি হাসবে।"

"হাসলামই বা ?"

"আমি যে ভারি অপ্রতিভ হয়ে যাব।"

"হলেই বা ?"

"আমার চোখ যে ছল্‌ছল্‌ করবে।"

"তোমার চোখে একটি ওষুধ দিয়ে সে ছল্‌ছল্‌ ভাব ভাল করে দেব।"

এই বলিয়া সুবোধ স্নেহভরে প্রিয়তমার চক্ষু দুটিতে দুটি চুম্বন মুদ্রিত কবিল।

সুনীতি বলিল, "একি, রোগ না হতেই ওষুধ !"

সুবোধ হাসিয়া উত্তর করিল, "Prevention is better than cure", সুনীতি অল্প ইংরাজি জানিত।

সুনীতি বলিল, "ধন্যবাদ, ডাক্তার মশাই।"

"শুধু ধন্যবাদে ডাক্তার সন্তুষ্ট হয় না, ভিজিট চাই"—বলিয়া ডাক্তার মহাশয় রোগিণীর ওষ্ঠাধর হইতে ভিজিট আদায় করিয়া লইলেন।

তখন সুবোধ সুনীতির স্কন্ধে হস্তযুগল অর্পণ করিয়া বলিল, "আন্দাজটা তুমি কি করেছ বল সত্যি। আমার ভারী কৌতূহল হচ্চে।"

সুনীতি বলিল, "বিলক্ষণ, নিজের কথা যা বলবার আছে তা বলবেন না, আমায় খালি খালি জেবা করবেন। ভারী মজার লোক ত ! তুমি বল আব না বল, আমি সে কথা বলছিনে।"

সুবোধের কৌতূহল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিতে সুনীতি সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইল। শেষে সুবোধ বলিল. "আচ্ছা, আমিই আগে বলি ; কিন্তু তুমি বলবে বল ?"

"বলব।"

"আমাব শুনে শুনে যদি বল যে আমিও তাই মনে করেছিলাম !"

"আচ্ছা, আমি কাগজে লিখে বাখি। বলা হলে তুমি খুলে দেখো।"

সুনীতি হাসিতে হাসিতে একখানি কাগজে কয়েকটি কথা লিখিল। লিখিয়া বলিল. "বল এইবাব।"

সুবোধ বলিল "আজ সন্ধ্যেবেলা বহুকাল পরে আবার স্টারে চন্দ্রশেখর। অনেকদিন থেকে তোমার চন্দ্রশেখর অ[illegible] নয় দেখবার সাধ, আজ দুজনে যাই চল।"

শুনিয়া সুনীতি ভারী খুশি। লিখিত কাগজখানি হাতে লইয়া মাথা দুলাইয়া বলিল, "আচ্ছা, এতে কী লিখেছি এইবার তুমি আন্দাজ কব।"

"বাঃ সে কথা ত ছিল না।"

"নাই বা ছিল, তবু বল না।"

"আমি যদি আন্দাজ করি. তবে কী [illegible]দাজ করলাম সেটা ফের তোমায় আন্দাজ করে বলতে হবে কিন্তু।"

"বেশ, আমিও তোমায় আবার সেটা আন্দাজ করাব। তা হলে আন্দাজ করতে কবতে চিরটা জীবন কেটে যাক্‌ আর কী ! আচ্ছা, তুমি আমায যে রকম খুশি করেছ, তোমাকে আর কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। এই দেখ।"

সুবোধ কাগজ খুলিল। তাহাতে লেখা আছে, "হিজি বিজি কী লিখি ছাই আমি ত কিছুই আন্দাজ করিতে পারিতেছি না। তোমার মনে কৌতূহল সঞ্চার

করিবার চেষ্টা করিতেছি মাত্র।"

পড়িয়া সুবোধ হাসিয়া উঠিল। বলিল, "তুমি ভারি দুষ্টু।"

"কী সাজা দেব?"

"সাজা দেব? সাজা দিয়েছি। আসল কথা এখনও বলিনি। তোমাকে মেম সাজাব।"

"সে আবার কী কথা।"

সুবোধ বলিল, "না, সত্যি। অনেক দিন থেকে আমার সাধ, মেমের পোশাকে তোমাকে কেমন দেখায় দেখব। তোমার জন্য একটা পোশাক আনিয়ে রেখেছি। থিয়েটারে যাব, দুজনে আলাদা আলাদা বসে দেখলে কী সুখ হয়? বক্স রিজার্ভ করে দুজনে একত্র বসতে হবে। পোড়া বাঙ্গালীর পরিচ্ছদে ত সে হবার যো নেই—দুজনে সাহেব মেম সেজে যাই চল।"

সুনীতি বলিল "আ সর্বনাশ। সে আমি পারব না। হাজার লোকের সমুখে কী আমি বেরুতে পারি?'

"ছদ্মবেশে আর লজ্জা কী? যে তোমাকে দেখবে সে ত আর তোমাকে তুমি বলে চিনতে পারবে না। তোমাকে সকলে খাঁটি বিলিতি মেম মনে করবে, আমাকে বরং টাঁস ফিরিঙ্গির মত দেখাবে। সাহেবেরা হিংসেতে ফেটে মরবে আর ভাববে বিধাতা 'বানর গলে দিল মোতিম হার'।

সুনীতি বলিল, 'যাও যাও ভারি ঠাট্টা শিখেছ। তোমার আর পাগলামি করতে হবে না। সে সব হবে টবে না।'

অনেক মিনতি অনেক সাধাসাধি অনেক মান অভিমানের পর সুনীতি বলিল, 'আচ্ছা ঘরে পরে দেখি কেমন দেখায়, তার পরে বলব।"

আহারাদির পর সুবোধ দুইটা তোরঙ্গ শয়নকক্ষে আনাইয়া লইল। সে দুইটার ভিতর সুনীতি ও সুবোধের দুই সুট সাহেবী পরিচ্ছদ।

সুনীতি বলিল, "তুমি আগে সাহেব সাজ।"

সুবোধ বলিল "আমার সাহেবী বেশ তুমি কখনও দেখনি নাকি?"

সুনীতি বলিল, "না, তবু সাজ। দেখে আমার ভরসা হোক।"

সুবোধ সাহেব সাজিল। এইবার সুনীতির পালা। সুনীতি অনেক মেম দেখিয়াছিল বটে, এবং মেম শিক্ষয়িত্রীর কাছে কিছুদিন লেখাপড়াও শিখিয়াছিল, কিন্তু কোথায় কি পরিতে হয়, তাহা অত লক্ষ্য করে নাই। যাহা হউক তথাপি পাশের ঘরে গিয়া আন্দাজি এক রকম করিয়া পরিয়া আসিল। যা কিছু ভুলচুক ছিল, সুবোধও আন্দাজে সংশোধন করিয়া দিল।

সুনীতির সজ্জা সম্পূর্ণ হইলে, সুবোধ সসম্ভ্রমে তাহাকে বলিল, "গুড মর্নিং মেম সাহেব।"

সুনীতি হাসিয়া আকুল। সেও বলিল, "গুড মর্নিং সাহেব সাহেব।"

তাহার পর দুইজনে দর্পণের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। সোনার হলকরা ফ্রেমে আঁটা প্রশস্ত মুকুর ভিত্তিগাত্রে লম্বিত ছিল। তাহাতে সুনীতির প্রতিবিম্ব দেখিয়া সুবোধ হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। সুনীতিও হি হি করিয়া তাহার সহিত যোগ দিল। মানুষকে যেমন ভূতে পায়, আজ সকালে তেমনি এই দুইটা প্রাণীকে যেন

হাসিতে পাইয়াছে। সুনীতি হাসিয়া হাসিয়া বলিল, "এ বেশে আমি বাইরে যেতে পারব না, তুমি যাই বল। ঝি চাকরেরাই বা কী মনে করবে!"

সুবোধ বলিল, "এক কাজ করা যাবে। বাড়ি থেকে শাড়ি পরে বেরুবে। ট্রেনে পোশাক বদলে নিলেই হবে। একটা কামরা রিজার্ভ করে নেব এখন।"

সুনীতি বলিল, "সে পরামর্শ মন্দ নয়। কিন্তু আমার ভারি লজ্জা করচে। কাজ নেই আমার থিয়েটারে গিয়ে, যেমন আছি তেমনি থাকি।"

সুবোধ স্ত্রীর চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া বলিল, "আমার এত দিনের সাধ তুমি পূর্ণ করবে না?"

দুই ঘণ্টা পর হুগলি স্টেশনে আসিয়া সুনীতি ও সুবোধ রিজার্ভ করা সেকেণ্ড ক্লাস কক্ষে আরোহণ করিল। গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

সুবোধ গৃহ হইতেই সাহেবী পোশাক পরিয়া আসিয়াছিল। গাড়ি ছাড়িবামাত্র সুনীতিকে সে স্বহস্তে বিবি সাজাইয়া দিল। কেবল জুতার লেস্ সুনীতি নিজে বাঁধিল, সুবোধকে কিছুতেই বাঁধিয়া দিতে দিল না। সুনীতিব শাড়ি ও বাহুল্য অলঙ্কারাদি তোরঙ্গে বন্ধ করিয়া রাখিল।

সেখানা প্যাসেঞ্জার গাড়ি। প্রত্যেক স্টেশনে থামিয়া থামিয়া চলিতেছে। গাড়ি ছাড়িয়া দিলে সুনীতি স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া বাহিরের দৃশ্য অবলোকন করে, স্টেশনের নিকটবর্তী হইলেই পলাইয়া ও-কোণে গিয়া বসে, সুবোধ কিছুতেই তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। গাড়ির ছাদে যেখানে লণ্ঠনের গহ্বর সেখানে চারিপাশে চারিখানা আর্শির টুকরা আঁটা আছে, সেই আর্শিতে সুনীতি নিজের প্রতিবিম্ব দেখে আর সুবোধের পানে চাহিয়া ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসে। এক একবার বলে, "খুব সঙ সাজালে যা হোক্—মাগো—মাগো! এতও তোমার আসে!"

যখন হাওড়ায় আসিয়া গাড়ি থামিল, তখন ঠিক সন্ধ্যা হইয়াছে। আধ ঘণ্টাব মধ্যে থিয়েটার আরম্ভ হইবে।

সুবোধ সুনীতিব হাত ধরিয়া চলিল, একটা কুলি তোরঙ্গটা মাথায় লইয়া অগ্রসর হইল। সুবোধ সুনীতিব পানে চাহে আর হাসে। সুনীতির কপালে ঘর্ম; মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে। ছেলেবেলায় যা জুতা পায়ে দিয়াছিল, জুতা পায়ে দিয়া চলিতে পারিবে কেন? দুই পা তিন পা চলিয়াই হোঁচট্ খাইয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে।

সুবোধ গাড়ি ভাড়া কবিল। গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইতে হইবে?"

সুবোধ বলিল, "স্টার থিয়েটার, হাতিবাগান।"

সুনীতিকে গাড়িতে তুলিয়া দিয়া. সুবোধ বাহিরে দাঁড়াইয়াই তাহাকে বলিল, "তোরঙ্গটা সঙ্গে নিয়ে গিয়ে আর কী হবে, থিয়েটারের বাইরে গাড়িতে পড়ে থাকবে, যদি কেউ উঠিয়ে নিয়ে যায়, কিংবা গাড়োয়ানটাও নিয়ে চম্পট দিতে পারে, ভিতরে ঢের জিনিস রয়েছে, স্টেশন মাস্টারের জিম্মায় রেখে আসি।"

সুনীতি সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। সুবোধ কুলিটাকে লইয়া প্রস্থান করিল।

সুবোধকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া গাড়ায়ান হাঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাঁহা জানে হোগা হুজুর ?" সুবোধ মুখ ফিরাইয়া বলিল, "হাতিবাগান স্টার থিয়েটার।"

সুবোধ গিয়া স্টেশন মাস্টারের সন্ধান করিল, স্টেশন মাস্টার নাই। কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিতেই স্টেশন মাস্টার আসিল। সে বলিল, "প্যাসেঞ্জারগণের জিনিসপত্র আমি রাখি না, হেড্ পার্শেল ক্লার্কের কাছে যান, চারি আনা ফি লাগিবে, রসিদ পাইবেন।"

সুতরাং সুবোধ হেড পার্শেল্ ক্লার্কের সন্ধানে চলিল। অনেক কষ্টে তবে তাহাকে আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইল। তিনি একটি বাঙ্গালী বাবু—চক্ষু দেখিলে মনে হয় বিলক্ষণ অহিফেন সেবন করা অভ্যাস আছে।

অত্যন্ত ধীবভাবে সে ব্যক্তি সুবোধের প্রস্তাব শ্রবণ করিল। শেষে বলিল, "চারি আনা লাগিবে।" এই বলিয়া রসিদের বহি বাহির করিল। পেন্সিলটা খুঁজিতে কিযৎক্ষণ গেল। পেন্সিল যদি মিলিল, তবে কার্বন কাগজ আর পাওয়া যায় না।

এ দেবাজ সে দেরাজ, এ আলমারি সে আলমারি বহু অনুসন্ধানেও যখন কার্বন কাগজ পাওয়া গেল না, তখন সুবোধ বলিল, "মহাশয় ! আমার সময় নাই. না হয় হাতেই লিখিয়া দেন না।"

সুবোধের অঙ্গে ইংরাজ-বেশ ছিল, সুতবাং অনুরোধটা উপেক্ষিত হইল না।

বসিদ লইয়া কুলিকে বিদায় দিয়া, সুবোধ তাড়াতাড়ি গাড়ির কাছে ছুটিযা গেল। গিযা দেখিল, যেখানে সুনীতির গাড়ি ছিল, সেখানে নাই।

মুহূর্তেব মধ্যে পৃথিবীখানা বিদ্যুৎমণ্ডিত বলিযা মনে হইল। কিন্তু সুবোধ তৎক্ষণাৎ আত্মসম্বরণ কবিয়া ভাবিল, এইখানে কোথাও গাড়ি নিশ্চয়ই সরিয়া গিযা দাঁড়াইয়াছে। স্টেশনের অঙ্গনে তখনও বহুসংখ্যক গাড়ি দণ্ডায়মান। সুবোধ প্রত্যেক গাড়ির কাছে গিয়া উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিল। সেই গাড়ির নম্বরটা কেন দেখিয়া রাখে নাই, কেন এমন মূর্খতা করিল, এই ভাবিয়া নিজ বুদ্ধিকে অত্যন্ত ধিক্কার দিতে লাগিল।

কিন্তু অনুশোচনার সময় নাই। ক্রমেই অন্ধকার বাড়িতেছে। একে একে গাড়িগুলিও বাহির হইয়া যাইতেছে। সহসা একটা কথা সুবোধের মনে হইল। যখন গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কোথায় যাইতে হইবে, তখন সে বলিয়াছিল স্টার থিয়েটার। গাড়োয়ান সুনীতিকে লইয়া যদি স্টারে উপস্থিত হইয়া থাকে ?

এই কথাটা মনে হইবামাত্র সুবোধ একখানা গাড়ি ভাড়া করিয়া স্টারথিয়েটারে ছুটিল। গাড়িতে বসিয়া ভাবিতে লাগিল, নিশ্চয়ই তাহাই হইয়াছে। সে যখন কুলি সঙ্গে করিয়া স্টেশন মাস্টারের নিকট বাক্স রাখিতে গেল, তখন ত গাড়োয়ানকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া যায় নাই। মেমসাহেবরা একাকীও ভ্রমণ করিয়া থাকেন, গাড়োয়ান কোনও সংশয় না করিয়া আপন মনে হাঁকাইয়া গিয়াছে আর কী। সুনীতি কী আর মুখ বাড়াইয়া চিৎকার করিয়া তাহাকে নিষেধ করিতে পারিয়াছে ! এই ঘটনায় সে ভয়ে বিস্ময়ে ভ্যাবাগঙ্গারাম হইয়া গাড়ির ভিতর বসিয়া কাঁপিতেছে—হয়ত কাঁদিতেছে,—নয়ত মূর্ছা গিয়াছে।

স্টার থিয়েটারের সম্মুখে গাড়ি পৌঁছিল। মহা সমারোহে চন্দ্রশেখরের অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। জনতা অত্যন্ত অধিক। বহুলোক স্থানাভাবে টিকিট পাইতেছে না, ফিরিয়া যাইতেছে।

সুবোধ লম্ফ দিয়া গাড়ি হইতে অবতরণ করিল। দণ্ডায়মান সমস্ত গাড়িগুলি একে একে অন্বেষণ করিল। কোনওখানিতে সুনীতি নাই। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ হইবার উপক্রম হইল।

ফিরিবার সময় প্রত্যেক গাড়ির গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুম কোই মেমসাহেবকো লায়া?" সকলেই বলিল, "না।" একজন বলিল, "হাঁ হুজুর লায়া।"

সুবোধের বুকের ভিতরটা ধড়াস করিয়া উঠিল। মনে হইল এইবার যেন অকূল সমুদ্রে কূল পাইয়াছে। ঘোড়া দুইটা দেখিল, গাড়োয়ানের পানে চাহিল, ঠিক যেন সেই ঘোড়া ও সেই গাড়োয়ান বলিয়াই মনে হইল।

এক মুহূর্তের মধ্যে এ সমস্ত ঘটিয়া গেল। দ্বিতীয় মুহূর্তে সুবোধ গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিল, "কাঁহাসে লায়া? হাওড়া স্টেশন সে?"

"হাঁ হুজুর, হাওড়া স্টেশন সে লায়া।"

"হামকো দেখা থা?"

কোচবাক্সে বসিয়া মুখ ঝুঁকাইয়া সেই অল্পালোকে গাড়োয়ান সুবোধের মুখ নিরীক্ষণ করিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, "হাঁ হুজুর আপকো মাফিক একঠো সাহেবকো তো দেখা থা।"

সুবোধ তখন অত্যন্ত আগ্রহের সহিত বলিল, "মেমসাহেব কাঁধার গিয়া?"

"মেমসাহেব ভিতর মে তামাশা দেখ রহিহে।" শুনিয়া সুবোধ ভাবি নিরাশ হইল। ভাবিল তবে এ ত সুনীতি নহে। সুনীতি হইলে সে কখনও গাড়ি ত্যাগ করিয়া টিকিট কিনিয়া থিয়েটারের ভিতর প্রবেশ করিবে না। তাহা একান্তই অসম্ভব। তথাপি ভাবিল—একবার দেখা যাউক।

ভিড় ঠেলিয়া ফটক পার হইয়া সুবোধ থিয়েটারের অঙ্গনের ভিতর প্রবেশ করিল। যে ব্যক্তি টিকিট বিক্রয় করে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ইংরেজবেশধারিণী কোনও বঙ্গমহিলা টিকিট ক্রয় করিয়াছেন কি?"

সে ব্যক্তির নাম ভবচরণ। বলিল—"মহাশয়, বহু লোক টিকিট লইয়াছে, এই ভিড়ে কি কাহারও মুখের পানে চাহিয়া দেখিবার অবসর পাইয়াছি। তবে মনে হইতেছে যেন একজন লইয়াছেন।"

সুবোধ লোকটার হাতে একখানা নোট দিয়া বলিল, "মহাশয় একবার বাহিরে আসুন।"

ভবচরণ সসম্ভ্রমে বাহির হইয়া আসিল। ঔৎসুক্যের সহিত বলিল, "কী মহাশয়?"

সুবোধ বলিল, "আমাকে একটু সাহায্য করিতে হইবে। আপনাদের কোনও লোক দিয়া একবার সেই মহিলাটিকে সংবাদ দিতে হইবে। যদি আমার কার্য সফল হয়, তবে আর একখানি নোট দিব।"

ভবচরণ হাসিয়া বলিল, "তা মহাশয় নিশ্চয়ই করিব। একজন ভদ্রলোকের

যদি উপকার করিতে পারি, তবে তা না করিব কেন ? আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখনি আসিতেছি।"

বলিয়া ভবচরণ একটু অভূতপূর্ব রকম আচরণ করিল। একটা গোলযোগের ব্যাপার সন্দেহ করিয়া, থিয়েটারের কোন ঝিকে ডাকিয়া তাহার দ্বারা উপরে সুবোধের বার্তা না পাঠাইয়া, ইহা নির্ব্বিবাদে হাসিল করা কোন ঝির কর্ম নয় মনে করিয়া, সে পশ্চাৎ দিক দিয়া থিয়েটারের সাজঘরে উপস্থিত হইল। দেখিল তাহার পরিচিতা রোহিণী নাম্নী নটী দলনী বেগমের পরিচ্ছদ পরিয়া চেয়ারে বসিয়া তামাক খাইতেছে।

তাহাকে গিয়া চুপি চুপি বলিল, "একটা কাজ করবে ?"

"কী ?"

ভবচরণ সংক্ষেপে ব্যাপারখানা রোহিণীকে বুঝাইয়া দিল। রোহিণী বলিল, "কী, দেবে ?"

"একটা ফোর্ ক্রাউন হুইস্কি।"

"আরে রামঃ—গলা জ্বলে। গ্রীন শীল্।"

"আচ্ছা তাই, এস তবে।"

বেগমের পরিচ্ছদ পরিত্যাগ না করিয়া বাহিরে যাওয়া চলে না : অথচ ছাড়িলে, আবার পরিতে অনেক কষ্ট ও সময় নষ্ট হইবে সুতরাং রোহিণী একখানা বিলাতী শালে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া, চটিজুতা পায়ে দিয়া ভবচরণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। ভবচরণ সুবোধবাবুকে দেখাইয়া বলিল, "এঁরি কথা বলছিলাম।"

সুবোধ কার্ডকেস হইতে নিজের একখানি কার্ড বাহির করিয়া রোহিণীর হাতে দিল। বলিল, "যদি কোনও ইংরেজবেশধারিণী বঙ্গমহিলাকে ভিতরে দেখেন, তবে এই কার্ড দেখিয়ে অনুগ্রহ করে তাঁকে ডেকে আনবেন।"

রোহিণী সুবোধের পানে চাহিয়া একটু মুচকি হাসি হাসিল। কার্ডখানি লইয়া, হেলিয়া দুলিয়া সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিল।

সুবোধ দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

পাঁচ মিনিট পরে রোহিণী কার্ডখানি হাতে করিয়া নামিয়া আসিয়া বলিল, "ভিতরে 'ইংরেজবেশধারিণী' আপনার কোনও মহিলা নেই। একজন আছেন তিনি আপনার আত্মীয়তা অস্বীকার করলেন।"

সুবোধ কোন কথা না বলিয়া ম্লানমুখে সে স্থান হইতে চলিয়া গেল।

রোহিণী তাহার সঙ্গীকে বলিল, "আজ ভাল বিপদে ফেলেছিলে ভাই। একটা গ্রীণ শীলের লোভে প্রাণটা গিয়েছিল আর কি ! খুঁজে খুঁজে ইংরেজবেশধারিণী মহিলার কাছে উপস্থিত হয়ে বল্লাম, 'আপনার স্বামী বাইরে অপেক্ষা করছেন, আপনি শীঘ্র আসুন।' বলে কার্ড দেখালাম। মাগী কার্ডখানা ছুঁড়ে আমার গায়ে ফেলে দিলে। চটে লাল। আমাকে মারে আর কি !"

"তুমি কোন সাহসে বল্লে, 'তোমার স্বামী বাইরে অপেক্ষা করছেন ?' স্বামী কি অন্য কেউ কি করে জানলে ?"

"নিশ্চয় স্বামী। দেখছ না, লোকটা মণিহারা ফণী হয়ে বেড়াচ্চে।

স্বাধীনতাওয়ালা আলোকপ্রাপ্ত লোক। স্ত্রীটি হাবিযে বসে আছেন। অমৃত বোসকে বলব এখন ভাবি একটা মজাব নতুন প্রহসন হবে।"

সুবোধ অঙ্গনেব বাহিবে গিযা কিযৎক্ষণ দাঁড়াইযা ভাবিল। এমন বিপদে সে ইহজন্মে আব কখনও পড়ে নাই। এক একবাব মনে হইতে লাগিল—এ সকল কি সত্য, না স্বপ্ন দেখিতেছি। যদি ইহা স্বপ্ন হইযা যায, যদি ঘুম ভাঙ্গিযা উঠিযা দেখি যে এ সব কিছু নহে, সুনীতি আমাব পার্শ্বে শযন কবিযা নিদ্রা যাইতেছে, তাহা হইলে কী সুখ, কী আনন্দ হয। সুবোধেব দুইটি চক্ষু জলপূর্ণ হইল। মনে মনে বলিল, সুনীতি, কোথায তুমি, কী অবস্থায বহিযাছ, কোন দস্যুহস্তে, কী মহাবিপদে তুমি পতিত হইযাছ, আমি ত কিছুই জানিতে পাবিতেছি না—হাওড়া স্টেশনেব প্ল্যাটফর্মে সুনীতিব সেই লজ্জাবক্তিম মুখখানি কেবলই সুবোধেব মনে পড়িতে লাগিল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিযা ভাবিল হায হায আমিই তোমাব সর্বনাশ কবিলাম।

কিন্তু এমন ভাবে কালক্ষেপ কবিযা কী ফল হইবে সুবোধ মনে কবিল, আব একবাব হাওড়ায গিয়া অনুসন্ধান কবি যদি সে গাড়িখানা এতক্ষণ ফিবিযা আসিযা থাকে। যে গাড়ি সুবোধ হাওড়া হইতে ভাড়া কবিযা আসিযাছিল, তাহা এতক্ষণ অপেক্ষা কবিতেছিল। সুবোধ তাহাতে আবোহণ কবিযা হাওড়ায যাইতে বহিল।

স্টেশনে পৌঁছিযা সুবোধ দেখিল অঙ্গন বহু শকটে পবিপূর্ণ। পঞ্জাব ডাকগাড়ি ছাড়িবাব সময উপস্থিত হতবুদ্ধিব মত সকল গাড়িগুলিব কাছে এক একবাব দাঁড়াইল কেমন কবিযা সে গাড়ি চিনিযা বাহিব কবিবে।

ডাকগাড়ি ছাড়িযা গেল। সুবোধ একটা মতলব স্থিব কবিযাছে। স্টেশন মাস্টাবেব কাছে গিযা বলিল, মহাশয আপনাব সমস্ত কুলিকে যদি দযা কবিযা একত্র কবেন তবে অত্যন্ত উপকৃত হই। বৈকালেব ট্রেনে যে ব্যক্তি আমাব তোবঙ্গ নামাইযাছিল তাহাকে আমাব বিশেষ প্রযোজন।"

স্টেশন মাস্টাব গম্ভীবমূর্তি ধাবণ কবিযা বলিলেন, "মহাশয, জি আব পুলিসকে আবেদন করুন

চলিল সুবোধ বেলওয়ে পুলিশেব দাবোগাব সন্ধানে দাবোগা সাহেব মুসলমান চাবপাই পাতিযা নিদ্রাব আযোজন কবিতেছিলেন তাহাব সমীপে সুবোধ উপস্থিত হইযা আপনাব আবেদন জানাইল।

প্রথমে ত দাবোগা সাহেব কথা কানেই তোলেন না অবস্থা বুঝিযা প্রাণেব দাযে সুবোধ তাহাকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণান্ত কবিল।

তখন দাবোগা সাহেব সতেজে উঠিযা ব সেন। বাইটাব কনেস্টবলকে হুকুম দিলেন বোলাও সব শালা কুলি লোগকো।

পুলিশেব হাঁকডাকে স্টেশন প্রকম্পিত হইযা উঠিল। দলে দলে বহু কুলি আসিযা সুবোধেব সম্মুখে দাঁড়াইল। ক্রমে যে ব্যক্তি সুবোধেব তোবঙ্গ নামাইযাছিল সে উপস্থিত হইল। সুবোধ তাহাকে চিনিল। জিজ্ঞাসা কবিল, "বিকালেব ট্রেনে নামিযা, যে গাড়ি আমি ভাড়া করিযাছিলাম, সে গাড়িব গাড়োযানকে তুমি চেন কী?"

সে ব্যক্তি বলিল "চিনি বইকি হুজুর, তার নাম রহিমবক্স।"

'রহিমবক্সের আড্ডা কোথায় জান ?'

'জোড়াসাঁকো।'

"সেখানে আমাকে লইয়া যাইতে পার ? ভাল করিয়া বখশিশ দিব।"

বখশিশের নাম শুনিয়া কুলিপুঙ্গব অত্যন্ত উল্লসিত হইয়া বলিল—"চলুন না হুজুর, এখনই যাইতেছি।"

কুলি সুবোধের সঙ্গে চলিল। পুলিশের সেই বাইটার কনেস্টবল অর্থাৎ 'মুন্সীজি' সুবোধের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার মুখের পানে সহাস্য কটাক্ষপাত করিয়া বলিল 'বাবুসাহেব।'

সুবোধ বলিল 'বখশিশ ?'

সে ব্যক্তি গর্বিত ভাবে বলিল 'বাবুজি আমি চাপরাশি না দারোয়ান যে বখশিশ দিবেন? তবে পান খাইবার জন্য যদি কিছু দেন তো আলবৎ লইতে পারি।'

সুবোধ মনে মনে বলিল 'বাধিত করিতে পার।' সুবোধের মন তখন অত্যন্ত উদ্‌ভ্রান্ত। টাকার প্রতি মায়া মমতা সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হইয়াছিল। টেনে করিয়া একটা টাকা ফেলিয়া দিল।

টাকাটা কুড়াইয়া লইয়া মুন্সী বলিল 'বন্দিগি বাবুসাহেব।'

কুলিকে সঙ্গে লইয়া গাড়ি করিয়া সুবোধ জোড়াসাঁকোর এক অন্ধকার গলিতে উপস্থিত হইল। পথে একবার শঙ্কা করিতে করিতে আসিয়াছিল হয়ত গাড়োয়ানের দেখা পাওয়া যাইবে না। কিন্তু সে আশঙ্কা অমূলক হইল। গাড়ি আছে, গাড়োয়ান পাশে খাটিয়ায় শুইয়া ঘুমাইতেছে।

কুলি তাহাকে ডাকিল 'রহিম— ও রহিম— ওঠ ওঠ।' রহিম ঘুমের ঘোরে বলিল 'আজ আর কোথাও ভাড়া যাবে না। আজ দারু মেরে দিয়েছি।'

শুনিয়া সুবোধের মনটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। ভাবিল কি অমঙ্গলের কথাই শুনিতে না জানি।

কুলি তাহাকে আশ্বাস দিল "ভাড়া যেতে হবে না, শীঘ্র ওঠ।"

রহিম বোল মারিয়া উঠিল, মুখে ভয়ানক মদের গন্ধ। বিড় বিড় করিয়া কি বলিল তাহার কিছুই বোঝা গেল না। বকিতে বকিতে আবার ধপাস করিয়া খাটিয়ায় শুইয়া পড়িল।

কুলি তখন গাড়ির লণ্ঠনটা খুলিয়া আনিয়া সুবোধের মুখে আলোক ধরিল, জিজ্ঞাসা করিল 'একে চিনিতে পার কি?'

সুবোধকে দেখিবামাত্র গাড়োয়ান উঠিয়া দাঁড়াইল। হাত দুইটি জোড় করিয়া অত্যন্ত করুণস্বরে বলিল 'হুজুর, আপনার মেমসাহেব আজ আমাকে দশ টাকা বখশিশ দিয়েছেন।'

সুবোধ যেন হাতে স্বর্গ পাইল। জিজ্ঞাসা করিল, 'আমার মেমসাহেবকে কোথায় রেখে এসেছিস ?'

গাড়োয়ানের মাথার ঠিক ছিল না। একে মদের প্রভাব, তাহার উপর একদম দশ টাকা লাভ করিয়াছে। কিয়ৎক্ষণ ভাবিল। ভাবিয়া পূর্ববৎ

করুণস্বরে বলিল, "হুজুর, ভবানীপুর।"

"কোন স্থান?"

"চক্রবেড়িয়া।"

সুবোধের দেহে প্রাণ আসিল। ভবানীপুর চক্রবেড়িয়ায় সুবোধের ভায়রাভাই অবিনাশচন্দ্রের বাড়ি। সুনীতি নিশ্চয়ই সেখানে গিয়াছে। আর কোনও ভাবনা নাই। তবু সুবোধ জিজ্ঞাসা করিল, "কত নম্বর?"

"নম্বর ত মনে নাই হুজুর।" বারম্বার এই কথা বলিতে বলিতে লোকটা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তাহার কান্না দেখিয়া সুবোধ অত্যন্ত বিস্মিত হইল। কুলিকে জিজ্ঞাসা করিল "এ কাঁদে কেন?"

কুলি জিজ্ঞাসা করিল "রহিম! কাঁদিস কেন রে? ভয় কী তোর?"

রহিম কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তর করিল, "ভয় আর কী? বেশী দারু পিলেই আমার কান্না পায়। মনে হয় যেন আমার বিবি মরে গেছে।"

শুনিয়া সুবোধ মনে মনে হাসিল। 'বিবি'র বিরহে মানুষের অন্তরে যে কী ভাব উপস্থিত হয়, তাহা সে এতক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিল।

সুবোধ পকেট হইতে একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া দিয়া বলিল, "তোমরা দুজনে এই পাঁচ পাঁচ টাকা বকশিশ নাও।"

পর মুহূর্তেই সুবোধের গাড়ি ভবানীপুর অভিমুখে চালিত হইল। রাত্রি তখন এগারোটা। শীতল নৈশ বায়ু তাহার ললাটের ঘর্ম অপনোদন করিয়া দিল। সুবোধ মনে একপ্রকার অভূতপূর্ব লঘুতা অনুভব করিল। বারম্বার অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিল, "এ কি মুক্তি, এ কি পরিত্রাণ! কি আনন্দ হৃদয় মাঝারে!"

চক্রবেড়িয়া রোডে অবিনাশচন্দ্রের বাড়ির সম্মুখে সুবোধের গাড়ি দাঁড়াইল। তাড়াতাড়ি গাড়োয়ানকে বিদায় করিয়া, মুক্ত দুয়ারে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল। একেবারে অবিনাশচন্দ্রের শয়নকক্ষে গিয়া উপস্থিত। কেরোসিনের ল্যাম্প মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে। অবিনাশচন্দ্র বিছানায় আড় হইয়া শুইয়া। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সুবোধ রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল "সুনীতি?"

অবিনাশচন্দ্র হাই তুলিয়া বলিলেন, "সুনীতি কী?"

"সুনীতি এসেছে?"

অবিনাশচন্দ্র আবার হাই তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন "কোথা থেকে নেশা করে এলে? বিভুল বকছ যে হে।"

সুবোধ হতাশ হইয়া নিকটস্থ চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

এই সময় ঘরে শ্যালিকা সুমতি প্রবেশ করিলেন। সুবোধকে দেখিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গো সাহেব! চন্দ্রশেখর অভিনয়টা কেমন দেখলে?"

অবিনাশচন্দ্র স্ত্রীকে ভৎসনা করিলেন, "আচ্ছা পাগল! পেটে এক মিনিট কথা থাকে না? আমি ভায়াকে একটু চমকে দিচ্ছিলুম।"

সুবোধ বলিল "খুব লোক যা হোক! এ সব বিষয় নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করে!"

মহা হাসি পড়িয়া গেল। সুমতি ও অবিনাশচন্দ্র উভয়ে মিলিয়া সুনীতির দুর্গতির ইতিহাসটা বিবৃত করিলেন। সুবোধ কুলির সঙ্গে স্টেশন মাস্টারের সন্ধানে প্রস্থান করিলেই গাড়োয়ান গাড়ি হাঁকাইয়া একেবারে স্টার থিয়েটারে হাজির। গাড়িও ছুটিল, সুনীতিও কান্না আরম্ভ করিয়া দিল। থিয়েটারের সম্মুখে গাড়ি দাঁড় করাইয়া গাড়োয়ান আসিয়া গাড়ির দরজা খুলিয়া দিল। গাড়োয়ানকে দেখিবামাত্র সাহসে ভর করিয়া সুনীতি বলিল, "চল আবার স্টেশনে চল। আমার স্বামীকে ফেলিয়া আসিলি কেন?" গাড়োয়ান আবার হাওড়া স্টেশনে যায়। অনেক খুঁজিয়া সুবোধকে পাইল না। তখন কি ভাগ্যিস সুনীতির বুদ্ধি যোগাইল। এখানকার ঠিকানা বলিয়া দিল দশ টাকা বখশিশ কবুল করিল। আমরা ত মেমসাহেবকে দেখিয়া চিনিতেই পারি না। শেষকালে সুমতি উপসংহার করিলেন, "আহা মরি কি ছিরিই বেরিয়েছিল! সে বেশ আর সে অবস্থা দেখে হাসব কী কাঁদব ভেবে ঠিক করতে পারিনি। যদি থিয়েটারে বক্সে নিয়ে যাবারই সাধ, তবে অমন কিম্ভূতকিমাকার না সাজিয়ে, পুজোর সময় শখ করে যে নতুন পোশাক তৈরি করিয়েছ তাই পরালেই ত হত। সেও শাড়ি হোক, কিন্তু এ কালের ছাঁদের, কত সুন্দর! যে সব মেয়েরা বাইরে বেরোন তাঁরা ত ঐ পরে বেরোন তাঁরা ত আর গাউন পরতে যান না। এ বুদ্ধিটুকু তোমার ঘটে কেন জোটেনি?"

সুবোধ মহা অপ্রতিভ হইয়া ভাবিল, "তাই ত।"

বৃত্তান্ত শেষ হইলে সুমতি সুবোধকে ডাকিল, "এখন এস সাহেব মশাই! তোমার বিবির সঙ্গে দেখা করবে এস। সে ত এসে অবধি জল গেলাসটি অবধি খায়নি, কেঁদে কেঁদে মরছে। এই এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়ল। তাকে ওঠাইগে চল। তোমার অবস্থাটা কী হয়েছিল বলবে এস।"

[শ্রাবণ, ১৩০৬]

শখের ডিটেকটিভ

শীতকাল। রাত্রি ৮টা ২২ মিনিটে ডায়মণ্ডহার্বার হইতে আগত কলিকাতাগামী প্যাসেঞ্জার গাড়িখানি সংগ্রামপুর স্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইল। অল্প কয়েকজন আরোহী ওঠা নামা করিতেই ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল।

ঠিক এই সময়ে ব্যাগহস্তে একজন মধ্যবয়স্ক স্থূলকায় ভদ্রলোক দৌড়িয়া প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তাঁহার উদ্যম বৃথা হইল। পোঁ করিয়া বাঁশি বাজাইয়া, ইঞ্জিন মহাশয় বাবুটিকে উপহাস ছলেই যেন "ধেৎ ধেৎ" করিতে করিতে ছুটিতে আরম্ভ করিল। বাবুটি হতাশ হইয়া চলন্ত ট্রেনখানির প্রতি চাহিয়া রহিলেন আর, হাঁফাইতে লাগিলেন।

গাড়ি বাহির হইয়া গেলে বাবুটি ধীরপদে আবার ফটকের দিকে অগ্রসর হইলেন। সেখানে গোল লণ্ঠন হাতে ছোট স্টেশন মাস্টারবাবু দাঁড়াইয়া আগন্তুক আরোহিগণের নিকট টিকিট লইতেছিলেন। বাবুটি পাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন। শেষ ব্যক্তি ফটক পার হইয়া গেলে ছোটবাবুকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশায়, আবার ক'টায় ট্রেন?"

ছোটবাবু বাতির আলোকে টিকিটগুলি দেখিতে দেখিতে বলিলেন, "কোথাকার ট্রেন?"

"কলকাতায় ফেরবার।"

"আবার সেই রাত্রি ১টা ১৮ মিনিটে।"

বাবুটি আপন মনে হিসাব করিতে লাগিলেন, "একটা আঠারো। আমাদের হল আঠারো প্লস্ চব্বিশ—একটা বেয়াল্লিশ মিনিট—পৌনে দুটোই ধর। তাই ত!"

ইত্যবসরে ছোটবাবু সেখান হইতে অদৃশ্য হইয়াছিলেন। একজন খালাসী চাকাওয়ালা মই ঘড়ঘড় করিয়া টানিতে টানিতে প্ল্যাটফর্মের আলোগুলি নিবাইয়া দিতেছিল। বাবুটি ধীরে পাবে ফটকের বাহির হইয়া সিঁড়ি নামিয়া নিম্নে গিয়া দাঁড়াইলেন। সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন, নিকটে একটি হালুইকরের দোকানে মিটিমিটি করিয়া আলোক জ্বলিতেছে— তাহার পর যতদূর দৃষ্টি চলে, কেবল অন্ধকার। নিকটতম গ্রামও এখান হইতে অন্তত একক্রোশ দূরে অবস্থিত—রাস্তাটির দুই ধারে কেবল গাছ ও জঙ্গল। সেই জঙ্গলে ঝিঁঝি পোকা ডাকিতেছে। মাঝে মাঝে শৃগালের হুক্কাহুয়া রবও শুনা যাইতেছে।

সেখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বাবুটি অনুভব করিলেন, কিঞ্চিৎ আহার সামগ্রী অভ্যন্তরভাগে প্রেরণ না করিলে সমস্ত রাত্রি কাটিবে না। যদিও, যাহাদের বাড়িতে গিয়াছিলেন সেখানে সান্ধ্য জলযোগটা একটু গুরুতর গোছই হইয়াছিল, এবং তাহাদের আয়োজনে বিলম্ব জন্যই গাড়িটি ফেল হইয়া এই বিপত্তি উপস্থিত— তথাপি সারারাত্রের উপযুক্ত বোঝাই ত লওয়া হয় নাই হালুইকরের দোকানটি আছে তাই রক্ষা নচেৎ অর্দ্ধাশনেই রাত্রি কাটাইতে হইত। ভাবিতে ভাবিতে বাবুটি হালুইকরের দোকানের সম্মুখে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

• বৃদ্ধ হালুইকর চশমা চোখে দিয়া রামায়ণ পড়িতেছিল, বলিল "আসুন্তে হোক, আসুন" দোকানের ভিতর দেয়াল ঘেঁসিয়া একটি সরু বেঞ্চি ছিল তাহার উপর বাবুটি উপবেশন করিয়া বলিলেন "কি কি আছে?"

হালুইকর বলিল "আজ্ঞে, বাবুর কি চাই বলুন। রসোগোল্লা আছে, পান্তুয়া আছে, মিহিদানা আছে, কচুরি আছে, সিঙ্গাড়া আছে—তাজা, আজই ভেজেছি।

ইচ্ছামত দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া বাবুটি আহারে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই সুযোগে ইহার পরিচয়টি দেওয়া আমাদের কর্তব্য হইতেছে সুখের বিষয় তজ্জন্য আমাদিগকে বিশেষ শ্রম স্বীকার করিতে হইবে না নামটি প্রকাশ করিলেই যথেষ্ট হইবে। কারণ বিজ্ঞাপন অনুসারে 'বঙ্গসাহিত্যে ইহার নূতন পরিচয় দেওয়া সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন।"

আপনারা নিশ্চয়ই ইহার লেখনীপ্রসূত কোন না কোন ডিটেকটিভ উপন্যাস পাঠ করিয়াছেন। স্বয়ং না পড়িয়া থাকেন, বাড়ির মেয়েদের জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন।

ইহার নাম শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন দত্ত। কলিকাতায় বাস করেন। এই স্টেশন হইতে দুই ক্রোশ দূরে কোন গ্রামের একজন ভদ্রলোকের কন্যার সহিত ইহার ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে। আজ বেলা তিনটার গাড়িতে ইনি কলিকাতা হইতে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। মেয়ে দেখিয়া আটটা চব্বিশের গাড়িতে যদি রওনা হইতে পারিতেন, তবে রাত্রি পৌনে দশটায় কলিকাতায় পৌঁছিয়া, গরম গরম লুচি, ঘন বুটের দাল, সদ্য ভর্জিত রোহিত মৎস্য, হংসডিম্বের কালিয়া প্রভৃতি ভক্ষণান্তে, নিরাপদে লেপমুড়ি দিয়া শয়ন করিতেন—কিন্তু বিধিলিপি কে খণ্ডাইতে পারে?

বাসি কচুরি ভিতরে আঁঠিওয়ালা রসগোল্লা প্রভৃতি যথাসাধ্য ভক্ষণ করিয়া গোবর্দ্ধনবাবু হাত মুখ ধুইয়া ফেলিলেন। হালুইকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তোমার দোকান কতক্ষণ খোলা থাকে ?"

হালুইকর বলিল, 'রাত্রির ন'টা, বড়জোর সাড়ে ন'টা।

'তারপর ?'

"তারপর দোকান বন্ধ করে গিয়ে আহার করি। আহারাদি করে শয়ন করি।

গোবর্দ্ধনবাবু ব্যাগটি হাতে করিয়া উঠিলেন হালুইকর বলিল বাবু তা হলে ইস্টিশান চল্লেন ?

'কার কি ?' বলিয়া গোবর্দ্ধনবাবু ধীরে ধীরে আবার স্টেশনে গিয়া উঠিলেন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স গ্রামপুর ছোট স্টেশন। তার অপিস, টিকিট অপিস প্রভৃতি সমস্ত একই কামরায় অবস্থিত। ওয়েটিং রুম পর্যন্ত নাই।

গোবর্দ্ধনবাবু প্ল্যাটফর্মে পৌঁছিয়া দেখিলেন সেই অপিস-কামরা তালাবন্ধ বাহিরে কম্বল গায়ে দিয়া একজন খালাসী বসিয়া ঝিমাইতেছে। একটিমাত্র লণ্ঠন জ্বলিতেছে তাহারও আলোক অত্যন্ত কমাইয়া দেওয়া

গোবর্দ্ধনবাবু খালাসিকে জিজ্ঞাসা করিলেন বাবু কোথা রে ?

খেতে গেছেন বাসায়'

'কখন আসবেন ?

এই এলেন বলে।

একখানি বেঞ্চি ছিল গোবর্দ্ধনবাবু তাহারই উপর উপবেশন করিলেন ব্যাগটি খুলিয়া পানের ডিবা বাহির করিলেন সিগারেট ও দিয়াশলাই বাহির করিলেন। জুতা খুলিয়া রাখিয়া পা দুটি বেঞ্চির উপর তুলিয়া গাত্রবস্ত্রখানি বেশ করিয়া ঢাকা দিয়া বসিয়া তাম্বুল চর্বন ও ধূমপানে প্রবৃত্ত হইলেন

চারিদিক খোলা মাঠ হু হু করিয়া হাওয়া আসিতেছে কিছুক্ষণ পরেই গোবর্দ্ধনবাবুর শীতবোধ হইতে লাগিল। কোথায় বাড়িতে এতক্ষণ চারিদিকে দরজা জানালা বন্ধ করিয়া লেপ মুড়ি দিয়া শয়ন কোথায় এই তেপান্তরের মাঠে এই কষ্টভোগ। যদি না মেয়ে দেখিতে আসিতেন তাহা হইলে ত এই কষ্টভোগ হইত না। মেয়ের বাপেরা জলযোগের অনাবশ্যক আড়ম্বর করিয়া গাড়ি ফেল করিয়া দিয়াছে বলিয়া তাহাদের উপর রাগ হইল বিধবা ভ্রাতৃজায়ার উপর রাগ হইল—ছেলের বিবাহের জন্য এত তাড়াতাড়িই কেন তাহার ? গোবর্দ্ধনবাবু বলিয়াছিলেন এ বছরটা যাক আসছে বছর তখন দেখা যাবে— সে কথা তিনি কোন মতেই শুনিলেন না। বধূ আসিয়া কি চতুর্ভুজ করিয়া দিবে ? বাল্য-বিবাহের উপরও তাঁহার রাগ হইতে লাগিল।

শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন, এবার বাল্য-বিবাহকে আচ্ছা করিয়া গালি দিয়া একখানি নূতন ধরনের উপন্যাস তিনি লিখিবেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে সিঁড়িতে জুতার শব্দ উঠিল। প্ল্যাটফর্মের উপর খানিকটা আলোক আসিয়া পড়িল। বাতি হাতে করিয়া ছোটবাবু আসিলেন, আপিস কামরা খুলিয়া প্রবেশ করিয়া দরজাটি ভেজাইয়া দিলেন।

আবও কিয়ৎক্ষণ শীতভোগ কবিবার পব গোবর্দ্ধনবাবু ধৈর্য হারাইলেন। উঠিয়া গিয়া দরজাটি ফাঁক করিয়া বলিলেন, "স্টেশন মাস্টারবাবু, পৌনে দুটোর গাড়ির ত এখনও অনেক দেরি, বাইরে বড্ড শীত, ভিতরে এসে কি বসতে পারি ? বাবুটি স্টেশন মাস্টার নহেন, 'ছোটবাবু' মাত্র তাহা গোবর্দ্ধনবাবু জানিতেন ; কিঞ্চিৎ খোসামোদ করার অভিপ্রায়েই ওরূপ সম্ভাষণ করিলেন।

ছোটবাবু বলিলেন, "আসুন।"

প্রবেশ করিয়া গোবর্দ্ধনবাবু একখানি পিঠভাঙ্গা চেয়ারে বসিলেন। এইবার ভাল করিয়া দেখিলেন, ছোটবাবুর বয়স ৪০ বৎসরের উপরে উঠিয়াছে। সাদা জিনের প্যান্টালুনের উপর কালো মোটা গবম কোট পরিয়া রহিয়াছেন। মোটা মোটা গোল গোল বোতামগুলাতে কি সব ইংরাজি অক্ষর লেখা। টেলিগ্রাফের কলের কাছে বসিয়া খুট খাট্ করিয়া কাজ করিতেছেন।

গোবর্দ্ধনবাবু যেখানে বসিয়াছিলেন, তাহার কাছে লম্বা গোছের একটি টেবিল তাহার উপর ঘষা কাঁচেব একটি সরু উচ্চ লণ্ঠন রক্ষিত, লাইন ক্লিয়াব বহি ও অন্যান্য খাতাপত্র যথাতথা ছড়ান, একটি টিনের গঁদ-দানি, অপব একটি টিনের আধাবে তেলকালীর প্যাড এবং সেই স্টেশনের একটি মোহরছাপ, সীসার কাগজ-চাপা, একগাছা রুল—এই সব দ্রব্য বহিয়াছে।

•ছোটবাবু তারের কাজ শেষ কবিযা, আগন্তুকের প্রতি চাহিযা একটি হাই তুলিলেন। দাঁড়াইয়া উঠিয়া, হাত দুটি পিঠের দিকে কবিয়া গা ভাঙ্গিলেন। তাহাব পব একটি দেরাজ ধবিয়া খড় খড় করিয়া টানিয়া, তাহার মধ্য হইতে একখানি বহি বাহির করিয়া, আলোকেব নিকট সরিয়া আসিয়া পড়িতে বসিলেন। গোবর্দ্ধনবাবু গলাটি বাড়াইযা দেখিলেন, বহিখানি তাঁহারই প্রণীত "ভীষণ বক্তার্বাক্ত" নামক উপন্যাস।

গোবর্দ্ধনবাবু নূতন লেখক নহেন। যাহাদের বহি বৎসরের পর বৎসর সিন্দুক বা আলমারিতে কীটভোগ্য হইয়া বিরাজ কবে সে শ্রেণীর গ্রন্থকার নহেন। তথাপি এই দূব পল্লীতে একজনকে নিজ পুস্তকপাঠে নিবিষ্টচিত্ত দেখিযা তাঁহার মনটা উল্লসিয়া উঠিল। তাঁহাব শীত কোথায় চলিয়া গেল !

ছোটবাবু একমনে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টাইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। গোবর্দ্ধনবাবু একদৃষ্টে তাঁহাব মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। আত্মপ্রসাদে তাঁহার মন ভরিয়া উঠিতে লাগিল। মনে মনে বলিলেন, "বিজ্ঞাপনে যে লিখি, "একবার পড়িতে বসিলে আহার নিদ্রা ত্যাগ' সেটা কি নিতান্ত মিছে কথা লিখি ?"

কিছুক্ষণ এইরূপে কাটিলে, এই ভক্ত পাঠকটির নিকট আত্মপরিচয় দিবার জন্য গোবর্দ্ধনবাবুর প্রাণটা ছট্‌ফট করিতে লাগিল। ভাবিলেন "পুরাতন একখানা মলিদা গায়ে দিয়া, কাদামাখা জুতা পায়ে দিয়া, নিরীহ ভাল মানুষটির মত বসিয়া রহিয়াছি—আমি যে কে, জানিতে পারিলে বাবুটির কি বিস্ময়ের অবধি থাকিবে ! ইহার পর চিরদিন উনি লোকের কাছে বলিয়া বেড়াইবেন না কি, 'একবার বিখ্যাত ডিটেকটিভ ঔপন্যাসিক গোবর্দ্ধনবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। লোকটি এমন সাদাসিধে যে দেখলে গোবর্দ্ধনবাবু বলে মনেই হয় না। অতি মহাত্মা লোক !' না হয় আমিই উঁহার নামটি প্রথমে জিজ্ঞাসা করি। তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার

নামও উনি জিজ্ঞাসা করিবেন।"

গলা বাড়াইয়া গোবর্দ্ধনবাবু দেখিলেন, ছোটবাবু তখন ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ পড়িতেছেন—যেখানে প্রসিদ্ধ গুণ্ডা মির্জা বেগ পঞ্চদশবর্ষীয়া সুন্দরী নায়িকা বকুলমালাকে তাহার পিতৃগৃহ হইতে গভীর রাত্রে ডাকাতি করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। এই পরিচ্ছেদটি বিশেষভাবে 'চমকপ্রদ', সুতরাং রসভঙ্গ করিতে ইচ্ছা হইল না।

পরিচ্ছেদটি শেষ হওয়া মাত্র গোবর্দ্ধনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশায়ের নামটি কী জিজ্ঞাসা করতে পারি কী?"

বাবুটি পুস্তক হইতে মুখ না তুলিয়াই উত্তর করিলেন, "শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ।" বলিয়া চতুর্বিংশতি পরিচ্ছেদে মনোনিবেশ করিলেন।

গোবর্দ্ধনবাবু সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার নিবাস?"

বাবুটি পূর্ব্ববৎ বলিলেন, "হুগলির কাছে।"

"কোন গ্রামে?"

"শঙ্করপুর" বলিয়া তিনি চতুর্বিংশতি পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় পৃষ্ঠা উন্মোচিত করিলেন।

গোবর্দ্ধনবাবু মনে মনে বলিলেন, "কোথাকার অভদ্র লোক!" প্রকাশ্যে বলিলেন, "আপনার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করছি বলে আপনি বিরক্ত হচ্ছেন না ত মশায়? আজকাল ইংরাজি ফ্যাশান অনুসারে এগুলো বেয়াদপি বলে গণ্য তা জানি। কিন্তু আমরা মশায় সেকেলে লোক—অত মেনে চলতে পারিনে। কিছু মনে করবেন না।"

বাবুটি তাঁহার পানে একটি নজর মাত্র চাহিয়া, একটু মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন "না।"

গোবর্দ্ধনবাবু তখন আত্ম-পরিচয় দান সম্বন্ধে হতাশ হইয়া কড়িকাঠ গণিবার অভিপ্রায়ে ঊর্ধ্বদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন কড়িকাঠ নাই, ঢেউ খেলান করোগেটেড লোহার ছাদ মাত্র।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ছোটবাবু যখন বহিখানি শেষ করিলেন তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে বারোটা। বহি বন্ধ করিয়া, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া প্রায় এক মিনিট কাল তিনি সম্মুখস্থ দেওয়ালের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর গোবর্দ্ধনবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "সেই অবধি বসে রয়েছেন?"

"আজ্ঞে কি করি বলুন!"

"ভারি কষ্ট হল ত আপনার। পান খাবেন?" বলিয়া পকেট হইতে পানের ডিবাটি বাহির করিয়া আগন্তুকের নিকট ধরিলেন। পান লইয়া গোবর্দ্ধনবাবু ভাবিলেন, "হায়, এ ব্যক্তি জানিতেও পারিতেছে না, যাহাকে পান দিতেছে সে লোকটা কে এবং কত বড়!"

ছোটবাবু বলিলেন, "মশায মাফ কববেন। আপনি প্রায তিনঘণ্টা এখানে বসে আছেন, আপনাকে কোনও খাতিব কবিনি। ঐ বইখানা নিযে এমনি হযে হযে পডেছিলাম—একেবাবে বাহ্যজ্ঞান শূন্য। কোথা থেকে আসছেন? মশাযেব নামটি কি?"

গোবর্দ্ধনবাবু বলিলেন, "কলকাতা থেকে এসেছিলাম। আমাব ভাইপোব জন্যে কাছেই একটি গ্রামে মেযে দেখতে গিযেছিলাম। আমাব নাম শ্রীগোবর্দ্ধন দত্ত।"

নামটি শুনিবামাত্র ছোটবাবু পর্বপঠিত বহিখানিব সদব পৃষ্ঠাটি খুলিযা আলোকেব নিকট ধবিলেন। বহি নামাইযা গোবদ্ধনবাবুব পানে চাহিলেন। আবাব বহিখানিব সদব পৃষ্ঠাটি দেখিতে লাগিলেন।

তাঁহাব অবস্থা দেখিযা গোবদ্ধনবাবু বলিলেন "কী ভাবছেন?"

বাবুটি সঙ্কোচেব সহিত বাললেন "মশায—আপনিই কি—এই বই লিখেছেন?"

গোবদ্ধনবাবু নেকা সাজিযা জিজ্ঞাসা কবিলেন, "কী বই ওখানা?"

"ভীষণ বক্তার্বাক।"

ওঃ- হাঁ আমাবই একখানা বই বটে।

ছোটবাবু বলিলেন, "আঁ—আপনি! আপনিই গোবদ্ধনবাবু? মশায আপনাব সঙ্গে যে বকম ব্যবহাব আমি কবেছি তাব অন্যায হযে গেছে। ছি ছি!"

গোবর্দ্ধনবাবু বলিলেন "না না- কিছুই অন্যায ত আপনি কবেন নি। কী অন্যায কবেছেন?"

"অন্যায কবিনি? আপনি এখানে তিন ঘণ্টা কাল ঠায বসে আছেন, আপনাকে জিজ্ঞাসাও কবিনি মশায আপনাকে কোনও কষ্ট হচ্ছে কি না—বই নিযে এমনই মেতেছিলাম অন্যায কবিনি?"

"কিছু না কিছু না। ববং আমাব বই নিযে আপনি মেতে উঠেছিলেন সেটা ত আমাব পক্ষে কমপ্লিমেণ্ট। আমাব আব কোন কোন বই আপনি পডেছেন?"

"আজ্ঞে আব কিছু পডিনি, তবে পাঁজিতে আপনাব অনেক বইযেব বিজ্ঞাপন দেখেছি বটে। এবাব আনাতে হবে এক একখানা কবে। আজই কী এ বইখানা পডা হত? বইখানি একজন প্যাসেঞ্জাব ফেলে গেছে। পাঁচটাব গাডিতে এসেছিল কলকাতা থেকে- মস্ত একদল। বাইবে প্লাটিফমে ঐ যে বেঞ্চখানি বযেছে—তাবই উপব জনকতক বসেছিল। তাবা চলে গেলে দেখি, বইখানি বেঞ্চেব নিচে পডে বযেছে। এনে পডতে আবম্ভ কবলাম।—বাপ! আবম্ভ কবলে কি আব ছাডবাব যো টি আছে? আচ্ছা মশায ও সব ঘটনা কী সত্যি, না আপনি মাথা থেকে বেব কবেছেন?"

আসল কথাটা বলিতে গেলে বলিতে হয, ইংবাজি নভেল হইতে 'না বলিযা গ্রহণ'—তাই গোবর্দ্ধনবাবু ইতস্ততঃ কবিযা বলিলেন "মাথা থেকে বেব কবেছি।"

"আপনাব খুব মাথা কিন্তু! কি অসাধাবণ কৌশল! আপনি যদি পুলিশ লাইনে ঢুকতেন ত খুব ভাল ডিটেকটিভ হতে পাবতেন। হ্যাঁ—ভাল কথা মনে

পড়ে গেল। আপনি এসেছেন ভালই হযেছে, আপনাকে জিজ্ঞাসা কবি। দেখুন, বইখানাব ভিতব এক চিঠি ছিল। আশ্চর্য চিঠি। আমি ত মশায পড়ে কিছুই বুঝতে পাবলাম না। আপনি দেখুন দেখি।" বলিযা দেবাজ খুলিযা একখানি পত্র বাহিব কবিযা তিনি গোবর্দ্ধনবাবুব হাতে দিলেন।

ব্যাগ হইতে চশমা বাহিব কবিযা, চোখে দিযা, আলোব কাছে ধবিযা গোবর্দ্ধনবাবুপত্রখানি পাঠ কবিলেন—

ভাই কুঞ্জ,

মঙ্গলবাব বাত্রে শত্রুদুর্গ আক্রমণ মনে আছে ত? তুমি সদলবলে ঐ দিন বিকাল পাঁচটাব গাড়িতে আসিযা পৌঁছিবে, অন্যথা না হয। সকলে এখানে সমবেত হইযা সন্ধ্যাব পবই মার্চ কবিতে হইবে। বাত্রি দশটায যুদ্ধাবম্ভ। কার্য সমাধা কবিযা ভোব তিনটাব গাড়িতে তোমবা ফিবিযা যাইতে পাবিবে। ইতি,

তোমাদেব

নিতাই।

পত্রখানি পড়িযা গোবদ্ধনবাবুব মনে হইল, ইহা স্বদেশী ডাকাতি ভিন্ন আব কিছুই নহে। জিজ্ঞাসা কবিলেন, "তাবা একদল এসেছিল বললেন না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"ক'জন?"

"জন কুড়ি হবে।"

"বযস কত হবে? চেহাবা কী বকম?"

বযস– পনেবো সাল থেকে উনিশ কুড়িব মধ্যে চেহাবাগুলো ষণ্ডা ষণ্ডা—খুব হাসি স্ফূর্তি হৈ হল্লা কবতে কবতে গেল।"

"ভদ্রলোকেব ছেলে সব?"

"হ্যাঁ। বেশ ফিটফাট পোশাক চোপড়। কাবু কাবু চোখে সোনাব চশমা।"

"কোন ক্লাসেব টিকিট নিযে এসেছিল?"

"ইণ্টাবমিডিযেট।"

"সিঙ্গল না বিটার্ন?"

"বিটার্ন।"

"তাদেব টিকিটগুলো বেব করুন।"

ছোটবাবু একটা দেবাজ টানিযা একগাদা টিকিট হইতে লাল বঙেব আধখানা টিকিটগুলো বাছিযা বাছিযা গোবর্দ্ধনবাবুব সম্মুখে ফেলিতে লাগিলেন। শেষ হইলে গোবদ্ধনবাবু গনিযা দেখিলেন, সবসুদ্ধ উনিশখানা আছে। প্রত্যেকখানিই কলিকাতা হইতে, নম্ববগুলি পবপব। পকেট বুক বাহিব কবিযা টিকিটেব নম্বব ও ছাপগুলিব বিববণ গোবদ্ধনবাবু নোট কবিযা লইযা গম্ভীবভাবে বলিলেন, "স্বদেশী ডাকাতি।"

ছোটবাবু বলিলেন, স্বদেশী ডাকাতি। অ্যাঁ। স্বদেশী ডাকাতি। বলেন কী?"

"পবিষ্কাব স্বদেশী ডাকাতি। আপনাব কাছে ম্যাগ্নিফাযিং গ্লাস আছে?"

"না। কেন বলুন দেখি?"

চিঠিখানির একটি স্থানে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া গোবর্দ্ধনবাবু বলিলেন, "এই দেখুন, খামের উপব যে মোহর পড়ে, তাবই শাদা দাগ এ চিঠিতে রয়েছে। একটা ম্যাগ্নিফায়িং গ্লাস পেলে ছাপটা পড়তাম।"

ছোটবাবু চশমা চোখে দিয়া দাগটা পড়িতে চেষ্টা করিলেন। শেষে বলিলেন, "কিছু পড়া গেল না।"

গোবর্দ্ধনবাবু সেই ঘষা কাঁচেব লণ্ঠনটির দ্বার খুলিয়া ভিতরে কী যেন অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। শেষে একটুকরা কাগজ লইযা লণ্ঠনের একটা স্থানে ঘষিতে লাগিলেন। কাগজটুকু ভুষা কালী মাখা হইযা গেল। বাহির করিয়া, তাহার উপর জোবে দুই তিনটা ফুঁ দিযা, গোবর্দ্ধনবাবু সেখানি চিঠির সেই শাদা ছাপ-পড়া অংশে লঘু হস্তে বুলাইতে লাগিলেন। ছোটবাবু অবাক হইযা ইঁহার কার্যপরম্পরা দেখিতেছিলেন।

ছাপটি পবীক্ষা কবিযা গোবর্দ্ধনবাবু গম্ভীব ভাবে বলিলেন, "আজই বেলা ৯টার ডিলিভারিতে বউবাজার পোস্টাপিস থেকে এ চিঠি বিলি হয়েছে।' বলিয়া চিঠিখানি ছোটবাবুর হস্তে দিলেন। ছোটবাবু সেখানি আলোকে ধবিযা দেখিলেন, কালো জমিব উপবে শাদা অক্ষবে OW AZA তাহাব নিম্নে 9A তাহাব নিম্নে 5Jy ফুটিযা উঠিযাছে। চিঠিখানি গোবর্দ্ধনবাবুব হস্তে প্রত্যর্পণ কবিযা রুদ্ধস্ববে বলিলেন, "ধন্য আপনাব বুদ্ধি! নইলে আব অমন সব নভেল আপনাব মাথা থেকে বেবোয়!"

গোবর্দ্ধনবাবু বলিতে লাগিলেন, "এই ডাকাতদেব অন্তঃ একজন— যাব নাম কুঞ্জ—বউবাজার অঞ্চলে থাকে। নিতাই বলে দলেব একজন পূর্বেই এসেছিল—যা কিছু দেখবার শোনবাব খবব নেবাব সমস্ত ঠিকঠাক কবে এই চিঠি লিখেছে। এই অঞ্চলেব কোনও ধনী লোকেব বাড়ি আজ বাত্রি দশটার সময তাবা ডাকাতি কবেছে---ভোব তিনটেব গাড়িতে তাবা ফিরে যাবে।"

এমন সময় কলিকাতা হইতে ট্রেন আসিযা পৌঁছিল। ছোটবাবু লণ্ঠন হাতে সেখানি 'পাস' কবিতে ছুটিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গোবর্দ্ধনবাবু একাকি বসিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন "এ ডাকাতগণকে যে কোনও উপায়ে হউক ধবিতে হইতেছে। ধরিতে পরিলে গভর্নমেণ্টেব কাছে যথেষ্ট সুনাম হইবে, চাইকি একটা রায় বাহাদুরী খেতাবও মিলিতে পারে।" অনেকদিন হইতেই রায় বাহাদুর হইবার জন্য গোবর্দ্ধনবাবুর আকাঙ্ক্ষা। নভেল লিখিযা অর্থোপার্জন যথেষ্টই করিয়াছেন, কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে তেমন মান সম্ভ্রম হইল কই ? ইঁহাব পুস্তকসংখ্যাব তুলনায অর্ধেকের অর্ধেক বহিও যাঁহার লেখেন নাই, যাঁহাদের বহি আলমাবিজাত হইয়া থাকে, বৎসবে ২৫ খানির বেশি বিক্রয় হয় না, তাঁহাদের কত মান, কত সম্ভ্রম, মাসিকপত্রে ছবি বাহির হইতেছে, কত সভার সভাপতি হইয়া তাঁহারা বক্তৃতা করিতেছেন—কিন্তু গোবর্দ্ধনবাবুকে কেহ ত ডাকিযাও জিজ্ঞাসা করে না! তিনি ইহার একমাত্র কারণ

নিদেশ কবেন—ঐ সকল লোক কেবল গ্রন্থকাব নহেন--সাহিত্যক্ষেত্রে গ্রন্থকাব এবং অপব কোনও ক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ। তাই অনেকদিন হইতেই তাঁহাব মনে হইতেছে যদি কোনও একটা সুযোগে বায বাহাদুব বা অন্তত বায সাহেবও তিনি হইতে পাবেন তাহা হইলে বোধ হয তাঁহাব এই "কেবলমাত্র গ্রন্থকাব" অপবাদটি ঘুচিযা যায—সমাজে নিজ প্রাপ্য সম্মান তিনি আদায কবিযা লইতে পাবেন। তাঁহাব মনে হইল বোধ হয এই সুযোগেই তাহা হইবে নহিলে ভগবান তাঁহাবই একখানি গ্রন্থেব মধ্যে কবিযা মূলসূত্র স্বরূপ ঐ চিঠিখানা পাঠাইযা দিবেন কেন ?

ট্রেন চলিযা গিযাছিল। ছোটবাবু যাত্রীদেব টিকিট কালেক্ট কবিযা আফিসে ফিবিযা আসিলেন। পকেট হইতে ডিবা বাহিব কবিযা পান খাইলেন, গোবর্দ্ধনবাবুকেও দিলেন। নিকটস্থ চেযাবখানিতে বসিযা বলিলেন তাই ত মশায —কাব সর্বনাশ হল কে জানে।

গোবর্দ্ধনবাবু বলিলেন দেখুন আজ এ ডাকাতদেব ধবতে হবে

ছোটবাবু বলিলেন কে ধববে ?

আপনি ও আমি।

আমি ? সর্বনাশ তাদেব কাছে বিভলভাব আছে মাথাব খুলি উডিযে দেবে ।

গোবর্দ্ধনবাবু হাসিযা বলিলেন না এখন আব তাদেব কাছে বিভলভাব নেই সে সব কাগজও লুকিযে বেখে তাবা আসবে

হলেও সে কি সোজা কথা মশায তাবা উনিশ কুডি জন লোক—

আপনি পাগল হলেন না কী আব হবে কৌশলে ধবতে হবে।'

তাব পব

তাব পব পুলিস ডেকে তাদেব হ্যাণ্ডোভাব কবে দেওযা।'

তাব পব

তাব পব সকলেব ফাঁসি হবে

তাব পব

তাব পব আবাব কী ?

ওদেব দলেব অন্যান্য লোক যাবা আছে, তাবা যে আপনাকে আমাকে কুকুব মাবা কবে মাববে।

একথা শুনিযা গোবর্দ্ধনবাবুব মনে একটু ভীতিব সঞ্চাব হইল। তিনি কযেক মুহূর্ত নীববে চিন্তা কবিলেন। কিন্তু বায বাহাদুবীব প্রলোভনই অবশেষে জযলাভ কবিল। বলিলেন -

আপনি কী বলছেন মশায ? আমবা কী মগেব মুল্লুকে বাস কবছি যে আমাদেব অমনি কুকুব মাবা কববে ? এ কার্য কবে যদি আমবা সফল হই, আমাদেব যাতে কোনও অনিষ্ট না হয সে বন্দোবস্ত গভর্নমেন্ট কববেন। তাব জন্যে লাখ টাকা যদি খবচ হয তাতেও তাঁবা পিছপাও হবেন না। আপনি কোন চিন্তা কববেন না। আসুন এ কাজে আমায সাহায্য করুন। দেখুন দেখি, এই স্বদেশী ডাকাতেবা দেশেব কী মহা অনিষ্ট কবছে। নিবীহ লোকদেব সর্বনাশ কবছে- এই কী ধর্ম, এই কী স্বদেশপ্রেম। প্রত্যেক বাজভক্ত প্রজাবই কর্তব্য

তাদেব কার্যে বাধা দেওযা, তাদেব সমুচিত প্রতিফল দেওযা।"

ছোটবাবু গালে হাত দিযা বসিযা বহিলেন, কোনও উত্তব কবিলেন না। কিযৎক্ষণ অপেক্ষা কবিযা গোবর্দ্ধনবাবু বলিলেন, "কী বলেন ? আমায সাহায্য কববেন ?"

হাত দুটি যোড কবিযা ছোটবাবু বলিলেন, "গোবর্দ্ধনবাবু, আমায মাফ কবতে হচ্ছে। আমি ছাপোষা মানুষ, অনেকগুলি কাচ্ছা বাচ্ছা, আমি এ কাজটি পাবব না। আমায বাঁচান।"

"আমি বাঁচাব কী ? আপনি যদি আমাব সাহায্য না কবেন, আমি নিজেই অবশ্য যথাসাধ্য চেষ্টা কবে দেখব। কিন্তু এ স্থান আমাব অপবিচিত, আমি একা কী কবতে পাবব ? আমাব সাহায্য না কবলেই কী আপনি বাঁচবেন মনে কবেছেন ? গভর্নমেন্ট যখন শুনবে যে আপনি আমায সাহায্য কবতে অস্বীকাব কবাতেই ডাকাতগুলো ধবা পডল না, তখন গভনমেন্ট কী ভাববে বলুন দেখি ? ভাববে আপনিও ষডযন্ত্রকাবীদেব দলেব লোক তাই সাহায্য কবেননি। উল্টে বোধ হয আপনাবই জেল হযে যাবে" এই কথা বলিযা গোবর্দ্ধনবাবু মনোযোগেব সহিত ছোটবাবুব মুখপানে চাহিযা তাঁহাব মনেব ভাব নির্ণযে সচেষ্ট হইলেন।

ছোটবাবু হঠাৎ উঠিযা গোবর্দ্ধনবাবুব পদযুগল ধাবণ কবিলেন। বলিলেন "আপনি বডলোক মহাত্মা লোক, নভেলিস্ট—এ গবীবকে দযা করুন। আমায এব মধ্যে জডাবেন না দোহাই আপনাব। যদি কিছুব জন্যে আপনাব সাহায্য দবকাব হয তা ববং অনুমতি করুন গোপনে যা পাবি তাতে প্রস্তুত আছি প্রকাশে কিছুই পাবব না।"

উঠুন—উঠুন" বলিযা গোবর্দ্ধনবাবু ছোটবাবুকে হাত ধবিযা উঠাইলেন। বলিলেন 'আচ্ছা আপনাব যদি এতই ভয তাহলে কাজ নেই। আমি একাই যা হয কবব। যা বলি তা শুনুন।"

গোবর্দ্ধনবাবু ভাবিতেছিলেন, 'সাহায্য যদি এ করে তবে বায সফল হইলে গৌববেব ভাগটা না হইলেইল' বলিলেন 'দেখুন, কাছাকাছি এমন কোনও বাডি আছে যাব মধ্যে তাদেব পুবে আটক কবতে পাব'

ছোটবাবু বলিলেন "আছে—আছে—খুব ভাল জাযগাই আছে।'

'কোথা ?"

"বাইবে চলুন দেখাই"

কিছু পূর্বে চন্দ্রোদয হইযাছিল। গোবর্দ্ধনবাবুকে প্ল্যাটফমেব প্রান্তদেশে লইযা গিযা ছোটবাবু বলিলেন, "ঐ যে মস্ত বাড়িটা দেখছেন, ওটা ধানেব আডত কববাব জন্যে বেলি ব্রাদাবেবা এই নূতন তৈবি কবেছে। মস্ত একখানা গুদাম ঘব আছে ওব মধ্যে, প্রায ৪০ ফুট লম্বা ২৫ ফুট চওডা। খালি আছে, এখনও ওদেব আডত খোলেনি। যদি কোনও কৌশলে সেই দলকে ওই ঘবখানাব মধ্যে ঢুকিযে বাইবে থেকে তালাবন্ধ কবতে পাবেন, তা' হলেই কাজ হাসিল। পুলিশ আসা পর্যন্ত ঐখানে ওবা আটক থাকবে এখন।"

গোবর্দ্ধনবাবু বলিলেন, "অনুগ্রহ কবে আপনাব লণ্ঠনটা নিযে আসুন, ঘবখানি

দেখি।"

ছোটবাবু লণ্ঠন আনিতে চলিয়া গেলেন, গোবর্দ্ধনবাবু সেই অন্ধকারে দাঁড়াইয়া কৌশল চিন্তায় ব্যাপৃত হইলেন।

ছোটবাবু লণ্ঠন লইয়া আসিলে উভয়ে গিয়া ঘরখানি দেখিলেন। একটি মাত্র দরজা। উপরে, ছাদের প্রায় কাছে, এদিকে দুইটি ওদিকে দুইটি বায়ু চলাচলের জন্য জানালা কাটা রহিয়াছে, তাহাতে এখনও সার্সি বসানো হয় নাই। গোবর্দ্ধনবাবু দেখিলেন, সেগুলি মেঝে হইতে প্রায় ২০ ফুট উচ্চে—সুতরাং ওখান দিয়া পলায়নের সম্ভাবনা নাই। বলিলেন, "এই ঠিক হবে।"

ঘরের বাহিরে আসিয়া গোবর্দ্ধনবাবু দরজাটি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। পুরু শালকাঠের ফ্রেমে আড়ভাবে সেই কাঠের ছোট ছোট তক্তা বসানো, আগা গোড়া রিভেট করা। উপরে একটি নিম্নে একটি মোটা শিকলও আছে। খুব মজবুত, সহজে ভাঙ্গিয়া বাহির হইতে পারিবে না। ছোটবাবু বলিলেন, "রেলের ভাল তালা আছে, আপনাকে দিই চলুন।"

'চলুন। আরও সব সরঞ্জাম দরকার। চলুন আপিসে বসে তার পরামর্শ করিগে।'

ফিরিবার পথে ছোটবাবু মিনতিপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "কিন্তু আমি যে আপনাকে কোনও বিষয়ে সাহায্য করছি, তা যেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না হয়, দোহাই আপনার।

না, তা হবে না।

আপিসে ফিরিয়া ঘণ্টাখানেক ধরিয়া পরামর্শ চলিল। ইতিমধ্যে পৌনে দুইটার গাড়ি আসিয়া চলিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কলিকাতা-নিবাসী সেই নিরীহ যুবকেরা আসিয়াছিল, তাহাদের বন্ধু নিতাইয়ের বিবাহে বরযাত্রী হইয়া। নিতাই ছেলেটি অনেক দিন হইতেই কিঞ্চিৎ মিলিটারি ভাবাপন্ন বঙ্গ করিয়া যখন নিজ বিবাহকে "যুদ্ধারম্ভ" এবং শ্বশুর-বাটীকে "শত্রুদুর্গ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিল, তখন স্বপ্নেও জানিত না, তদ্দ্বারা বন্ধুগণকে সে কি বিপজ্জালে জড়াইতেছে।

যে গ্রামে বিবাহ হইল তাহা স্টেশন হইতে দুই ক্রোশ দূরে অবস্থিত। বিবাহ ও আহারাদির পর বরের নিকট সকলে বিদায় গ্রহণ করিল। তাহাদের জন্য গো-যান প্রস্তুত ছিল, কিন্তু সেগুলি তাচ্ছিল্যভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া যুবকেরা পদব্রজেই স্টেশন অভিমুখে অগ্রসর হইল। বরাবর সরকারি রাস্তা, পথ ভুল হইবার আশঙ্কা ছিল না। জ্যোৎস্নালোকে গান গাহিতে গাহিতে, অতি আনন্দেই তাহারা পথ অতিক্রম করিতে লাগিল।

রাত্রি যখন দুইটা তখন স্টেশনের আলোক তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইল। একজন বলিল, "এস ভাই 'বঙ্গ আমার জননী আমার' গাইতে গাইতে যাই।" 'বঙ্গ আমার জননী আমার' গাহিতে গাহিতে তালে তালে পা ফেলিয়া, দশ মিনিটের মধ্যে তাহারা স্টেশনে পৌঁছিল।

প্ল্যাটফর্মে পৌঁছিয়া দেখিল, এক ভদ্রলোক মাথায় পাগড়ি বাঁধিয়া মলিদা গায়ে

দিয়া প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়াইয়া আছেন। একজন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ট্রেনের আর দেরী কত মশাই।"

বাবুটি বলিলেন, "আপনারাই কী আজ বিকেল পাঁচটায় গাড়িতে এসেছিলেন ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আপনাদের দলের কেউ কলকেতা থেকে ছাড়বার সময় গাড়ি মিস করেছিল ?"

"তা ত জানিনে ; তবে আরও তিনজনের আসবার কথা ছিল বটে, তারা আসেনি, হয়ত সময়মত স্টেশনে এসে জুটতে পারেনি, কেন মশাই ?"

বাবুটি বলিলেন, "তবে ঠিক হয়েছে। আপনাদেরই দলের লোক। তিনজন নয়, দুজন লোক সন্ধ্যা সাতটার গাড়িতে এসে পৌঁছেছিলেন। তার মধ্যে একজনের ভয়ানক জ্বর।"

"কোথায় ? কোথায় তারা ?"

"ঐ রেলি ব্রাদারের আড়তে তাঁরা আছেন। যিনি সুস্থ, তিনি আমাদের এসে বললেন, মশাই এই ত বিপদ, একটু আশ্রয় দিতে পারেন ? কোথায় আশ্রয় দিই, ঐ রেলি ব্রাদারের আড়ত দেখিয়ে দিলাম। বাসা থেকে তক্তপোষ, লেপ বিছানা সব পাঠিয়ে দিলাম। দু' তিনবার গিয়ে দেখেও এসেছি—খুব জ্বর, ১০৫-এর কম ত হবে না। আর, কি পিপাসা! দশমিনিট অন্তর খালি বলে জল দাও। সুস্থ লোকটির কাছেই শুনলাম, আপনারা রাত্রি তিনটের গাড়িতে কলকাতা ফিরবেন।

যুবকেরা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, "ওহে বোধ হয় শান্তি আর শৈলেন। শান্তিরই বোধ হয় জ্বর হয়েছে—তাঁর ত ম্যালেরিয়া লেগেই আছে কিনা।"

পাগড়িবাঁধা বাবুটি বলিলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ—শান্তিবাবুরই জ্বর হয়েছে। নামটি ভুলে গিয়েছিলাম। চলুন, দেখবেন।" বলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন। বলা বাহুল্য ইনি আমাদের গোবর্দ্ধনবাবু ভিন্ন আর কেহ নহেন।

যুবকেরা পশ্চাদ্বর্তী হইল। তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল, জ্বর যদি একটু কম থাকে, গাড়িতে নিয়ে যাবার মত অবস্থা থাকে, তবে নিয়েই যাব ; নইলে আমাদের সকলকেই এখানে থাকতে হবে।"

রেলি ব্রাদারের আড়তে পৌঁছিয়া বাবুটি বলিলেন, "ঐ ঘরে আছে চলুন।" দ্বারের ফাঁক দিয়া একটু একটু আলো আসিতেছিল।

দ্বার ঠেলিয়া মাথাটি ভেতর প্রবেশ করাইয়া বাবুটি বলিলেন, ঘুমুচ্ছে বোধ হয়। ফীবার মিক্সচারটায় কিছু উপকার হয়ে থাকবে। দুজনেই ঘুমুচ্ছে। পা টিপে টিপে আপনারা যান।"

যুবকগণ দেখিল, সেই লম্বা ঘরের প্রান্তভাগে পালঙ্ক পাতা রহিয়াছে। পাশে একটি টেবিলের উপর গোটা দুই ঔষধের শিশিও দেখা গেল। দেওয়ালে একটা ল্যাম্প মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছে। যুবকগণ জুতার গোড়ালি শূন্যে তুলিয়া নিঃশব্দে প্রবেশ করিতে লাগিল।

সকলে প্রায় একসঙ্গেই শয্যার নিকটে পৌঁছিল। একজন লেপের প্রান্তটি

আস্তে আস্তে উঠাইতে লাগিল। ক্রমে অনেকখানি উঠাইয়া ফেলিয়া বলিল, "কই ?"

দুই তিনজনে লেপটা টানিয়া বলিল, "গেল কোথা ?"

অপর সকলে বলিল, "সে বাবুটি কই ? তিনি গেলেন কোথা ?"

কেহ কেহ বলিল, "দেখ ত দেখ ত, বাইরে বোধ হয় আছেন।"

তিন চারিজনে দ্বারের কাছে গিয়া দ্বার টানিল, তাহা বাহির হইতে বন্ধ। চীৎকার করিয়া তাহারা বলিল, "ওহে, বন্ধ যে !"

বাকি সকলে তখন দ্বাবের নিকটে গেল।—সকলেই দ্বার ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল, দ্বার একচুলও নড়িল না।

সকলেরই মনে তখন একটু ভয় হইল। কেহ কেহ বলিল, "ওহে কুঞ্জ—এ কী ব্যাপার ?"

কুঞ্জ বলিল, "কিছুই বুঝতে পারছিনে। আমাদের এ রকম করে বন্ধ করলে কেন ? লোকটাব উদ্দেশ্য কী ?"

অভয় বলিল, "একবার ডেকে দেখা যাক।" বলিয়া সে দরজার কাছে মুখ বাখিয়া চীৎকাব কবিতে লাগিল, "ও মশাই ? ও পাগড়িমাথায বাবুটি, বলি শুনছেন ? দোরটা বন্ধ কবে দিলেন কেন ? খুলে দিন খুলে দিন।"

একে একে দুইয়ে দুইয়ে তখন তাহাবা এই প্রকার ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি কবিতে লাগিল কিন্তু কোনই ফল হইল না। কেহ কেহ তখন হতাশ হইয়া মেঝেব উপর বসিয়া পড়িয়াছে।

অবনী বলিল, "ওহে, গতিক ভাল নয়। এর মধ্যে বন্ধ থাকলে প্রাণে মারা যাব যে। এ মজবুত কবাট ভাঙ্গা যাবে না। ঐ ল্যাম্পটা নিয়ে এস। ওর তেলটা কবাটের গায়ে মাখিয়ে আগুন ধরিয়ে দাও। কবাট পুড়িয়ে ফেল।"

কুঞ্জ বলিল, "সর্বনাশ ! তা হলে ধোঁয়ায় শেষকালে দমবন্ধ হয়ে মারা যাব যে। জানালা নেই—শুধু ছাদের কাছে ছোট ছোট ঐ দুটো ভেন্টিলেটাব, তাও কাচবন্ধ বলে বোধ হচ্ছে। অন্য উপায় চিন্তা কর।"

শ্যামাপদ বলিল, "সে বোধ হয় পালিয়েছে। চেঁচামেচি কবি এস, কারু না কারু সাড়া পাব।"

কেশব বলিল, "এই শীতেব ভোরে কে আছে এখানে যে আমাদের সাড়া পেয়ে এসে আমাদের উদ্ধার করবে ?"

সকলে তখন মাথায় হাত দিয়া বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল।

অর্ধঘন্টা পরে বাহির হইতে ভস্ ভস্ করিয়া একটা শব্দ আসিল। অভয় বলিল, "ঐ আমাদের ট্রেনও বেরিয়ে গেল।"

জল্পনায় কল্পনায় আবও ঘণ্টাখানেক কাটিল। কেন যে লোকটা এরূপ ব্যবহাব করিয়া গেল, তাহাই সকলে নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া কোনও কূলকিনাবা পাইল না। অবশেষে স্থির করিল, লোকটা বোধ হয় পাগল হইবে।

কুঞ্জ ঘরের মধ্যে বেড়াইতেছিল, খাটখানি ধরিয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে সকলকে সে ডাকিয়া বলিল, "দেখ উপরে যে ঐ ভেন্টিলেটর

রয়েছে, ওতে সার্সি টার্সি বোধ হয় নাই। আমি অনেকক্ষণ থেকে চেয়ে চেয়ে দেখছি। ঐ দিয়ে ছাড়া বেরুবার আর কোন উপায় নেই কিন্তু।"

অভয় কহিল, "ও ত বিষম উঁচু, ওখানে পৌঁছান যায় কেমন করে?"

কুঞ্জ বলিল, "এ নেওয়ারের খাটখানা ভাঙ্গা যাক। খাটের কাঠ চারখানা, টেবিলের পায়া চারটে, নেওয়ার দিয়ে খুব কষে বাঁধা যাক এস। একটা মইয়ের মত হবে। দেওয়ালের গায়ে সেইটে দাঁড় করালে জানালার ও ফুটো অবধি পৌঁছান যাবে বোধ হয়।"

তিন চারিজন দেখিয়া অনুমান করিয়া বলিল, "বোধ হয়।"

কুঞ্জ বলিল, "তিনকড়ে, তুই সাইজে সবচেয়ে ছোট আছিস। পারবি উঠতে?"

তিনকড়ি বলিল, "খুব পারব। কিন্তু তারপর? ও দিকে নামব কি করে?"

"এই মই, জানালা গলিয়ে ওদিকে ফেলে, ধরে নামতে পারবিনে?"

"ওদিকে আবার জমি অবধি পেলে ত! ওদিকে যদি বেশি নিচু হয়?"

কুঞ্জ বলিল, "আগে উঠে ত দেখ্।"

তখন সেই ল্যাম্পের আলোকের সাহায্যে সকলে মিলিয়া খাটের নেওয়ার খুলিতে আরম্ভ করিল। খোলা শেষ হইলে, অনেকে মিলিয়া খাটের পায়া হইতে পাটিরিগুলো বিচ্যুত করিয়া ফেলিল। টেবিলও এইরূপে ভাঙ্গা হইল। খাটের পাটরি এবং টেবিলের পায়া নেওয়ার দিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে বাহিরে কাক ডাকিয়া উঠিল, গবাক্ষ পথে ভোরের আলো প্রবেশ করিল।

সকলে ধরাধরি করিয়া তখন সেই মইকে দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করাইয়া দিল। উহা গবাক্ষ ছাড়াইয়াও প্রায় একহাত ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে—দেখিয়া সকলের বুকে এই প্রথম কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইল।

তিনকড়ি বলি, "যদি বেরুতে পাবি, বেরিয়ে আমি কি করব? স্টেশনে যাব?"

কুঞ্জ বলিল, "না না—স্টেশনে গিয়ে কি হবে? তারাই ত আমাদের শত্রু। প্রথমে দরজায় গিয়ে দেখবি। যদি দেখিস শুধু শিকল বন্ধ আছে, শিকল খুলে দিবি। যদি দেখিস তালা বন্ধ, থানায় গিয়ে দারোগাকে সব কথা বলবি। কাছে কোথাও নিশ্চয়ই থানা আছে—দারোগা এসে আমাদের উদ্ধার করবে।"

সকলে মিলিয়া সেই মইটা ধরিয়া রহিল। তিনকড়ি অতি কষ্টে, বাঁধনের গাঁটে গাঁটে পা দিয়া, উপরে উঠিতে লাগিল। ক্রমে গবাক্ষের নিকট পৌঁছিয়া তথায় সে বসিল।

নিম্ন হইতে জিজ্ঞাসা হইল, "তিনকড়ে, কী দেখছিস?"

"মাঠ। মাঠে একটা শেয়াল চরছে।"

"মানুষ-টানুষ কাউকে দেখছিস?"

"কাউকে নয়।"

"কতখানি নিচে জমি? এ কাঠ পৌঁছবে?"

"না। অনেক নিচু। এক কাজ কর না।"

"কী?"

"নেয়াব খোল। টুকবোগুলো মুখে মুখে করে গিবো বাঁধ। দু-খাই করে পাকিয়ে দড়াব মত কর। একটা মুখ আমায় দাও। সেটা আমি নিচে নামিয়ে দিই। আর একটা মুখ তোমবা সকলে মিলে ধবে থাক। আমি ওদিকে নেমে পড়ব এখন।"

সকলে বলিল."বেশ বুদ্ধি কবেছ—বাঃ।"

তখন সেই আঠাবো জোড়া হাত, নেওয়াব খুলিতে, বাঁধিতে এবং পাকাইতে লাগিযা গেল। কুড়ি মিনিটের মধ্যে সমস্ত প্রস্তুত।

নিম্ন হইতে সকলে বলিযা দিল, "আগে গিয়ে দেখ্ দরজায় খালি শিকল বন্ধ আছে না তালা দেওযা আছে। যদি তালা দেখিস, এসে নিচে থেকে আমাদের বলবি। যত শীঘ্র পাবিস থানায যাবি—গিয়ে দারোগাকে সব কথা বলে এখানে নিয়ে আসবি।"

"আচ্ছা, আমি নামলাম।" বলিযা, দড়ি ধরিয়া জানালাব ভিতর দিযা তিনকড়ি নিজেকে গলাইযা দিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

প্রাণভয়ে ছোটবাবু. অর্দ্ধঘণ্টা পূর্বেই চুপি চুপি আসিযা নিজেব ডুপ্লিকেট চাবি দিযা তালা এবং শিকল খুলিযা দিযা গিযাছিলেন। যুবকেবা কেহই তখন দ্বারের কাছে ছিল না. কোনও শব্দ পায নাই। ছোটবাবু ভাবিযাছিলেন, অনতিবিলম্বেই ইহাবা জানিতে পাবিবে এবং দ্বাব খোলা পাইয়া পলাযন কবিবে—তাহা হইলে ভবিষ্যতে আব 'কুকুবমাবা' হইবাব আশঙ্কা থাকিবে না।

দরজা খুলিয়া দিযা ছোটবাবু আবার আপিসে ফিরিয়া গেলেন। দেখিলেন, গোবর্দ্ধনবাবু সেই লম্বা টেবিলখানার উপর খানকতক লাইন ক্লিযার বহি মাথায় দিযা ঘুমাইতেছেন। ছোটবাবু ডুপ্লিকেট চাবিটি লুকাইযা বাখিযা, বসিয়া আপনার কাজ করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পবে গোবর্দ্ধনবাবু একটু নড়িয়া চড়িয়া উঠিলেন। মলিদা হইতে মুখ বাহিব কবিযা বলিলেন, "ভোব হয়েছে যে। থানায় লোক পাঠালেন?"

ছোটবাবু বলিলেন, "না. এক বেটা খালাসিকেও দেখতে পাচ্ছিনে।"

"আমি নিজেই যাব না কী? থানা কতদূর এখান থেকে?"

"এক মাইল হবে।"

"আচ্ছা মশাই, এক কাজ কবি না কেন? থানায় খবর না পাঠিয়ে, ববং কলকাতায একখানা টেলিগ্রাম কবে দিই, পুলিসের ইনস্পেক্টব জেনারেলেব নামে। মিলিটাবি পুলিশ নিয়ে, একবাবে বন্দুক-টন্দুক নিয়ে তারা আসুক। এ সব স্থানীয় পুলিশকে বিশ্বাস নেই মশায়। আমি যে এত কষ্ট করে ধবলাম, দারোগা নিজে নাম নেবার জন্যে শেষে হয়ত আমায় আমলই দেবে না। টেলিগ্রাম একখানা করে দিই, কী বলেন?"

"সে মন্দ নয়। বেশ ত, আপনি বসে টেলিগ্রাম লিখুন, আমি ততক্ষণে বাসায় গিয়ে আপনার চায়েব জোগাড় কবে আসি।"

"আঃ—এমন সময় এক পেয়ালা গরম চা পেলে ত বেড়ে হয় মশায় ! একে এই শীত, তাতে সমস্ত রাত্রি জাগরণ !"

ছোটবাবু বাসায় গেলেন। গোবর্দ্ধনবাবু কাগজ কলম লইয়া টেলিগ্রাম লিখিতে বসিলেন। অনেক কাটকুট করিয়া শেষে মুসাবিদাটা এই প্রকার দাঁড়াইল—

"আমি কার্যবশত এ অঞ্চলে আসিয়া অদূরে কোনও গ্রামে একটি ভীষণ স্বদেশী ডাকাতি হইয়াছে জানিতে পারিয়া অনেক কষ্টে এবং কৌশলে উনিশ জন ডাকাইতকে ধৃত করিয়া একটা ঘরে তালা বন্ধ করিয়া রাখিয়াছি মিলিটারি পুলিশ লইয়া শীঘ্র আসুন।

গোবর্দ্ধন দত্ত

মুসাবিদাটি দুইতিন বার পড়িয়া, গোবর্দ্ধনবাবু অবশেষে নিজ স্বাক্ষরের নিম্নে লিখিয়া দিলেন "বেঙ্গলি নভেলিস্ট"—বাঙ্গালা ঔপন্যাসিক। দুইটি উদ্দেশ্য ছিল—ইন্‌স্পেক্টব জেনারেল সাহেব মনে না করেন যে কোন দায়িত্বজ্ঞানহীন লোক এই টেলিগ্রাম পাঠাইতেছে দ্বিতীয়ত, কে ধবাইয়া দিল সে সম্বন্ধে ভবিষ্যতে কোনও গোলযোগ না হয়।

এই সময় বাহিরে গোবর্দ্ধনবাবু অনেক লোকেব কোলাহল ও জুতার আওয়াজ শুনিয়া, টেলিগ্রামখানি হাতে করিয়া কৌতূহলবশত বাহিরে গেলেন।

যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল।

সেই তাহারা—সেই দল—কাঁধে তাহাদের খাটভাঙ্গা টেবিলভাঙ্গা বড় বড় কাঠ। একজন বলিয়া উঠিল, "ঐ রে, পাগড়ি মাথায় ঐ শালা !"

গোবর্দ্ধনবাবু বুঝিলেন, তাঁহার আসন্নকাল উপস্থিত। কিন্তু প্রাণ বড় ধন। সেটা বাঁচাইবার জন্য একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে হয়।

সুতরাং তিনি ছুটিলেন। 'ডাকাইত'গণও, "ধর্ শালাকে ধর" বলিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে লাগিল। গোবর্দ্ধনবাবু কিয়দ্দূর ছুটিয়া, প্ল্যাটফর্মের তারের বেড়া টপ্‌কাইয়া, মাঠ, দিয়া জঙ্গল দিয়া প্রাণপণে ছুটিলেন। গাছের কাঁটায় তাঁহার কাপড় ছিঁড়িল, গা ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল, তথাপি তিনি ছুটিলেন। একপাটি জুতা খুলিয়া পথে পড়িয়া রহিল, একপায়ে জুতাসুদ্ধ তিনি ছুটিলেন। ক্রমে দ্বিতীয় জুতাপাটিও খুলিয়া পড়িল, তথাপি ছুটিলেন। পায়ে কাঁটা ফুটিতে লাগিল, পাথরকুচি বিঁধিতে লাগিল—ক্রমে তাঁহার গতি মন্দ হইয়া আসিল। অবশেষে হাঁফাইতে হাঁফাইতে একস্থানে বসিয়া পড়িলেন। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, ঘন জঙ্গল। কান পাতিয়া বহিলেন, ডাকইতগণ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া আসিতেছে কি না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন কিন্তু কাহারও কোন সাড়াশব্দ পাইলেন না।

মনে মনে তখন গোবর্দ্ধনবাবু ভাবিলেন, স্টেশনে উহারা বেশিক্ষণ অপেক্ষা করিবে না, কারণ নিজেদের প্রাণের ভয় ত আছে। তাই ঘণ্টা দুই সেখানে বসিয়া থাকিয়া তিনি ধীরে ধীরে বাহির হইলেন। পা কাটিয়া ব্যথা হইয়াছে, খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চলিতে লাগিলেন। পথ ভুলিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া বেলা ৯টার সময়

স্টেশনে উপস্থিত হইলেন।

ডাকাইতগণ কাহাকেও কোথাও দেখিতে পাইলেন না। অনুসন্ধানে জানিলেন, ছোটবাবু বাসায় গিয়াছেন। বাসায় গিয়া ছোটবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

ছোটবাবু হাসিয়া বলিলেন, "কী কোথায় ছিলেন এতক্ষণ? ডাকাতরা আপনাকে খুঁজছিল যে।"

গোবর্দ্ধনবাবু নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় গেল তারা?"

"তারা এতক্ষণ কলকাতায় পৌঁছে গেছে।"

ছোটবাবু তখন যুবকগণের নিকট বাস্তবিক যাহা শুনিয়াছিলেন,—তাহাদের বরযাত্র যাওয়া প্রভৃতি—তাহা বর্ণনা করিলেন।

গোবর্দ্ধনবাবু বলিলেন, "আচ্ছা কী করে বেরুলো তারা?"

ছোটবাবু এইবার কল্পনার সাহায্য গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "সে মশায় আশ্চর্য কৌশল! সাতটার ট্রেনে তারা চলে গেলে, আড়তে গিয়ে দেখলাম কিনা বাইরে তালা যেমন বন্ধ ছিল তেমনি রয়েছে। খাট ভেঙ্গে, নেয়ার খুলে তারই মই তৈরি করেছে, করে সেই জানলার ফুটোয় উঠে, একে একে টুপ্ টুপ্ করে লাফিয়ে পড়েছে। উঃ—কী কৌশল, কী সাহস!"

গোবর্দ্ধনবাবু কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "দেখুন, তারা ডাকাতই বটে, বিয়ের বরযাত্রী নয়। বরযাত্রী এসেছিল এটা আপনাকে মিথ্যে করে বলে গেছে। যা হোক, আমার নামটাম তাদের কাছে বলেন নি তো?"

'আরে রামঃ! আমাকে অনেকবার করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলে বটে, কিন্তু আমি বললাম, "মশায়, কতলোক আসছে কতলোক যাচ্ছে, কতলোকের খবর রাখব বলুন! তবে হ্যাঁ, মলিদাচাদর গায়ে, মাথায় পাগড়ি জড়ানো একটা লোককে প্ল্যাটফর্মে রাত্রে দেখেছিলাম বটে। ঐ যা বলছেন আপনারা—বোধ হয় প৷ :ল-টাগল হবে।"

গোবর্দ্ধনবাবু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "নামটি আমার বলেননি যে, এইটি ভারি উপকার করেছেন। ফর যদি তারা, কী তাদের দলের লোক, এসে আমার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে, তবে দোহাই আপনার, বলবেন না।" বলিয়া গোবর্দ্ধনবাবু ছোটবাবুর হাত দু'খানি চাপিয়া ধরিলেন।

ছোটবাবু বলিলেন, "ক্ষেপেছেন, সে কী আমি বলি? জিভ কেটে ফেললেও না।"

ছোটবাবুর বাসাতেই স্নানাহার করিয়া, দ্বিপ্রহরের গাড়িতে গোবর্দ্ধনবাবু কলিকাতা রওনা হইলেন।

পরদিন ডাকেই ছোটবাবু একটি বৃহৎ বুক-প্যাকেট পাইলেন—গোবর্দ্ধনবাবু তাঁহাকে নিজ গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণ একসেট উপহার পাঠাইয়াছেন। প্রত্যেক পুস্তকে উপহারের কথা লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন, "আপনার চিরকৃতজ্ঞ গোবর্দ্ধন।"

[শ্রাবণ ১৩২৩]

প্রেম ও প্রহার

পদ্মাতীরবর্তী বায়গঞ্জনামা এক পল্লীগ্রামে একটি খড়ে ছাওযা মৃৎকুটীরেব দাওয়ায় বসিযা, এক দিন বেলা ৮টাব সময় স্বামীস্ত্রীতে নিম্নলিখিত প্রকার দাম্পত্যালাপ হইতেছিল।

ভজহরি গোপ মুখ হইতে হুঁকা নামাইযা, চোখ ঘুবাইয়া উচ্চস্ববে বলিল, "খপর্দার মাগি, মুখ সামলে কথা কোস্, নইলে জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেবো।"

মোক্ষদাসুন্দরী স্বর আর এক পর্দা তুলিয়া উত্তব দিল, "ঈস্! বাগ দেখ পুরুষের! জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেবেন! জুতো পাবি কোথা, তাই শুনি? বাপেব জন্মে জুতো কখনও পায়ে দিয়েছিস রে মিনসে?"

দন্ত খিচাইয়া মিনসে চিৎকার কবিযা উঠিল, "চোপ রও হারামজাদী শূয়রকে বাচ্ছি! তুই আমার বাপ তুল্লি, এত বড আস্পর্দ্ধা তোর?"

মোক্ষদা একটু দূরে সরিয়া বসিয়া বলিল, "তুলেছি তুলেছি। ঝাঁটা তুলিনি, এই তোর ভাগ্যি!"

"তোল্ না ঝাঁটা, তোর ক'গাছা ঝাঁটা আছে, আমি দেখি একবার। ঘুঁটে কুড়ুনীর বেটিকে বিযে ক'রে এনে রাজার হালে রেখেছি, তুই আমায় ঝাঁটা দেখাবি বৈ কি! নইলে আর কলিকাল বলেছে কেন? হায় রে!"

মোক্ষদা হাত উল্টাইয়া ব্যঙ্গভরে বলিল, "মরি মা মশারি ছিঁড়ে! কি আমার নাজার হালে নেখেচেন গো। আমি নোকের বাড়ি ধান ভেনে, বাসন মেজে, উঠোন ঝাঁট দিয়ে যাই দুটো আনি, তাই গুবুর গুবুর চলে; নইলে ঐ বাকর কি দিয়ে ভরাতিস্ বল্ দেখি? খেটে খেটে গতর আমার জল হয়ে গেল, উনি

আমায বাজাব হালে বেখেচেন। যে পুরুষ পয়সা বোজগাব কবতে জানে না তাব অত তেজ কেন?"

ভজহবি বলিল, "নাঃ— আমি কি আব পযসা বোজগাব কবতে জানি? যাঃ জানিস তুই! আমি গেল বছব শ্যামপুবে বাবুদেব বাড়ি খানসামাগিরি কবতে যাইনি? আমাব খোবাক পোশাক ও মাইনে হযনি? তখন কেঁদে কেটে অনর্থ কবেছিলি কেন? 'ওগো, আমি তোমায ছেড়ে থাকতে পাবব না তুমি চাকবি ছেড়ে দিযে বাড়ি এস, যা জুটবে তাই দুজনে দুমুঠো খাব।' কে বলেছিল বে মাগী?— নাঃ আমি বোজগাব কবতে জানিনে! আমাব মত হুঁসিযাব খানসামা এ অঞ্চলে ক'টা আছে শুনি? এ পাড়াগাঁযে আমাবে কদব ত কেউ বোঝে না, কাজেই বিষ হাবিযে ঢোঁড়া হযে ব'সে আছি। —বলিযা ভজহবি কযেক টান তামাক টানিযা আবাব আবম্ভ কবিল—' আব ওও বলি —বাড়িতে কি আমি বসেই থাকি? তুই খাটিস আব আমি খাটিনে? তুই দুটো খুদকুড়ো যা হয নিয়ে আসিস বটে, কিন্তু আমি মাছ ধ'বে না আনলে খেতিস কি দিযে বল দেখি? এদিকে মাছ না হ'লে নোলা যে একবাবে খাবি খায একটি গেবাস ভাত মুখে ওঠে না। মনে কবি খোঁটা দেবো না তা, তোব স্বভাবেব গুণে দিতে হয।"—বলিযা ভজহবি ভুড়ুক ভুড়ুক কবিযা আবাব তামাক টানিতে লাগিল।

মোক্ষদা দেওযালেব কাছে সবিযা বসিযা পা দুইটা ছড়াইযা দিযা নিজ হাঁটু দুইটিতে সকরুণভাবে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিল, "ন্যাকা মিনসেব ন্যাকামি দেখে আব বাঁচিনে! ভাবি খোঁটাব কাজ কবেছেন কি না! মাছ ধ'বে আনেন তবেই ত সংসাবেব সকল দুঃখই ঘুচে গেল। কাল থেকে আমাব শবীলটে খাবাপ, গাযে গতবেব ব্যথায ম'বে যাচ্ছি, বল্লাম মুখুয্যেদেব বাসন ক'খানা মেজে দিযে আয না। তাতে অমনি বাবুব অপমান হ'ল। আঁা, আমি পুরুষমানুষ হযে বাসন মাজবো?' আমি বল্লাম 'যে পযসা বোজগাব কবতে পাবে না, সে আবাব পুরুষমানুষ কিসেব? এই ত বলেছি! এতেই অমনি জুতিযে আমাব মুখ ছিঁড়ে দিতে এলেন। এমন নোকেব হাতেও আমি পড়েছিলাম মা গোঃ—উঠতে বসতে আমায নাতি ঝাঁটা মাবে।"—বলিযা মোক্ষদা চক্ষে অঞ্চল দিযা কাঁদিতে আবম্ভ কবিল।

ভজহবি তামাক খাইতে খাইতে, স্ত্রীব পানে আড চোখে আড চোখে চাহিতে লাগিল। স্ত্রীব আঁখি-জলে তাহাব পৌরুষগব টলমল কবিতে লাগিল, বুঝি বা ভাসিযাই যায! কান্না থামে না দেখিযা বলিল, 'অত কান্না হচ্ছে কিসেব জন্যে? তোকে মাবিও নি কিছুই না, দুটো মুখেব কথা বলেছি বৈ ত নয! যাচ্ছি না হয, বাসনগুলো মেজে দিযে আসছি। ও, কাঁদতে হবে না, ওঠ।"

হুঁকা দ্বাবেব কোণে ঠেকাইযা বাখিযা, ভজহবি কাছে গিযা স্ত্রীব মুখ হইতে তাহাব হস্ত ও অঞ্চল অপসাবিত কবিযা লইযা নিজ কোঁচাব খুঁটে তাহাব চক্ষু মুছাইযা দিল। মিষ্ট কথায তাহাকে সান্ত্বনা কবিযা মুখুয্যে বাড়ি যাইবাব জন্য প্রস্তুত হইল।

মোক্ষদা তখন বলিল, "থাক, তোমায আব যেতে হবে না, আমিই গিযে বাসন ক'খানা মেজে দিযে আসছি। যতক্ষণ শবীলে শক্তি আছে, ততক্ষণ কবি, তাব

পর যা হয় হবে।"

ভজহরি বলিল, "তোর গায়ে গতরে ব্যথা, নাই বা গেলি তুই, আমিই যাচ্ছি। তুই এই রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে একটু শুয়ে থাক্। বাসন মেজে দিয়ে, গিন্নী-মা'র কাছ থেকে আমি বরঞ্চ একটু তার্পিন তেল চেয়ে আনবো, তোকে বেশ ক'রে মালিস ক'রে দেবো, ব্যথাটা অনেক কমবে তা হ'লে।"

স্বামী-স্ত্রীতে এইরূপ কলহ নিত্যই চলিত। মাঝে মাঝে কিলটা চড়টা চাপড়টাও যে না চলিত, এমন নয়। তবে শাস্ত্র ত মিথ্যা হইবার নহে—দম্পতির কলহ অবশেষে লঘু ক্রিয়াতেই পরিণত হইত বটে।

২

উপরে বর্ণিত ঘটনার দিন পনেরো পরে, এক দিন উভয়ের কলহ একটু সাংঘাতিক আকার ধারণ করিল এবং পূর্ব পূর্ব বারের ন্যায় লঘুক্রিয়ায় পরিণত হইল না।

মোক্ষদা দুঃখধান্দা করিয়া দুই চারি পয়সা যাহা আনিত, তাহা হইতেই বাঁচাইয়া কিছু সঞ্চয় করিবার চেষ্টা করিত। সেই সঞ্চিত অর্থ কোথায় লুকানো থাকিত, তাহা ভজহরির অজ্ঞাত ছিল না। এক দিন স্ত্রীর অনুপস্থিতিকালে, সে সেই গোপনীয় স্থান হইতে অর্থ অপহরণ করিয়া, ছিপে লাগাইবার জন্য একটি পিতলের হুইল কিনিবার অভিপ্রায়ে দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী শহরে চলিয়া গেল।

হুইল কিনিয়া সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরিয়া, পুকুরঘাটে গিয়া হাত-পা ধুইয়া আসিয়া এক ছিলিম তামাক সাজিয়া ভজহরি পথশ্রম অপনোদন করিতেছিল, এমন সময় মোক্ষদা দত্তদের গোহালে সাঁজাল দিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিল। টাকা চুরি গিয়াছে, ইহা সে পূর্বেই জানিতে পারিয়াছিল এবং সন্দেহ ঠিক লোককেই করিয়াছিল। ফিরিয়া কুলঙ্গির উপরে সেই নূতন চক্‌চকে হুইলটি দেখিবামাত্র মোক্ষদার মুখ আগ্নেয়গিরির ন্যায় বচনাগ্নি উদগিরণ আরম্ভ করিল! অপর পক্ষও নীরব রহিল না। অবশেষে রাগের বশে ভজহরি তাহার হুঁকা হইতে জ্বলন্ত কলিকা খুলিয়া লইয়া মোক্ষদার মুখ লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া মারিল। আগুন মোক্ষদার মুখ দগ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া তাহার বস্ত্র ও গাত্রে ছড়াইয়া পড়িল। আগুন ঝাড়িয়া ফেলিয়া মোক্ষদা উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া, ভজহরির হাত হইতে তাহার হুঁকাটা কাড়িয়া লইয়া তদ্দারা সজোরে তাহার মস্তকে প্রহার করিল। হুঁকার খোলটা চুরমার হইয়া গেল; জাঠ মোক্ষদার হাতেই রহিল। বাপ্ বলিয়া ভজহরি মাথায় হাত দিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল। তখন সেই জাঠ দিয়া মোক্ষদা তাহার পিঠে পটাপট ঘা কতক বসাইয়া দিয়া, একটু সরিয়া, চালের খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে লাগিল। এইবার ভজহরি কী ভাবে তাহাকে আক্রমণ করিবে, এবং ঐ আক্রমণ কী উপায়ে সে ব্যর্থ করিতে পারিবে, ইহাই অবধারণ জন্য সে সতর্ক হইয়া রহিল।

ভজহরি কিন্তু তাহাকে আক্রমণ করিল না। উভয় হস্তে মাথাটি চাপিয়া ধরিয়া উহু উহু করিতে করিতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। ধীরে ধীরে দাওয়া হইতে

উঠানে নামিল ; কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "দাঁড়া শালী হারামজাদী ; তুই আমার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিস, আমি চল্লাম থানায় লালিস করতে। তিনটি বচ্ছর তোকে যদি আমি জেল না খাটাই ত আমি গয়লার ছেলেই নই।" —বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

ভজহরি চলিয়া গেল, মোক্ষদা কিছুক্ষণ পূর্ব্ববৎ দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে লাগিল। ক্রমে তাহার শ্বাসযন্ত্র সুস্থ হইলে, ধীরে ধীরে সেইখানে বসিয়া পড়িল। বসিয়া ভাবিতে লাগিল, "সত্যিই মিন্‌সের মাথা ফেটেছে না কি ? হুঁকোর খোলের ঘায় কখনও মাথা ফাটে ?—ধেৎ ! ও সব মিনসের ঢঙ—ঢঙ ! কিন্তু গেল কোথা ? সত্যিই কি থানায় গেল না কি ? হুঁঃ—থানায় আর যেতে হয় না। থানা প্রায় এখানে ? দুকোশ দূর। এই রাত্তিরে সে আবার থানায় যাবে, তুমিও যেমন ! দেখ না, এখনই ফিরে আসবে বোধ হয়।"

মনকে এই প্রকারে প্রবোধ দিয়া মোক্ষদা গৃহকার্যে আত্মনিয়োগ করিল। কাজ করে, আর বাহিরে চাহিয়া চাহিয়া দেখে, স্বামী ফিরিল কি না। কাজ শেষ হইয়া গেল, জ্যোৎস্নাভরা উঠানের পানে চাহিয়া মোক্ষদা চুপ করিয়া রোয়াকে বসিয়া রহিল। রাত্রি এক প্রহর হইল, দেড প্রহর হইল, কৈ, স্বামী ত ফেরে না !

তখন মোক্ষদা স্থির করিল, নিশ্চয়ই মিন্‌সে থানায় গিয়েছে। মনে একটু রাগ হইল, ভযও হইল। 'সেপাই' আসিয়া সত্যই কি তবে তাহাকে থানায় ধরিয়া লইয়া যাইবে ? মোক্ষদা উঠিয়া সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া আসিল।

ক্রমে তাহাব ঘুম পাইতে লাগিল, অত্যন্ত ক্ষুধাও বোধ হইতে লাগিল। একবার ইচ্ছা হইল, স্বামীর জন্য ভাত চাপা দিয়া রাখিয়া নিজে আহার করে। আবার ভাবিল, না, থাক, যদি আমায় ধরাইয়া দিবাব জন্য সিপাই সঙ্গে করিয়া আনে, আসিয়া দেখুক, যে স্ত্রীর সহিত সে এমন ব্যবহাব করিল, সে কিরূপ পতিব্রতা, স্বামীর খাওয়া হয় নাই বলিয়া নিজে উপবাসী আছে। তাই সে না খাইযা, রোয়াকে আঁচল বিছাইয়া শুইল এবং ক্রমে নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

মোক্ষদাব যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন গভীব রাত্রি, চন্দ্র অস্ত গিয়াছে, শেযাল ডাকিতেছে। তাহার বিশ্বাস, শেযালেরা প্রহরে প্রহরে একবার কবিয়া ডাকে—রাত্রি কি এখন দ্বিতীয় প্রহর, না তৃতীয় ? ক্ষুধার যেরূপ প্রাবল্য, তৃতীয় প্রহর হওয়ারই সম্ভাবনা। থানার লোকে সম্ভবত স্বামীকে বলিয়াছে, এত রাত্রে গিয়া আর কি হইবে, তুই এইখানে শুইয়া এখন ঘুমা, কা'ল সকালে তখন তোর বউকে ধরিতে যাইব। কা'ল বেলা এক প্রহর আন্দাজ সে সিপাহী লইয়া নিশ্চয়ই আসিবে। মোক্ষদা উঠিয়া, মুখে হাতে জল দিয়া, স্বামীর জন্য ভাত তরকারী ঢাকা দিযা রাখিয়া, অবশিষ্টাংশ নিজে লইয়া আহারে বসিল। মাছের চচ্চড়ি খাইতে খাইতে তাহার মনে হইল, "আমি মাছ খেতে ভালবাসি বলেই বড় বড় মাছ ধ'রে আমায় খাওয়াবে বলেই সে হুইল কিনে এনেছিল গো ! তার জন্যে তাকে অমন ক'রে 'লাঞ্ছনা' করা আমার ভাল হয় নি।"—তাহার পর মনে হইল, "আমি ত খাচ্চি, থানায় তাকে তারা খেতে টেতে দিয়েছে কি না, কে জানে ! হয় ত না খেয়েই সেখানে প'ড়ে আছে।" এই কথা মনে হওয়ায় মোক্ষদার চক্ষু দুইটি সজল হইয়া উঠিল।

যাহা হউক, আহার সমাপ্ত করিয়া, মুখ হাত ধুইয়া, রোয়াকে চুপ করিয়া সে বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পবে ঢুলিতে লাগিল ; তাহার পর শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

৩

প্রাতে উঠিয়া নিজ কুটীরেব 'বাসিপাট' সারিয়া, মোক্ষদা পরগৃহে তাহার নির্দিষ্ট কাজকর্মগুলি কবিবার জন্য বাহির হইল। সে সব সারিয়া বাড়ি ফিরিতে প্রায় দেড প্রহর বেলা হইল। আসিবার সময তাহার মনটা কেমন ভয় ভয় কবিতেছিল, খুব সম্ভব বাড়ি গিয়া দেখিবে যে, সিপাহী সহ স্বামী ফিরিয়া আসিয়া তাহার অপেক্ষায় বসিযা আছে। তাই বাড়িতে সহসা প্রবেশ না করিয়া, দরজার ফাঁক দিয়া উঁকি দিযা দেখিল,—কৈ, উঠানে বা রোযাকে কেহই ত নাই!

মনিববাড়ি হইতে মোক্ষদা দুইটি বেগুন আনিয়াছিল ; ঘব খুলিয়া সে দুটি যথাস্থানে বাখিয়া দিল। অন্য দিন এই সময়ে সে উনান ধরাইয়া রন্ধনকার্যে ব্যাপৃত হয। আজ আব বাঁধিবাব জন্য তাহার কোনও ব্যস্ততা দেখা গেল না। "আমি ওব জন্যে বেঁধে বেড়ে বাখি, আর উনি সেপাই এনে আমায ধরিয়ে দিয়ে আবাম ক'বে ভাত খেতে বসুন! হ্যাঁঃ—বাঁধবে না আব কিছু! অত সুখে আর কাজ নেই!" সুতবাং মোক্ষদা উনান ধবাইল না।

বেলা ক্রমে দুই প্রহব হইল, আড়াই প্রহব হইল ; না স্বামী, না সেপাই, কৈ, কেহই ত আসে না! এখন মোক্ষদাব মনে হইল, তবে কি সে থানায় যায নাই? থানায় যদি না গেল, তবে গেল কোথায? বিবাগী হইযা কোনও দিকে চলিয়া গেল না কি? যদি আর ফিবিয়া না আসে?

এই সব ভাবনা-চিন্তায দিবা অবসান হইল। এতক্ষণ পর্যন্ত মোক্ষদা কিছুই খায় নাই। স্বামীব জন্য গত বাত্রে যে ভাত ঢাকা দিযা বাখিযাছিল, তাহাই বাহিব কবিয়া খাইতে বসিল। ভাবিল, স্বামী যদি আসে তাহাকে চারিটি গরম ভাত রাঁধিয়া দিবে।

ভাত বাঁধিতে হইল না! স্বামী ফিবিল না! কাঁদিয়া কাটিয়া মোক্ষদা শেষে ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া মোক্ষদা ভাবিল, 'নাঃ, এ কোন কাজের কথা নয়। থানায় গিয়ে খবব নিতে হচ্ছে সেখানে সে আমার নামে নালিশ করতে গিয়েছিল কি না।' তখনই ঘব দ্বার বন্ধ করিয়া, কিছু পযসা আঁচলে বাঁধিযা থানা অভিমুখে যাত্রা করিল।

থানায় গিয়া শুনিল, কোনও গ্রামের কোনও গোয়ালা সে পর্যন্ত নিজ স্ত্রীর নামে নালিশ করিতে আসে নাই। মোক্ষদা কাতর স্বরে বলিল, "তবে দারোগা বাবু, আমাব স্বামী গেল কোথায়?" কবে এবং কি অবস্থায় তাহার স্বামী অন্তর্ধান করিয়াছে, সমস্ত মোক্ষদার মুখে শুনিয়া দারোগা বাবু হুকুম দিলেন, 'ওরে, সেই কাপড়ের পুঁটুলিটা মালখানা থেকে বের কব ত!"

পুঁটুলি খোলা হইলে দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ ধুতি, এ গামছা তুই

চিনিস ?"

মোক্ষদা শঙ্কিত হইয়া বলিল, "এ ত তারই ধুতি, তারই গামছা। তবে সে কোথায় গেল দারোগা মশাই ?"

দারোগা জানাইলেন গতকল্য, প্রাতে একজন মাঝি আসিয়া এই ধুতি গামছা দিয়া গিয়াছে, এবং এজাহার করিয়াছে যে, রায়গঞ্জের ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া সে রান্নার যোগাড় করিতেছিল। রাত্রি যখন আন্দাজ এক প্রহর, তখন সে দেখিতে পাইল, কালোমত লম্বামত একটা লোক তীরে আসিয়া এই ধুতি গামছা ছাড়িয়া রাখিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। লোকটা হয় ত আত্মহত্যা করিবার জন্যই ওরূপ করিয়াছে, ইহা বিবেচনা করিয়া মাঝি নৌকা খুলিয়া জলে জলে তাহার অনেক অনুসন্ধান করিল, কিন্তু কোথাও তাহাকে ভাসিয়া উঠিতে দেখিল না। তখন সেই ধুতি, গামছা সে নৌকায় তুলিয়া রাখিয়াছিল।

ইহা শুনিয়া মোক্ষদা মূর্ছিত হইয়া সেখানে পড়িয়া গেল।

দারোগাবাবু অনেক যত্নে ও চেষ্টায় তাহার চৈতন্য সম্পাদন করাইয়া, "মৃতকের" নাম ধাম বয়স, পেশা আত্মহত্যা করিবার কারণ প্রভৃতি জানিয়া লইয়া, তাহা ডায়েরীভুক্ত করিয়া, মোক্ষদাকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে উপদেশ দিলেন।

৪

কোনও মতে স্বামীর শ্রাদ্ধ শান্তি সারিয়া মোক্ষদা ভগ্নকুটীরেই বাস করিতে লাগিল। কোনও কাজকর্ম করিতে ইচ্ছা হয় না, কেবল বসিয়া বসিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু পেট বড় শত্রু—আবার দুঃখধান্দা করিতে মোক্ষদাকে বাহির হইতে হইল। মাথায় গায়ে সে আর তেল মাখে না, রুক্ষ স্নান করে, দিনান্তে একমুঠা চাউল সিদ্ধ করিয়া খায়, খাইয়া নিজ কুটীরে দ্বার বন্ধ করিয়া শুইয়া শুইয়া কেবল কাঁদে। এখন কাঁদিয়াই তাহার সুখ।

কিন্তু গ্রামের দুষ্ট লোকে তাহার এ সুখেও বাদ সাধিল। মোক্ষদার বয়স এখনও ত্রিশ বৎসরের নিম্নেই। একাকিনী বাস করে। অনেক রাত্রে বদলোকে আসিয়া তাহার দ্বারে মৃদু মৃদু করাঘাত এবং স্তুতি-মিনতি আরম্ভ করিল। নিতান্ত অতিষ্ঠ হইলে মোক্ষদা ঝাঁটা হস্তে বাহির হইত তথাপি শান্তি নাই—ক্রমে সে উদ্বাস্ত হইয়া উঠিল।

এমন সময় একদিন ও পাড়ার কামারদের বিধবা বউ নিস্তারিণী কলিকাতা হইতে গ্রামে ফিরিয়া আসিল। সে কলিকাতায় কোনও বাবুদের বাড়ি ঝি-গিরি চাকরি করে, বোনপোর বিবাহ উপলক্ষে এক মাসের ছুটি লইয়া বাড়ি আসিয়াছে। তাহার কাছে কলিকাতার সব খবর শুনিয়া মোক্ষদার মনে হইল, বদলোকের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের এখন একমাত্র উপায়, কলিকাতায় চলিয়া যাওয়া। নিস্তারিণী তাহাকে ভরসা দিল, একটি ভাল গৃহস্থ দেখিয়া, সেখানে মোক্ষদাকে নিযুক্ত করিয়া দিবে, কোনও কষ্ট হইবে না—সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবে।

মোক্ষদা বলিল, "কিন্তু দিদি, যে ভয়ে গাঁ ছাড়লাম, সেখানেও যদি সেই ভয় থাকে ? কলকাতার লোকেরাই কি আর ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির ?"

নিস্তারিণী বলিল, "সব রকম লোকই আছে। তা তোকে এমন ভদ্র গেরস্তের বাড়ি দেখে রাখিয়ে দেবো, যেখানে সে সব আদব-বালাই থাকবে না।" মাসান্তে, দুই একখানা তৈজসপত্র এবং সামান্য গৃহোপকরণ যাহা ছিল, বিক্রয় করিয়া, ঘরে দ্বারে তালা বন্ধ করিয়া, নিস্তারিণীর সহিত মোক্ষদা কলিকাতায় চলিয়া গেল।

৫

নিস্তারিণী যে বাড়িতে চাকরি করিত, সে বাড়িতে অপর ঝি প্রয়োজন না থাকায়, মোক্ষদার জন্য সে এক জন ভদ্র গৃহস্থ পরিবারের সন্ধানে রহিল। কয়েক দিন অন্বেষণের পর ঐরূপ একটি গৃহস্থের সন্ধান পাইল। শ্যামবাজারে রামদয়াল মিত্র মহাশয়ের বাড়িতে এক জন ঝির প্রয়োজন। মিত্র মহাশয হাইকোর্টের এক জন প্রবীণ উকিল , তাঁহার পুত্রগণ সকলেই উচ্চশিক্ষিত এবং সচ্চরিত্র বলিয়া পাড়ায় খ্যাতি আছে। নিস্তাবিণী সেই বাডিতে মোক্ষদাকে লইয়া গেল।

রামদয়ালবাবুর গৃহিণী মোক্ষদাকে অল্পবয়স্কা এবং সুশ্রী দেখিয়া প্রথমে একটু আপত্তি করিয়াছিলেন। পরে যখন তাহার বৈধব্যের ইতিহাস, এবং গ্রামত্যাগের প্রকৃত কারণটা শুনিলেন, তখন সম্মত হইলেন। বাড়িতে আরও দুই জন ঝি ছিল, তন্মধ্যে একটিকে বড বধূমাতার শিশুসন্তানগুলির লালন-পালনের ভার দিয়া, মোক্ষদাকে তাহার স্থানে মায় খোরপোষ ৪ বেতনে নিযুক্ত করিলেন।

রামদয়াল বাবুর গৃহিণী বুদ্ধিমতী, মিষ্টভাষিণী, এবং দয়ামায়া প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলীর অধিকারিণী। তাঁহার সংসারে আশ্রয় পাইয়া, কোনও বিষয়ে মোক্ষদার কোনও অসুবিধা রহিল না। নিজ গ্রামে থাকিতে অন্নবস্ত্র সংগ্রহের জন্য তাহাকে যে পরিমাণ কায়িক পরিশ্রম করিতে হইত, তাহাব অপেক্ষা অনেক অল্প পরিশ্রমেই তাহার গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহ হইতে লাগিল এবং মাসে মাসে তাহার বেতনের চারিটি টাকা গৃহিণী ঠাকুরাণীর নিকট জমা হইতে লাগিল।

গৃহিণী দেখিলেন, মোক্ষদা খুব পরিশ্রম করিতে পারে, মুখটি বুজিযা আপন কাজকর্ম্মগুলি করিয়া যায়, গোয়ালার মেয়ে হইলেও ভদ্র ঘরের বিধবাদের মতই নিষ্ঠার সহিত বৈধব্য আচার পালন করিয়া থাকে ; তবে দোষেব মধ্যে রাগটা একটু বেশি। অপর দুই জন ঝিব সহিত মাঝে মাঝে সে কোন্দল করে ; গৃহিণী তখন মধ্যস্থ হইয়া, কাহাকেও বা মৃদু তিরস্কার করিয়া, কাহাকেও মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া, মিটমাট করিয়া দেন।

এইরূপে মোক্ষদা তিন বৎসর এই বাড়িতে চাকরি করিল। এক একবার তাহার ইচ্ছা হইত, কিছু দিনের ছুটি লইয়া দিনকয়েকের জন্য নিজ গ্রামে ফিরিয়া যায় ; তাঁহার ঘর-দুয়ারের এখন কি অবস্থা, তাহা দেখিয়া আসে ; কিন্তু আবার মনে হইত, আর সে শ্মশানে ফিরিয়া গিয়া লাভ কি ?

শ্রাবণ মাসে জ্বরে পড়িয়া মিত্র-গৃহিণী কিছু দিন খুব ভুগিলেন, তাঁহার দেহ অত্যন্ত দুর্বল হইয়া গেল ; দাঁড়াইলে মাথা ঘুরিয়া বসিয়া পড়েন। তাই পূজার ছুটির সময় রামদয়ালবাবু সপরিবারে মধুপুরে গিয়া গৃহিণীকে তিন মাস বায়ু পরিবর্তন করাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার এক এটর্নি বন্ধু কালীপদ বাবুও সপরিবারে মধুপুর যাইতেছিলেন,--সেখানে তাঁহার নিজ দুইখানি বাড়ি আছে, বাড়ি দুইখানি পাশাপাশি, তাহারই একখানা রামদয়ালবাবু ভাড়া লইলেন।

রামদয়ালবাবুর মধ্যম পুত্র চারুভূষণবাবু গ্রিণ্‌লে ফিওর কোম্পানীর বাড়ি কেশিয়ারী কর্ম করেন ; তাঁহার ছুটি অতি অল্পদিন মাত্র, তাই তিনি সপরিবারে বাড়িতেই থাকিবেন, অপর সকলে মধুপুরে যাইবেন স্থির হইল। ঝিয়েদের মধ্যে মোক্ষদা ও বিমলা মধুপুরে যাইবে ; কামিনী কলিকাতায় থাকিবে।

গাড়ি রিজার্ভ করা হইল। যথাদিনে রামদয়ালবাবু সপরিবারে যাত্রা করিয়া মধুপুরে পৌঁছিলেন।

এটর্নি বাবুরা তখনও পৌঁছেন নাই। বাড়িতে পূজা, পূজা সারিয়া তবে তাঁহারা বাহির হইবেন।

কয়েক দিন মধুপুরে মোক্ষদার বেশ আনন্দেই কাটিয়া গেল। গৃহিণী যখন বিকালে পুত্রকন্যাগণ সহ বেড়াইতে বাহির হইতেন, মোক্ষদাও তাঁহার সহিত যাইত। তিন বৎসরকাল কলিকাতায় গৃহমধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া, তাহার প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। খোলা মাঠে বেড়াইতে পাইয়া মোক্ষদা বড় আরাম বোধ করিল।

পূজার পর এটর্নি বাবুরা সদলবলে আসিয়া পৌঁছিলেন।

সে দিন সন্ধ্যাবেলায় গৃহিণীর সহিত বেড়াইয়া আসিয়া মোক্ষদা দেখিল, বৈঠকখানা-ঘরে তার মুনিব এবং পাশের বাড়ির এটর্নিবাবু বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। রামদয়ালবাবু বলিলেন, "আপনি তামাকখোর মানুষ ; আমাদের ত ও পাট নেই ;— আপনাকে একটা সিগারেট দিতে বলবো কি ?"— তিনি জানিতেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সুধাংশু সিগারেট ব্যবহার করিযা থাকে।

এটর্নিবাবু বলিলেন, "দরকার কি ? আমার গুড়গুড়িটা আনিয়ে নিচ্ছি।" --বলিয়া তিনি বাহিরের বারান্দার প্রান্তে 'গয়া হাঁকিলেন, "ভজা—ও ভজা !"

পাশের ঘরে মোক্ষদা বসিয়া পান সাজিতেছিল, "ভজা" নামটা শুনিবামাত্র সে কান খাড়া করিল। তার পর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, আবাব নিজ কার্যে মন দিল।

দুই তিনবার ডাকাডাকির পর ও বাড়ি হইতে সমুচ্চ স্বরে উত্তব আসিল—"আজ্ঞে !"

ও কি ? কার কণ্ঠস্বর ? মোক্ষদাব মাথার ভিতর বন্‌ বন্‌ করিয়া ঘুরিতে লাগিল।

এটর্নিবাবু হাঁকিলেন, "আমার গুড়গুড়িটে নিয়ে আয় ত ভজা !"

উত্তর আসিল, "আজ্ঞে, যাই।"

মোক্ষদার আর পান সাঁজা হইল না। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। চুনের আঙুল বস্ত্রপ্রান্তে মুছিয়া, কম্পিতপদে, দুরু দুরু বক্ষে সে বাহির হইয়া এমন স্থানে

গিয়া দাঁড়াইল, যেখান হইতে বৈঠকখানাঘবেব মধ্যভাগটি স্পষ্টরূপে দেখা যায়।

কিয়ৎক্ষণ পবেই কুণ্ডলীকৃত নললগ্ন এক প্রকাণ্ড ফবসী হস্তে এটর্ণিবাবুব ভৃত্য প্রবেশ কবিল।

তাহাব মুখেব পানে এক নজবমাত্র চাহিয়া দেখিযাই মোক্ষদাব হস্ত-পদ একেবাবে অবশ হইয়া আসিল। পড়িয়া যাইবাব আশঙ্কায় সে দুই হাতে সম্মুখেব দেওয়ালটায ভব দিয়া চক্ষু মুদ্রিত কবিল। সে ভাবে দাঁড়াইয়া থাকাও তাহাব শক্তিতে কুলাইল না, ধীবে ধীবে সেইখানে বসিয়া পড়িল।

ভৃত্যকে দেখিযা, বৈঠকখানা-ঘবে এটর্ণিবাবু বলিলেন, "কলকে কৈ বে? তামাক সেজে আনিস নি?"

ভজা বলিল, "আজ্ঞে, তা তো আপনি বলেন নি।"

এটর্ণিবাবু উকিলবাবুর দিকে ফিবিযা বলিলেন, "বেটা গযলাব বুদ্ধি দেখলেন মশাই।" ভৃত্যকে বলিলেন, "যা, তামাক সেজে নিযে আয। আব খানিকটে তামাক, গোটাকতক টিকে, দেশলাইযেব বাক্স, এই সবও নিযে আয। এবাব বুঝলি ত?'

"আজ্ঞে বলিযা—ভজহবি প্রস্থান কবিল।

বামদযালবাবু বলিলেন, 'আপনি এ বত্নটিকে পেলেন কোথায?

এটর্ণিবাবু বলিলেন "সে মশায, এক মস্ত ইতিহাস,—উপন্যাস বল্লেও চলে।'

কী বকম?'

এটর্ণি বলিতে লাগিলেন, "বছব চাবেক আগে ডিস্পেপসিযাব জন্য ডাক্তাবেবা আমাকে দিনকতক স্টীমাবে বেড়াবাব পবামর্শ দিযেছিল না? তিন মাসেব জন্যে একটা স্টীম লঞ্চ ভাড়া ক'বে পদ্মানদীব উপব আমি ঘুবে ঘুবে বেড়াতাম। একদিন সন্ধ্যাব পব ঘাট থেকে কিছু দূবে নোঙব ফেলে ডেকে ব'সে আমি তামাক খাচ্ছি চাঁদ উঠেছে, জলেব শোভা দেখছি, এমন সময দেখলাম, খানিক দূবে একটা মানুষ, একবাব জল থেকে মাথা তুলছে, আবাব ডুবছে। স্টীমাবেব দুজন খালাসীকে তখন বললাম—ওবে একটা মানুষ বোধ হয ডুবে যাচ্ছে, দেখ দেখি, যদি তোবা ওকে বাচাতে পাবিস। তাবা তখনি দড়ি-বাঁধা দুটো লাইফ বেল্ট নিযে লাফিযে পড়লো। কাছাকাছি গিযে সেই বেল্ট দুটো ছুঁড়ে লোকটাব কাছে ফেলে দিলে। একটা বেল্ট সে ধ'বে ফেললে। তাব পব খালাসীবা নানা বকম কৌশল ক'বে তাকে স্টীমাবে এনে তুললে। বাম বাম—একেবাবে উলঙ্গ ল্যাংটা, মশাই। খালাসীবা তাকে একটা লুঙ্গি পবিযে দিলে। বেটা অনেক জল খেযেছিল, আমাব সঙ্গে ডাক্তাববাবু ছিলেন, তিনি ওকে বমি টমি কবালেন, ব্রাণ্ডি খাওযালেন, ক্রমে বেটা সুস্থ হযে উঠলো। তিনিই হল ঐ ভজহবি।'

বামদযাল বাবু জিজ্ঞাসা কবিলেন, "কি ক'বে ডুবেছিল, তা কিছু বললে?"

"বললে বৈ কি। বললে আমাব 'ইস্তিবী' মাবা গেছে, সেই 'শোকে' আমি আত্মহত্যা কবছিলাম। কাপড় কী হ'ল জিজ্ঞাসা কবায বললে, 'কাপড় গামছা ডাঙায বেখে আমি জলে ঝাঁপ দিযেছিলাম। ভাবলাম, আমি ত মবছিই, ধুতিখানা

গামছাটা এখানেই ফেলে রাখি কোনও গরীবে কুড়িয়ে পেয়ে পরে বাঁচবে।

রামদয়ালবাবু বলিলেন 'অদ্ভুত।'

এটর্ণিবাবু বলিলেন অদ্ভুত বৈ কি। আমি ভাবলাম একাধারে এত পত্নীপ্রেম বিশ্বপ্রেম ত দেখা যায় না। একে হাতছাড়া করা হবে না। চাকরস্বরূপ স্টীমারেই ওকে রাখলাম। মাসখানেক পরে কলকাতায় ফিরে এলাম। তার পর ওর আমি বিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি বলেছি টাকা দিচ্ছি দেশে গিয়ে আবার বিয়ে থাওয়া করে আয়। তা বেটা কিছুতেই রাজি হয় না। বলে যার মুখে আগুন দিয়েছি তাকে যে ভুলতে পারিনি হুজুর। বিয়ে আর আমি করবো না।

রামদয়ালবাবু বলিলেন আশ্চর্য মানুষ ত।

আশ্চর্য বৈ কি।

মোক্ষদা পূর্বস্থানেই ছিল কিন্তু এ সকল কথাবার্তার একটা বর্ণও সে শুনিতে পায় নাই। মৃত স্বামীকে জীবিত দেখিয়া সে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল।

৬

মোক্ষদার সহিত ভজহরির গোপনে সাক্ষাৎ হইয়াছে কিন্তু কোনও পক্ষের মানাপমান বিষয়ে কিছুই করা হয় নাই। মোক্ষদার ভারি লজ্জা করে— ছিঃ এত দিন বিধবা ... কাবা বাবুকে ও বাড়ির এ ... আমার স্বামী ... ব্যবস্থা ... প্রমাণ কোথায় পাইবে ... বলিলে ... শুনিলেও হয়ত বিশ্বাস করিবেন না ... হয়ত ... সুশ্রী ... উপর তাহার লোভ পড়াতে ... বাড়ি করিয়া এই মিথ্যা ... উপস্থিত করিয়াছে এবং ... হাতে ... দিবেন।

এখন আর মোক্ষদা গৃহিণীর সহিত বিকালে ... বাটীর ... বেড়াইতে যাইতে ... সে স্বামীর সহিত ... সাক্ষাতের সুযোগ অন্বেষণ করে এবং মাঝে মাঝে সে সুযোগ পাইয়াও থাকে। ... বাটীর বাগানের সীমানার পশ্চাদ্ভাগে একটা ... আছে তাহার আড়ালে বসিয়া ... প্রায়ই কিছুক্ষণ ... কথাবার্তা হয়।

প্রথম দিন মোক্ষদা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল হ্যাঁগা তুই এমন কাজ কেন করতে গিয়েছিলি বল দেখি।

ভজা বলিয়াছিল থানায় যাচ্ছি বলে ... সহ ... ধার করলাম বুঝলি মুখী ... দূর ... তুই হলি আমার আপন ইস্তির ... লোক শুনলে বলবে কি ... মাছ খেতে তুই বড্ড ভালবাসিস মাছ না পেলে ধড়ফড়িয়ে মরিস তাই ভাবলাম দাঁড়া তোকে জব্দ করছি। তোকে বিধবা করে তোর মাছ খাওয়া বন্ধ করছি শালা।—এই ভেবেই ধুতি গামছা ডাঙ্গায় ছেড়ে রেখে পদ্মায় গিয়ে ঝাঁপ দিয়েছিলাম।

ধুতি গামছা ডাঙ্গায় ছেড়ে রেখে গিয়েছিলি কেন?

"গাঁয়েবই ঘাট ত! সেই ধুতি গামছা ওখানে দেখে, কেউ না কেউ চিনতে পাববে—আমাব নাস যদি ভেসে নাও ওঠে, তা হলেও বোঝা যাবে যে, জলে ডুবে আত্মহত্যে কবেছি। তবে ত তোব মাছ খাওয়া বন্ধ হবে!"

মোক্ষদা বলিল, "তোব কি বুদ্ধি বে! আচ্ছা, যখন দেখলি যে বেঁচে আছিস. তখন বাড়ি এলিনে কেন?"

"চাকবি কবছিলাম যে! ভেবেছিলাম, মাস কতক চাকবি ক'বে কিছু টাকা জমিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দেবো, আমি বোজগাব কবতে পাবি কি না। দেশে গিয়ে শুনলাম, তুইও কলকাতায় এসেছিস চাকবি কবতে। সেই অবধি কত জায়গায় যে তোকে খুঁজেছি, তাব ঠিক নেই। কাব বাড়িব ঝিকে পথে ঘাটে দেখলেই অমনি তাব পিছু নিয়েছি। জিজ্ঞাসা কবেছি, হ্যাঁগা বায়গঞ্জেব মোক্ষদা গয়লানী কোথায় ঝি-গিবি চাকবি কবে, জান কি? কেউ বলতে পাবে নি।

পবদিন বিকালে যখন কামিনীঝাড়েব আড়ালে উভয়েব সাক্ষাৎ হইল তখন ভজহবি কলাপাতায় জড়ানো একখণ্ড ভাজা মাছ বাহিব কবিল দেখিয়া মোক্ষদা জিজ্ঞাসা কবিল, "মাছ আনলি কোত্থেকে

ভজহবি বলিল 'আজ চাব বচ্ছব তুই মাছ খেতে পাসনি আহা তোব কত কষ্ট হয়েছে! তাই তোব জন্যে এনেছি।

"কোথা পেলি

"বামুন ঠাকুব আজ ভাতেব সঙ্গে যে মাছ দিয়াছিল সে মাছ না খাইয়া তোব জন্যে লুকিয়ে বেখেছিলাম নে খা। [illegible]

মোক্ষদা চাব বৎসব পবে স্বামীব প্রসাদ ভক্ষণ কবিয়া সেই খালেব জলে হাত মুখ ধুইয়া আসিয়া, আবাব গল্প কবিতে বসিল

প্রায় প্রতিদিনই উভয়েব সাক্ষাৎ হইতে লাগিল। প্রথম প্রথম [illegible] অধিক উভয়ে একত্র থাকিত না ক্রমে সাহস বাড়িয়া গেল অন্ধকাব হইয়া যাওয়াব পবও বসিয়া থাকিত

উভয়েব বিবহাবস্থাব সম্পূর্ণ বর্ণনা পবস্পবেব নিকট তাহাবা কবিয়াছে ক্রমে তাহাদেব পবামর্শ হইয়াছে যে এখন বিদেশে বিদায় চাহিলে তাহা মঞ্জুব হইবে না দুই মাস পবে কলিকাতায় ফিবিয়া উভয়ে কর্ম ত্যাগ কবিয়া দেশে চলিয়া যাইবে এবং উভয়েব সঞ্চিত অর্থে গুটিকয়েক গাভী কিনিয়া বাড়িতে বসিয়া জাতি-ব্যবসায় আবম্ভ কবিবে

প্রথম সাক্ষাতেব দশ বাবো দিন পবে একদিন যথানিয়মে যথাস্থানে দুই জনে মিলিত হইল। কলিকাতা হইতে ভজাব মনিবেব ইলিশ মাছ আসিয়াছিল। বামুন ঠাকুবেব খোসামোদ কবিয়া বেশ বড় একখানা পেটীব মাছ সেদিন ভজা সংগ্রহ কবিয়া বাখিয়াছিল। সেই মাছ বাহিব কবিয়া বলিল 'খাসা মাছ বে! যখন ভাজছিল, গন্ধে বাড়ি মাত ক'বে দিয়েছিল! কত বড় পেটিখানা তোব জন্যে এনেছি দ্যাখ দ্যাখ। আজ আমাব সাধ হয়েছে আমি হাতে ক'বে তোকে খাইয়ে দেবো। কাছে স'বে আয়, হাঁ কব।'

মোক্ষদা হাসিয়া স্বামীব কাছটি ঘেঁষিয়া বসিল। ভজা আদব কবিয়া বাম হস্তে স্ত্রীব গলাটি জড়াইয়া ধবিয়া তাহাকে মাছ খাওয়াইতে লাগিল।

কিন্তু এ দাম্পত্য লীলায় সহসা বাধা পড়িল। পশ্চাদ্দেশে কাহার প্রচণ্ড পদাঘাতে, ভজহরি হুমড়ি খাইয়া বিপুলবেগে মোক্ষদার গায়ের উপর পড়িয়া, উভয়েই ধরাশায়ী হইল। চমক ভাঙ্গিলে উভয়ে চোখ চাহিয়া দেখিল এটর্নিবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বীরেন্দ্রবাবু বীরবিক্রমে রক্তনেত্রে চাহিয়া আছেন।

তাহাকে দেখিবামাত্র মোক্ষদা এঁটো মুখে ঘোমটা টানিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং অবিলম্বে সেখান হইতে পলায়ন করিল। ভজহরিও কষ্টে সৃষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইল। বীরেন্দ্রবাবু ক্রোধকম্পিত স্বরে বলিলেন 'তবে রে হারামজাদা! ভারি যে সাধুগিরি ফলাতিস!' বলিয়া তাহার গালে ঠাস ঠাস করিয়া কয়েকটা থাপ্পড় কষাইয়া দিলেন।

ভজহরি হস্ত দ্বারা সে প্রহার রোধ করিতে চেষ্টা করিতে করিতে বলিতে লাগিল 'হুজুর মারেন কেন? ও যে আমার ইস্তিরী—আপন বিয়ে করা ইস্তিরী হুজুর'

বীরবাবু বলিতে লাগিলেন 'তোর বিয়ে করা ইস্তিরী! রে কি পাজি নচ্ছার শয়ার! সে ত কবে মরে গেছে। ও ছুঁড়িটাকে আমি কি চিনিনে মনে করেছিস? ও তো উকিলবাবুর ঝি, বিধবা মানুষ। আর বদমাইসির জায়গা পেলিনে হতভাগা গাধা? ক'দিন থেকেই আমার সন্দেহ হয়েছে, সন্ধ্যেটি হলেই তুইও দেখি এ দিকে আসিস আর ও বাড়ির ঐ ঝি হারামজাদীও এই দিকে আসে। তাই আমি তক্কে তক্কে থেকে আজ এসে ধরেছি। চল বাবার কাছে, সব কথা গিয়ে তাঁকে বলি, রাস্কেল, তিনি তোর কি শাস্তি করেন দ্যাখ।'—বলিয়া বীরেন্দ্রবাবু হাঁপাইতে হাঁপাইতে বাসার দিকে অগ্রসর হইলেন। ভজহরি কাঁদিতে কাঁদিতে কোমরটি দুই হাতে ধরিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

উভয় বাটীর লোকেরা বৈকালিক ভ্রমণ হইতে ফিরিবামাত্র কথাটি তাঁহাদের নিকট প্রচারিত হইয়া পড়িল। ভজহরি যে মোক্ষদাকে স্ত্রী বলিয়া দাবী করিয়াছে তাহাও তাঁহারা শুনিলেন। স্বগৃহিণী ও বড়বধূর নিকট মোক্ষদা কাঁদিতে কাঁদিতে সকল কথা খুলিয়া বলিল। তাঁহারা বিশ্বাস করিলেন, কিন্তু উভয় বাটীর পুরুষেরা উহা বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না।

তখন রামদয়ালবাবুর বৈঠকখানায় ভজহরির বিচারের জন্য ফুলবেঞ্চ বসিল। এটর্নিবাবু বলিলেন এর মীমাংসা ত সহজেই হতে পারে। "ওহে সুধাংশু! দুজনকে তুমি আলাদা জেরা কর না। এদের কথা যদি মিথ্যে হয় জেরায় কতক্ষণ টিকিবে?

সুধাংশুবাবু তাহাই করিলেন। মোক্ষদাকে নিজ মা'র জিম্মায় বসাইয়া রাখিয়া ভজহরিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। পদাঘাতজনিত কোমরের ব্যথায় কাতরাইতে কাতরাইতে সে আসিয়া মেঝেয় বসিল। সুধাংশুবাবু তাহাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জেরা করিলেন, যথা—তোদের বাড়িতে ক'খানা ঘর, কোন কোন মুখো ঘর, কোন ঘরে কী থাকত, যে পুকুরে তোরা জল তুলতিস সে পুকুর বাড়ির কোন দিকে, তার ক'টা ঘাট, সে পুকুরে যেতে হলে কোনও গাছের তলা দিয়ে যেতে হয় কি না, সেগুলো কী কী গাছ, যাদের বাড়িতে মোক্ষদা কাজকর্ম করত তাদের নাম কী'— ইত্যাদি ইত্যাদি। ভজহরির উত্তরগুলি সুধাংশুবাবু লিখিয়া

লইলেন।

তার পর মোক্ষদার ডাক পড়িল। তাহাকেও অবিকল ঐ প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করা হইল। উভয়ের উত্তরে বিশেষ কোনও পার্থক্য পাওয়া গেল না। ভজহরি তখন স্ত্রীর উপর স্বত্ব সাব্যস্তের ডিক্রী পাইল।

যতদিন মধুপুরে থাকা হইবে, ততদিন এই দম্পতি বাসের জন্য মিত্র-গৃহিণী তাঁহার বাসার আস্তাবলের পার্শ্বস্থ কক্ষটি নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তাঁহারই পরামর্শে, শয়ন করিতে যাইবার পূর্বে মোক্ষদা একটা বাটীতে কর্পূর মিশানো খানিকটা তার্পিন তৈল লইয়া গিয়া, স্বামীর ব্যথিত কোমরে অনেকক্ষণ ধরিয়া উত্তমরূপে মালিশ করিয়া দিল।

এক মাস পরে কলিকাতায় ফিরিয়া, উভয়ে স্ব স্ব কর্মে ইস্তফা দিয়া, সঞ্চিত অর্থ লইয়া দেশে চলিয়া গেল। তথায় কুটীরখানির জীর্ণসংস্কার করিয়া, একটি গোহাল ঘর তুলিয়া, গাভী কিনিয়া, জাতি ব্যবসায় শুরু করিয়া দিল। দুধে যে কী পরিমাণ জল স্বচ্ছন্দে মেশানো যাইতে পারে, সে বিষয়ে উভয়ের কলিকাতার অভিজ্ঞতা খুব কাজে লাগিয়া গিয়াছিল।

যুবকের প্রেম

বিবাহের পর তিনটি বৎসরও ঘুরিল না—মহেন্দ্র বিপত্নীক হইল।

মাত্র দুই বৎসর নয় মাস পূর্বে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। মেয়েটির নাম ছিল চঞ্চলা। হিন্দুর মেয়ের চঞ্চলা নাম রাখা ভাল হয় নাই, কারণ, বধূ হইয়া তাহাকে পতিকুলে ধ্রুবতারার মত স্থির থাকিতে হইবে। ছেলেবেলায় সে বড় দুষ্ট ছিল বলিয়াই মা-বাপ তাহার চঞ্চলা নাম রাখিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা কী জানিতেন তাহার জীবন কুসুমটি ভাল করিয়া ফুটিতে না ফুটিতেই, চপলা চঞ্চলার মতই সে আকাশের গায়ে লুকাইবে?

মহেন্দ্র তাহাদের জিলায় অবস্থিত মিশনারি কলেজ হইতে দুইবার বি এ পরীক্ষা দিয়া, অকৃতকার্য হইয়া পড়া ছাড়িয়া দিয়াছিল। পড়াশুনায় মন তাহার কোন কালেই ছিল না। তাহার মন ছিল খেলায়—তাস পাশা খেলায় নয়—ক্রিকেট ফুটবল কুস্তি জিমন্যাস্টিক ইত্যাদিতে। কলেজের ফুটবল টিমের সেই ছিল কাপ্তেন জিমন্যাস্টিকের আখড়ায় সেই ছিল মাস্টার। দেহে তাহার বিলক্ষণ বলও জন্মিয়াছিল।

পাশ করিতে না পারিলেও, আর একটা জিনিস সে বেশ আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিল—ইংরাজী ভাষা এবং আদবকায়দা। মিশনারি সাহেবগণের সহিত সর্বদা মিশিবার ইহা ফল। খেলায় তাহার নিপুণতা ও দেহবলের জন্য সাহেবেরা তাহাকে খুব পছন্দ করিতেন।

মহেন্দ্র বাড়ির জ্যেষ্ঠ পুত্র—পিতার মৃত্যুর পর সে ই বাড়ির কর্তা হইয়াছিল। সংসারটি নিতান্ত ছোট ছিল না, সামান্য কিছু জমিজিরাৎ ছিল, তাহাতেই কষ্টেসৃষ্টে

সংসাব চলিত। সকলেই আশা কবিযাছিল, মহেন্দ্র মানুষ হইযা উপার্জন কবিতে শিখিলে সংসাবেব কষ্ট ঘুচিবে। কিন্তু লেখাপড়া শিখিযাও মহেন্দ্র মানুষ হইবাব কোনও লক্ষণই দেখাইল না। তখন পাড়াব প্রবীণাগণ তাহাব মাকে পবামর্শ দিতে লাগিলেন, "ছেলেব বিযে দাও , তা হ'লেই সংসাবেব দিকে টান হবে, টাকা বোজগাবেব চেষ্টা কববে।" তাই একুশ বৎসব বযসে মা তাহাব বিবাহ দিযা বধূ ঘবে আনিযাছিলেন, চঞ্চলাব বযস তখন এগাব। বৎসবখানেক হইল, চঞ্চলা "ঘবকসত" কবিতে আসিযাছিল। প্রবীণাদেব ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ কবিযা মহেন্দ্র ঘবেই বসিযা বহিল, উপার্জনেব কোনও চেষ্টা দেখিল না। শেষেব এক বৎসব সে ত বউ লইযাই মাতিযা ছিল। সেই বউ. কাল বিসূচিকা বোগে আক্রান্ত হইযা মহেন্দ্রকে ফাঁকি দিযা চলিযা গেলে, সেই শোকে মহেন্দ্র কিছুদিন যেন পাগলেব মত হইযা গিযাছিল। সাবা সকালবেলাটা মাথাটি নিচু কবিযা, উঠানেব এক প্রান্ত হইতে অপব প্রান্ত পর্যন্ত পাযচাবি কবিযা বেড়ায, সাত ডাকেও কেহ তাহাব উত্তব পায না। শ্রান্ত হইলে, তক্তপোশেব উপব উপুড় হইযা বাঁলিসে মুখ গুঁজিযা পড়িযা থাকে। "বান্না হযে গেছে. স্নান কবে এস" বলিলে সে কথা কানেই তোলে না। অবশেষে বিস্তব তাগিদে স্নান কবিযা আসিযা খাইতে বসে. কিন্তু পাতে অধেক ভাত তবকাবি ফেলিযা বাখিযা উঠিযা যায। বিকালে জিমন্যাস্টিক বা ফুটবলেব আড্ডা হইতে কেহ ডাকিতে আসিলে, তাহাকে ফিবাইযা দেয--যায না। বাত্রিতে বিছানায শুইযা বহুক্ষণ ঘুমায না—এপাশ ওপাশ কবে মাঝে মাঝে কাঁদে। ইহা দেখিযা বাড়িব মেযেবা গোপনে বলাবলি কবে, আহা বড্ড দুজনে ভাব হযেছিল কিনা।" আব, আঁচলে আপন আপন চক্ষু মুছে।

পাড়াব প্রবীণাবা মহেন্দ্রেব মাকে পবামর্শ দিতে লাগিলেন, "শীগগিব একটি ভাল মেযে দেখে ছেলেব বিযে দাও—তা হ'লেই মন আবাব ভাল হবে।" মা বলিতে লাগিলেন, "না দিদি, এখন আমি ওকে ও কথা বলতে পাবব না। বড্ড শোকটা পেযেছে—আব কিছুদিন যাক—একটু সামলে উঠুক আগে।"

॥ দুই ॥

ছয মাস কাটিযাছে। এখন মহেন্দ্র অনেকটা সামলাইযা উঠিযাছে। আহাবে আবাব রুচি জন্মিযাছে। কেহ হাসিব কথা বলিলে এখন সে পূর্বেব মতই হাসিযা উঠে। পার্শ্ববর্তী গ্রামেব সঙ্গে ফুটবলেব ম্যাচ খেলিতে যায। পূর্বেব মত সবই কবে. কিন্তু কিছুতেই জীবনেব সে স্বাদটুকু আব পায না।

অবসব বুঝিযা এক দিন মা তাহাব নিকট পুনবায বিবাহেব প্রস্তাব কবিলেন। মহেন্দ্র মাথা নাড়িযা বলিল. "না মা, ও কাজ আব কবছিনে।"

মা বলিলেন, "পাগল ছেলে! এখন তোব বযস কি? তোব বযসেব কত ছেলেব প্রথম বিযেই হয না যে! তোব দ্বিগুণ বযসেব কত লোক, পবিবাব মববাব পব দু'মাস যেতে না যেতেই আবাব বিযে কবেছে—তুই কববিনে কেন? ঐ ওপাড়াব চাটুয্যেদেব মেজকর্তা—"

মহেন্দ্র বাধা দিযা বলিল, "যাব যা প্রবৃত্তি হয, সে তা করুক মা, আমাব দ্বাবা কিন্তু ও কাজটি হবে না।"

সে দিন এই পর্যন্ত। তাহার পর কোনও দিন মা, কোনও দিন মাসী, কোনও দিন পিসী, কোনও দিন খুড়ী-জ্যেঠি-ঠানদিদিরা এ বিষয়ে মহেন্দ্রকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহাদের পীড়াপীড়িতে মহেন্দ্র উত্যক্ত হইয়া স্থানত্যাগ করাই স্থির করিল। একদিন মাকে বলিল, "মা, আমি ভেবে দেখলাম, এ রকম ভাবে ঘরে ব'সে থাকাটা ঠিক নয়। একটা কাজ-কর্মের উপায় না হ'লে সংসারই বা চলবে কী করে? তাই মনে করছি তুমি যদি মত কর তবে কলকাতায় গিয়ে একটা চাকরি-বাকরির চেষ্টা দেখি।

এতদিনে ছেলের সুবুদ্ধি হইয়াছে জানিয়া মাতা পুলকিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "তাই ত করা উচিত বাবা! লেখাপড়া শিখেছ একটা চেষ্টা করিলে অবশ্যই একটা ভাল কাজ-কর্ম জোটাতে পারবে। তা কলকাতায় যাও—এস গিয়ে—তাতে আমার কোনও অমত নেই।" মনে ভাবিলেন কাজ-কর্ম করিতে করিতেই ছেলের মন ভাল হইবে—আবার বিবাহ করিতে রাজী হইবে, সংসারটা বজায় থাকিবে।

সেই গ্রামের একজন কায়স্থ কলিকাতায় লোহার ব্যবসায় করিয়া থাকেন বড় কারবার। তিনি বাড়ি আসিয়াছেন শুনিয়া মহেন্দ্র গিয়া সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা করিল। তিনি শুনিয়া রাজী হইলেন। বলিলেন "বেশ ত! আমার সঙ্গেই তুমি চল বাবাজী। আমার গাদতে থাকবে—খাবে দাবে—আর কাজ কর্মের চেষ্টা ক'রে বেড়াবে। আমার আড়তেও অনেক লোক প্রতিপালিত হচ্ছে—কিন্তু তুমি ভাল লেখাপড়া শিখেছ সে রকম সামান্য চাকরি ত তোমার উপযুক্ত হবে না। ভবিষ্যতেও তেমন কোনও উন্নতি নেই। কোনও একটা ভাল আপিস টাপিসে ঢোকবার চেষ্টাই দেখতে হবে তোমায়। কারবারসূত্রে দু'চার জন বড়লোকের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় আছে আমিও তোমার জন্যে চেষ্টা দেখবো।

যথাদিনে মহেন্দ্র ত শাস্ত্রযুক্ত ঘট প্রণাম করিয়া, জননী প্রভৃতির পদধূলি লইল। মা তাহার কপালে দধির ফোঁটা দিয়া চিরজীবী হও—রাজ রাজেশ্বর হও বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন একটি ব্যাগে নিজ সামান্য বস্ত্রাদি এবং পল্লীলিখিত খানকয়েক পুরাতন চিঠি এবং মাতৃদত্ত দশটি মাত্র টাকা লইয়া, মহেন্দ্র কলিকাতা যাত্রা করিল।

তিন

মহেন্দ্র মফঃস্বলে প্রতিপালিত হইলেও সে নেহাৎ পাড়াগেঁয়ে নহে—কলিকাতা তাহার নিতান্ত অপরিচিত ছিল না পিতার জীবনকালে তাঁহার সহিত কয়েকবার সে কলিকাতায় আসিয়া এক দেড় মাস করিয়া থাকিয়া গিয়াছে।

কলিকাতায় পৌঁছিবার দুই দিন পরে সেই কায়স্থ বাবুটি মহেন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইলেন এবং কয়েক জন বড়লোকের নিকট তাহাকে পরিচিত করিয়া দিলেন। তাঁহারা বলিলেন "চেষ্টা করা যাবে। মাঝে মাঝে এসে খবর নিও।"

মহেন্দ্র দুই চারি দিন অন্তর তাঁহাদের বৈঠকখানায় গিয়া ধরনা দিতে লাগিল

সব দিন যে কর্তা মহাশয়ের দেখা পাইত, তাহা নহে : দেখা পাইলেও, বিশেষ কোনও আশ্বাস বাক্য শুনিতে পাইত না। "বি-এটা পাশ করা থাকলে চট ক'রে একটা কিছু হয়ে যেতে পারতো। যা হোক, চেষ্টায় আছি, দু'চার জন লোককে বলেও রেখেছি, দেখি কী হয়।" এইরূপ কথা শুনিয়াই ফিরিতে হইত।

আফিস অঞ্চলেও মহেন্দ্র ঘোরাঘুরি আরম্ভ করিল। সারাদিন ধূলায় রৌদ্রে ঘুরিয়া, শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া গদিতে ফিরিয়া আসিত। আহার করিয়া সকালে সকালে শয়ন করিতে যাইত। মৃতা পত্নীর মুখখানি ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িত। নির্জন পাইলে ব্যাগ হইতে চঞ্চলার পত্রগুলি বাহির করিয়া পাঠ করিত পড়া শেষ করিয়া, সজল নয়নে সেগুলি আবার নেকড়ায় বাঁধিয়া তুলিয়া রাখিত।

কলিকাতায় এইভাবে এক মাস কাটিয়া গেল কিন্তু কাজ-কর্মের কোনও কিনারা হইল না। এই সময় পূর্বোক্ত বড়লোকগণের মধ্যে একজন পাতে দুই ঘণ্টা তাঁহার পুত্রকে চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্য পড়াইবার জন্য মাসিক দশ টাকা বেতনে তাহাকে নিযুক্ত করিতে চাহিলেন। মহেন্দ্র তাহা গ্রহণ করিল— তবু পকেট খরচটা ত চলিবে।

যখন দুই মাস কাটিয়া গেল তখন মহেন্দ্র প্রায় হতাশ হইয়া পড়িল। এরূপ ভাবে বসিয়া বসিয়া সরকার মহাশয়ের অন্নধ্বংস করিতে তাহার মনে লজ্জাও হইতে লাগিল। ভাবিল, আর একটা মাস দেখিব — কিছু যদি না জুটে, তবে দেশে ফিরিয়া গিয়া, চাষবাস কিছু বাড়াইবার চেষ্টা করা যাইবে

কিন্তু সেটা তাহাকে করিতে হইল না—ভাগ্যদেবী তাহার পানে মুখ তুলিয়া চাহিলেন এবং প্রসন্ন বদনে হাসিয়া, তাহার আশার সুসার করিবার জন্য এক অভাবনীয় ঘটনার সৃষ্টি করিলেন।

চার

সে দিন শনিবার ছিল, আফিসগুলি বেলা দুইটার সময় সব বন্ধ হইয়া গেল। মহেন্দ্র আর কি করে গদিতে ফিরিয়া গিয়া জন্তুটির মত চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা হইল না—ভাবিল, তার চেয়ে যাই, গড়ের মাঠে গিয়া গাছের ছায়ায় একটু শুইয়া থাকি। তাই সে করিল রাস্তা হইতে অল্পদূরে একটা খালি বেঞ্চি দেখিয়া তথায় গেল এবং গায়ের উড়ানীখানি খুলিয়া গুটাইয়া সেটিকে উপাধান স্বরূপ করিয়া, বেঞ্চির উপর শয়ন করিল। ঝির ঝির করিয়া বাতাস বহিতে লাগিল, আরামে মহেন্দ্র চক্ষু মুদ্রিত করিল।

ঘণ্টা দুই এই ভাবে নিদ্রা যাইবার পর, সে জাগিয়া উঠিল। শরীরে আবার বেশ স্ফূর্তি অনুভব করিল। রৌদ্র তখন পড়িয়া গিয়াছে। বাসায় ফিরিবার অভিপ্রায়ে, উঠিয়া ধীরে ধীরে রাস্তার উপর আসিল। পথে তখন অনেক বায়ুসেবনকারী বহির্গত হইয়াছে।

কিয়দ্দুর পথ আসিয়া, মহেন্দ্র দূরে একটা গোলমাল শুনিতে পাইল। দেখিল কেল্লার দিক হইতে একখানা বগিগাড়ি নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। সেই গাড়িকে থামাইবার জন্য রাস্তার লোক হো-হা করিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইতেছে—কিন্তু ঘোড়া নিকটে আসিবামাত্র তাহারা সরিয়া দাঁড়াইতেছে।

দেখিতে দেখিতে গাড়ি মোড় ঘুরিয়া, মহেন্দ্র যে রাস্তায় ছিল, সেই রাস্তা লইবার চেষ্টায় কোণের লাইটপোস্টে ধাক্কা খাইল। পশ্চাতে যে সহিস দাঁড়াইয়া ছিল, সে ছিটকাইয়া রাস্তায় পড়িয়া গেল গাড়ি বিদ্যুৎবেগে মহেন্দ্রের দিকে আসিতে লাগিল।

ক্ষণকাল মধ্যেই দৃষ্টিগোচর হইল, একজন অল্পবয়স্কা শ্বেতকায়া মহিলা মধ্যস্থলে বসিয়া, তাঁহার দুই পার্শ্বে দুইটি শিশু—একটি বালক একটি বালিকা তিনি নিজেই গাড়ি হাঁকাইতেছিলেন, অশ্বের ছিন্ন বলগা তখনও তাঁহার হাতেই রহিয়াছে।

মহেন্দ্র যেখানে ছিল সে স্থানের কাছাকাছি চার পাঁচজন ইংরাজ ভদ্রলোক বেড়াইতে ছিলেন। খিদিরপুর ডকের বহুসংখ্যক কুলি সেই সময় উত্তর দিক হইতে সেই স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল সাহেবরা লম্ফ দিয়া সেই সব কুলির মধ্যে পড়িয়া ছড়ি ঘুরাইয়া ধমক দিয়া তাহাদিগকে আনিয়া পথের প্রস্থভাগ জুড়িয়া তাহাদিগকে দাঁড় করাইয়া দিলেন এবং নিজেরা বিপদের স্থান--মধ্যভাগ জুড়িয়া রহিলেন। তাঁহারা চিৎকার করিতে করিতে ছড়ি আস্ফালন করিতে লাগিলেন কুলিরাও হল্লা করিতে লাগিল। মহেন্দ্র স্বেচ্ছায় এই কুলিদের সঙ্গে স্থান গ্রহণ করিয়াছিল।

অশ্ব কাছাকাছি আসিয়া পথ এরূপ ভাবে অবরুদ্ধ দেখিয়া সহসা ফিরিয়া ময়দানের দিকে মুখ করিল এবং নিমেষ মধ্যে খানা পার হইয়া ময়দানে প্রবেশ করিয়া ছুটিতে লাগিল। মহেন্দ্র তৎক্ষণাৎ নিজ গলা হইতে চাদরখানা নামাইয়া, তাহার উভয় প্রান্ত একত্রে গাইট দিয়া গাড়ির পশ্চাদ্ধাবন করিল। কিয়দ্দূর প্রাণপণে ছুটিয়া অশ্বের নাগাল পাইয়া সেই চাদরের ফাঁস তাহার গলায় লাগাইয়া বিপুল বলে তাহা টানিতে টানিতে সাথে হইয়া ছুটিতে লাগিল।

কিয়দ্দূর পশ্চাতে পূর্বোক্ত সাহেবরাও ছুটিয়া আসিতেছিলেন। মহেন্দ্রের এই সাহস ও কৌশল দেখিয়া, ব্রাভো ইয়ং ম্যান—হোলড অন' (সাবাস যুবক, ধরিয়া থাক) বলিয়া তাঁহারা চিৎকার করিতে লাগিলেন। অশ্বের গতিবেগ প্রতি মুহূর্তে হ্রাস হইয়া আসিতেছিল ক্রমে সাহেবেরা আসিয়া পৌঁছিলেন এবং সেই চাদর দুই তিনজনে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া টানিতে টানিতে ছুটিতে লাগিলেন। আর কিয়দ্দূর গিয়াই অশ্ব পরাজয় স্বীকার করিল—সে দাঁড়াইল।

দুইজন সাহেব তখন মেমসাহেব ও শিশুদ্বয়কে বগি হইতে নামাইলেন। মেমসাহেবের মুখ শাকের বর্ণ ধারণ করিয়াছে তিনি ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতেছেন। দাঁড়াইতে পারিলেন না সেইখানে ভিজা ঘাসের উপর বসিয়া পড়িলেন। কথা কহিবার শক্তি নাই যে কাহাকেও ধন্যবাদ দিবেন। শিশু দুইটি তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। মেমসাহেবের মূর্চ্ছার উপক্রম দেখা গেল।

সৌভাগ্যক্রমে এক সাহেবের পকেটে ব্র্যান্ডি ভরা ফ্লাস্ক ছিল। তিনি সেটি বাহির করিয়া মেমসাহেবের মুখে ধরিলেন। মেমসাহেব ঢক ঢক করিয়া খানিকটা পান করিয়া ফেলিলেন।

সাহেবেরা কেহ মহেন্দ্রের সহিত করমর্দন করিলেন, কেহ তাহার পিঠ

চাপড়াইলেন, সকলেই তাহাকে অজস্র প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলেন।

মেমসাহেব একটু চাঙ্গা হইলে, তাঁহার পরিচয় পাওয়া গেল। তিনি কেল্লায় থাকেন, মেজর গ্রীনের পত্নী। শিশু দুইটি তাঁহার নিজস্ব নহে—কর্নেল হ্যামিল্টনের সন্তান—তিনি তাহাদিগকে লইয়া হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে সহিসটা খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। গাড়ি-ঘোড়া তাহার জিম্মায় রাখিয়া, সাহেবেরা বিবি গ্রীন ও শিশুদ্বয়কে রাস্তার উপর লইয়া আসিয়া একটা ঠিকাগাড়ি ডাকিয়া দিলেন। বিবি, সাহেবদিগকে ও মহেন্দ্রকে মধুর ভাষায় ধন্যবাদ দিয়া গাড়িতে উঠিলেন। মহেন্দ্রকে বলিলেন, "বাবু, তুমি আমায় কেল্লায় পৌঁছাইয়া দিবে চল।"

মহেন্দ্র কোচবাক্সে উঠিতে যাইতেছিল, বিবি বলিলেন, "না না—তুমি ভিতরে আসিয়া বস।" মহেন্দ্র তাহাই করিল, গাড়ি কেল্লা অভিমুখে ছুটিল।

বাড়ি পৌঁছিয়া, বিবি গ্রীন মহেন্দ্রকে ড্রয়িংরুমে বসাইয়া বলিলেন, "আমার স্বামীকে ডাকিয়া আনি।"

কিয়ৎক্ষণ পরে এক স্থূলকায় বর্ষীয়ান সাহেবকে সঙ্গে লইয়া বিবি ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "জন্, এই বাবু আমার জীবনদাতা।" মহেন্দ্রের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ইনি আমার স্বামী, মেজর গ্রীন।'

ইঁহারা প্রবেশ করিতেই মহেন্দ্র দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল। মেজর সাহেবকে সেলাম করিল। সাহেব মহেন্দ্রের করমর্দন করিয়া তাহাকে অনেক ধন্যবাদ জানাইলেন। এক সোফার উপর নিজ পার্শ্বে বসাইয়া, তাহার নাম ধাম পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, মহেন্দ্র উত্তর দিতে লাগিল। সাহেব বলিলেন, "বাঃ, তুমি ত বেশ ইংরাজি বল, বাবু! তুমি একজন সুশিক্ষিত লোক।"

বেহারার মুখে সংবাদ পাইয়া, কর্নেল হ্যামিল্টনও এই সময় আসিয়া পড়িলেন, এবং মহেন্দ্রের প্রতি সময়োচিত শিষ্টাচার প্রদর্শন করিলেন। প্রায় দশ মিনিটকাল উভয় সাহেবে বসিয়া, মহেন্দ্রের সহিত নানা কথোপকথন করিলেন, তাহার পর উভয় সাহেব উঠিয়া গিয়া পরামর্শ করিলেন। পরে কর্নেল সাহেব মহেন্দ্রকে আসিয়া বলিলেন, "বাবু, তুমি আজ আমাদের যে উপকার করিয়াছ, তাহা আমাদের আজীবন স্মরণ থাকিবে। তোমার উপস্থিত বুদ্ধি ও সাহস অত্যন্ত প্রশংসার্হ। আমাদের কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তোমাকে যদি আমরা সামান্য কিছু উপহার দিই, তাহাতে তুমি বিরক্ত হইবে কী?" বলিয়া তিনি পকেট হইতে একখানি একশো টাকার নোট বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন।

মহেন্দ্র নোটখানির প্রতি একবার চাহিয়া দেখিয়া, সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল, "আমি কোনও উপহার বা পুরস্কারের আশায় ত এ কার্য করি নাই। প্রত্যেক ভদ্রলোকের যাহা কর্তব্য, তাহাই আমি করিয়াছি মাত্র। টাকা না লইবার অপরাধ আপনারা গ্রহণ না করেন, ইহাই আমার প্রার্থনা।"

সাহেব দুইজন আবার কী বলাবলি করিলেন। তাহার পর মেজর সাহেব বলিলেন, "তুমি চাকরির সন্ধানে কলিকাতায় আসিয়াছ বলিলে; কোনও স্থানে কোন আশা পাইয়াছ কী?"

"না সাহেব, এ পর্যন্ত পাই নাই।"

"আমাদেব আফিসে একটি চাকরি খালি আছে। বেতন একশ টাকা, সেটি পাইলে তুমি খুশি হও?"

"হ্যাঁ সাহেব—সেটি পাইলে নিজেকে আমি সৌভাগ্যবান মনে করিব।"

"বেশ! কাল তুমি একখানি দরখাস্ত লিখিয়া আনিও এবং বেলা একটার সময় আমার সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করিও।"

"নিশ্চয় আসিব। আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।"

"কিছুই না—কিছুই না, তবে ঐ কথা ঠিক রহিল। আমরা এখন ক্লাবে চলিলাম। (স্ত্রীর প্রতি) এল্‌সি, বাবুকে একটু চা খাওয়াইবে না?"

বিবি গ্রীন বলিলেন, "না প্রিয়তমে, আজ বিলম্ব হইয়া গিয়াছে—আমরা ক্লাবে গিযাই যাহা হয় পান কবিব।" বলিয়া তিনি কর্নেল সাহেবের সঙ্গে বাহির হইয়া গেলেন।

'যাহা হয়' কথাটিব অর্থ বুঝিযা, বিবি গ্রীন আপন মনে একটু হাসিলেন। চাযের অপেক্ষায মহেন্দ্রকে নিকটে বসাইয়া তাহাব সহিত গল্প কবিতে লাগিলেন।

পাঁচ

পরদিন দবখাস্ত লইযা কেল্লাব আফিসে গিযা মেজব সাহেবেব সঙ্গে মহেন্দ্র সাক্ষাৎ কবিল। মেজর সাহেব যথাস্থানে লইযা গিযা, সঙ্গে সঙ্গে দরখাস্ত মঞ্জুর কবাইযা, নিযোগপত্র সহি কবাইযা দিলেন। আগামী কল্য হইতেই তাহাকে কার্য কবিতে হইবে।

বাসায় ফিবিবার পথে, একটা পোস্ট আফিসে দাঁড়াইয়া, মহেন্দ্র পোস্টকার্ডে জননীকে এই শুভ সংবাদ জ্ঞাপন কবিল।

মহেন্দ্রের আশ্রয়দাত, আড়তদার সেই কায়স্থবাবুটি এ সংবাদে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। মহেন্দ্র সঙ্কুচিত ভাবে তাঁহাকে বলিল, "গোটাকতক টাকা পেলে আফিস যাবাব জন্যে কিছু কাপড়-চোপড় তৈরি করাতাম। মাইনে পেয়ে শোধ করতাম।"

কাযস্থবাবুটি তৎক্ষণাৎ তাহাব আবশ্যকমত টাকা বাহির করিয়া দিলেন। পরদিন আফিস হইতে ফিরিবাব পথে, ধর্মতলাব একটা ভাল দর্জির দোকানে মহেন্দ্র দুইটা ইংরাজি সুট ফরমাস দিয়া আসিল।

যেদিন চাকরি হইল, সেদিন রাত্রে বাসায় শয়ন করিয়া, স্ত্রীর চিঠির বাণ্ডিল বুকে কবিয়া মহেন্দ্র অনেক অশ্রুবর্ষণ কবিল।

প্রথম মাসের বেতন পাইয়া মহেন্দ্র সেই ছেলেপড়ানো চাকরিটি ছাড়িয়া দিল, কায়স্থ বাবুর ঋণ পরিশোধ করিল; একটা মেসের বাসা স্থির করিয়া সেখানে উঠিয়া গেল, আরও কিছু কাপড়-চোপড় ফবমাস দিল এবং মাকে দশটি টাকা মানিঅর্ডার করিল।

মহেন্দ্রেব চালচলন, ইংরাজী কথ্য-ভাষাজ্ঞান ও কর্মপটুতায় সাহেবেরা তাহার উপর বেশ সন্তুষ্ট হইলেন। একদিন মেজর সাহেব বিকালে তাহাকে সঙ্গে করিয়া

চা-পানার্থে নিজ ভবনে লইযা গেলেন। বিবি গ্রীন সেদিনও তাহাকে সমাদবে ও মিষ্টবাক্যে অভ্যর্থনা কবিলেন।

চা-পানান্তে মেজব সাহেব বাবান্দায চেযাব বাহিব কবাইযা মহেন্দ্রকে লইযা বসিলেন, বিবি গ্রীন বেডাইতে যাইবাব সাজসজ্জা কবিবাব জন্য ভিতবে গেলেন। মেজব সাহেব বলিলেন, "মোহেন, আফিস হইতে বাড়ি গিযা তুমি কী কব?"

আফিসে এখন সাহেবেবা মহেন্দ্রেব নামটি সংক্ষিপ্ত কবিযা তাহাকে "মোহেন" বলিযা ডাকিযা থাকেন। মহেন্দ্র উত্তব দিল, "চা পান কবিযা বাসাতেই থাকি, কিছু পড়ি টড়ি, কোনও দিন থিযেটাব কিম্বা বাযস্কোপে যাই।"

"বেড়াইতে যাও না?"

"এখান হইতে বাসায ফিবিতেই আমাব বেড়ানো হইযা যায।"

"দেখ আমি উর্দু পাশ কবিযাছি, কিন্তু বাঙলা এখনও পাশ কবি নাই। বাঙলা পাশ কবাও আমাব আবশ্যক। আমাব একজন শিক্ষক প্রযোজন, তাহাকে আমি মাসে কুড়ি টাকা কবিযা মাহিনা দিব—অধিক দিতে পাবিব না। তুমি আমায পড়াইবে? আপিস সব পব এক ঘণ্টা- এই ধব পাঁচটা হইতে ছযটা।"

মহেন্দ্র বলিল, বেতনেব জন্য কিছুমাত্র আসে যায না। আপনাব অনুগ্রহেই আমি চাকবিটি পাইযাছি, অতি আহ্লাদেব সহিত আমি আপনাকে বাঙলা শিখাইতে প্রস্তুত আছি।"

সাহেব বলিলেন "বেশ কথা। কত দিনে আমি বাঙলা শিখিতে পাবিব, বল দেখি?"

"আপনি কী পবিমাণ শিখিতে চান তাহা না জানিলে বলা শক্ত।"

"পবীক্ষা পাশ কবাব মত—বেশি শিখিযা কি কবিব? আমি অন্যান্য মিলিটাবি অফিসাবগণেব মুখে শুনিযাছি বাঙলা পাশ কবিতে ছয মাস যথেষ্ট। কাল হইতেই বন্দোবস্ত কবিযা দেওযা যাব কী বল?"

"বেশ ত। কাল আমি আফিসেব পবেই আসিব। একখানি বর্ণপবিচয বহি আপনাব জন্য কিনিযা আনিব কী?"

"আনিও" বলিযা পাৎলুনেব পকেট হইতে সাহেব একটি টাকা বাহিব কবিযা মহেন্দ্রেব সম্মুখে ধবিলেন।

মহেন্দ্র বলিল "টাকা বাখুন। ঐ বহিব দাম পাঁচ পযসা মাত্র আমি কিনিযা আনিব এখন।"

সাহেব টাকাটি পকেটে ফেলিযা, একটি দুযানি বাহিব কবিযা মহেন্দ্রেব হাতে দিলেন।

এই সমযে মেমসাহেব বাহিব হইযা আসিলেন, সহিস টমটমখানি আনিযা হাজিব কবিল। মহেন্দ্রেব সহিত কবমর্দন কবিযা সাহেব সস্ত্রীক টমটমে গিযা উঠিলেন।

মহেন্দ্রও ইঁহাদেব সঙ্গে নামিযা আসিযাছিল। ঘোড়াব প্রতি চাহিযা বলিল, "এটা ত আপনাব সে ঘোড়া নয।"

সাহেব বলিলেন, "না। সেটাকে বিক্রয কবিযা ফেলিযাছি। এটা নূতন

কিনিযাছি, এ বেশ ঠাণ্ডা।" বলিযা হস্তসঙ্কেতে বিদায জ্ঞাপন কবিযা তিনি টমটম হাঁকাইযা দিলেন।

পবদিন আফিসেব পব মহেন্দ্র সোজা মেজব সাহেবেব কুঠিতে আসিযা উপস্থিত হইল। বাবান্দায বিবি গ্রীন দাঁডাইযা ছিলেন, তিনি হাসিযা বলিলেন, "আমাব স্বামীকে বাঙলা পডাইতে আসিযাছেন বুঝি? কিন্তু আপনাব ছাত্র ত পলাতক।"

"তিনি কোথায গিযাছেন?"

"ভয নাই। একটু পবেই আসিবেন। তিনি আমায বলিযা গিযাছেন, ততক্ষণ আপনাকে চা দিতে। ভিতবে আসুন। চা আমাদেব প্রস্তুত।" বলিযা তিনি অগ্রসব হইলেন।

চা ঢালিযা, রুটি-মাখনেব প্লেটটা মহেন্দ্রেব দিকে সবাইযা দিযা টেবিলেব উপবে বক্ষিত বর্ণপবিচযেব প্রথম ভাগ বইখানি তিনি কৌতূহলবশত তুলিযা লইলেন। সেখানি খুলিযা জিজ্ঞাসা কবিলেন, "কোনখান থেকে আবম্ভ কবিতে হয?"

অ-আব পাতা দেখাইযা মহেন্দ্র বলিল, "এইখান থেকে। এইগুলি স্ববর্ণ—ভাওযেলস আব এই পাতায এইগুলি ব্যঞ্জনবর্ণ—কনসোনেণ্টস

চা পান কবিতে কবিতে মেমসাহেব অক্ষবগুলিব দিকে চাহিতে লাগিলেন "এগুলিব চেহাবা ত ভাবি অদ্ভুত! দেখিলে বাস্তবিক হাসি পায। কোনটিব কী নাম?"

মহেন্দ্র বলিল এইটি অ

এক মুহূর্ত থামুন বলিযা মেমসাহেব তাঁহাব পকেট হইতে ক্ষুদ্র একটি সোনাব পেন্সিল বাহিব কবিযা অক্ষবতলে লিখিলেন "Awe"

এটি

আ।

মেমসাহেব তাহাব তলায লিখিলেন "Ah!" এইরূপে স্ববর্ণেব প্রত্যেক অক্ষবেব নিম্নে সেগুলিব উচ্চাবণ লিখিযা লইলেন।

অল্পক্ষণ পবেই মেজব গ্রীন আসিযা উপস্থিত হইলেন মেমসাহেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ব্যাড় নয! মুন্সীজী কতক্ষণ আসিযা তোমাব অপেক্ষায বসিযা আছেন যাহা হউক তুমি যে সময নষ্ট কবিলে তাহাতে কোনও ক্ষতি হইবে না তোমাব কাজ অনেকটা আমি অগ্রসব কবিযা বাখিযাছি। বলিযা তিনি অক্ষবগুলি দেখাইযা উচ্চাবণও পডিতে লাগিলেন।

মেজব সাহেবেব চা পান শেষ হইতে প্রায ছযটা বাজিল। পকেট হইতে ঘডি খুলিযা দেখিযা স্ত্রীব প্রতি বলিলেন আজ আব আমাব পডিবাব সময কই? অক্ষবগুলিব উচ্চাবণ তুমি ত লিখিযাই বাখিযাছ কাল সকালে ওগুলা আমি অভ্যাস কবিব এখন। চল, এবাব হাওযা খাইতে যাওযা যাক। মোহেন কাল আসিযা তুমি দেখিবে ঐ সমস্ত অক্ষব আমাব চেনা হইযা গিযাছে, আমি নূতন পাঠ লইব।' বলিযা সহাস্যে মহেন্দ্রকে বিদায দিযা তিনি "সস্ত্রীক শকটাবোহণে" হাওযা খাইতে বাহিব হইলেন।

পবদিন মহেন্দ্র সাহেবেব কুঠিতে গিযা দেখিল, সাহেব আছেন। তিনি মহেন্দ্রকে বসাইযা বলিলেন, "ওহে দেখ, তোমাদেব বাঙলা অক্ষবগুলা ড্যাম ডিফিকল্ট। উচ্চাবণ অতি বদ। আজ আমি সেগুলা অভ্যাস কবিবাব বেশি সময পাই নাই, কাল কবিব, কবিযা নূতন পাঠ লইব। আজ তুমি এক পেযালা চা খাইযা যাও।"

চা পানেব পব মেমসাহেব প্রথমভাগখানি আনিযা স্বামীব প্রতি চাহিযা বলিলেন, "এই ব্যঞ্জনবর্ণগুলাব উচ্চাবণ টুকিযা লও না, জন। স্ববর্ণগুলা চেনা শেষ কবিযা যদি সময পাও ব্যঞ্জনবর্ণগুলাও কতবটা চিনিযা বাখিতে পাবিবে।'

সাহেব বলিলেন, "বেশ বুদ্ধি কবিযাছ ওগুলা তুমিই লিখিযা বাখ, প্রিযতমে।"

মেমসাহেব একটি একটি কবিযা সমস্ত ব্যঞ্জনবর্ণেব উচ্চাবণ লিখিতে লাগিলেন। কিন্তু "ত" লইযা বড বিপদ হইল। তিনি ত' কোনমতেই উচ্চাবণ কবিতে পাবিলেন না 'ট' উচ্চালণ কবিতে লাগিলেন। দেখিযা সাহেব হাসিযাই আকুল

ছয

লেখাপডা এই ভাবেই চলিতে লাগিল। সাহেব গৃহে উপস্থিত থাকিলে দুই দিন ভাঁডাইযা এক দিন পডেন। যেদিন মহেন্দ্র আসিবাব পূর্বেই প্রস্থান কবেন সে দিন স্ত্রীকে বলিযা যান নতন পডাটা তুমিই শিখিযা লইও কাল সকালে তোমাব কাছেই আমি জিজ্ঞাসা কবিযা লইব।

মেমসাহেব এদিকে দ্রুতগতিতে শিখিযা ফেলিতেছেন। এক মাস হইযা গেল সাহেবেব 'সাধু পূজা'ই ভাল কবিযা আযত্ত হইল না। কিন্তু মেমসাহেবেব প্রথম ভাগ প্রায শেষ—বাখালেব গল্প হইতেছে। তাই বাঁ পুবা সমযটা তিনি পডেন ? দুজনে বসিযা কত গল্প হয—কত হাসি তামাশা- কত বঙ্গ-বাঙ্গ।

একদিন স্বামীব অনুপস্থিতিকালে মেমসাহেব বলিলেন আচ্ছা তোমাদেব দেশে, শিক্ষকেবা ছাত্র বা ছাত্রীব গুরুজনস্বরূপ গণ্য—নয কী।

হ্যাঁ।"

'গুরুজনেব সামনে তাঁদেব নাম কবিতে নাই তুমি বলিযাছ কিন্তু আমি যে তোমাব নাম কবিযা ডাকি— মিস্টাব মোহেন বলি এটা ত উচিত হইতেছে না

মহেন্দ্র বলিল ' তাতে আব দোষ কী ? তুমি ত আব বাঙালীব মেযে নও

"আব, তুমি আমায মিসেস গ্রীন বল সেটাও ভাল শোনায না। আমাব ইচ্ছা আমি তোমায গুরুজী বলিযা ডাকিব—আব তুমি আমায এলসি বলিযা ডাকিবে। সে কী ভাল হইবে না ?"

"তুমি আমায গুরুজী বলিযা ডাকিলে কোনও ক্ষতি হইবে না—কিন্তু আমি তোমায এলসি বলিযা ডাকিলে তোমাব স্বামী কী সেটা পছন্দ কবিবেন ? বলিযা মহেন্দ্র একটু হাসিল।

মেমসাহেব একটু চিন্তা কবিযা বলিলেন "হ্যাঁ—তা বটে তিনি হযত মনে কবিবেন, তোমাতে আমাতে প্রেমে পডিযা গিযাছি। বাগ কবিতে পাবেন বটে।

তবে কাজ নাই—যেমন চলিতেছে, তেমনি চলুক। বুড়াকে চটাইয়া লাভ কী ?" বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

এইরূপ রঙ-বেরঙের কথাবার্তা মাঝে মাঝে হইতে লাগিল। রঙ্গ ক্রমে চড়িতে লাগিল। তবে সাহেব উপস্থিত থাকিলে বাজে কথা একটিও হইত না।

দুই মাস কাটিয়া গিয়াছে সাহেবের প্রথম ভাগ এখনও শেষ হয় নাই, কিন্তু মেমসাহেব বোধোদয় ধরিয়াছেন।

এমন সময় সবকারী কার্যে মেজর সাহেবকে করাচি যাইবার আদেশ হইল। দুই সপ্তাহকাল সেখানে তাঁহাকে থাকিতে হইবে।

সে দিন পড়াইয়া বিদায় গ্রহণ করিবার সময় মহেন্দ্র বলিল, "তা হলে, আপনি ফিরিয়া আসিলে আবার আমি আসিব।"

মেমসাহেব বলিলেন, "আমি বুঝি পড়িব না ? দুই সপ্তাহ না পড়িলে আমি সব ভুলিয়া যাইব যে।"

সাহেব বলিলেন, "তুমি যেমন আসিতেছ, তেমনি আসিও মোহেন। মেমসাহেবকে পড়াইও।"

মহেন্দ্র সম্মত হইয়া বাসায় চলিয়া গেল।

সাত

মেজর সাহেবের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও মহেন্দ্র তাঁহার মেমকে প্রতিদিন পাঁচটা বাজিলেই পড়াইতে যায়। পড়ানো শেষ হইতে প্রথম দুই দিন ছয়টা স্থানে সাতটা বাজিয়াছিল, তৃতীয় দিন একেবারে আটটা বাজিয়া গেল। ঘড়ির পানে চাহিয়া বিবি গ্রীন বলিলেন, "উঃ—আটটা! অনেক দেরি হইয়া গেছে ত! মোহেন্, তুমি, কেন আমার সঙ্গেই আজ ডিনার খাইয়া যাও না।"

মহেন্দ্র বলিল, "বেশ ত—ইহাতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইব।"

"আচ্ছা, তুমি তবে তত ক্ষণ হাত-মুখ ধুইয়া লও, নিচেই গোসলখানা আছে। আমিও উপরে গিয়া বস্ত্রাদি পরিবর্তন করিয়া আসি। সাড়ে আটটায় আমরা ডিনারে বসিব।" বলিয়া তিনি বেয়ারাকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন, "সাহেবকা ওয়াস্তে গোসলখানা ঠিক করো।" বেয়ারা চলিয়া গেল।

কয়েক মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া মহেন্দ্রকে সে নিম্নতলে একটি কামরায় লইয়া গেল। এটি শয়নকক্ষ, কিন্তু অব্যবহৃত বলিয়া মনে হইল। সেই কক্ষের সংলগ্ন গোসলখানায়, একখানি নূতন সাবান, ধোয়া তোয়ালে ও জল রহিয়াছে। মহেন্দ্র শয়নকক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া গোসলখানায় প্রবেশ করিল।

অর্দ্ধঘণ্টা পরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া, সিগারেট মুখে করিয়া ড্রইং-রুমে প্রবেশ করিয়া মহেন্দ্র দেখিল, এল্‌সি তৎপূর্বেই আসিয়া বসিয়া আছে। তাহার অঙ্গে কালো সিল্কের সান্ধ্য পরিচ্ছদ, পাউডার-চর্চিত অর্দ্ধনগ্ন শুভ্র বক্ষের উপর একটি মুক্তাহার দুলিতেছে। এল্‌সি বসিয়া একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছে।

মহেন্দ্র নিকটে আসিয়া বলিল, "কী পড়া হইতেছে ?"

"এ একখানি নভেল, নূতন বাহির হইয়াছে। তুমি বোধ হয় এখনও এখানি পড় নাই ?" বলিয়া মহেন্দ্রের হস্তে এল্‌সি পুস্তকখানি দিল।

মহেন্দ্র বহিখানিব সদব পৃষ্ঠা দেখিযা বলিল, "না, এখানি পডি নাই। তবে এই লেখকেব অন্য কযেকখানি উপন্যাস আমি পডিযাছি।"

এলসি বলিল, "এখানি খাসা বই। আমাব পডা হইলে তোমায দিব এখন—পডিযা দেখিও, বেশ মজা আছে। আচ্ছা মোহেন, তোমাদেব বাঙালা ভাষায নভেল আছে?"

"হ্যাঁ, আছে বইকি, অনেক আছে।"

"সে সব নভেল কী বকম? তুমি ত ইংবাজিব নভেল অনেক পডিযাছ, বাঙলা নভেলও কী সেই ধবনেব?"

"অনেকটা সেই ধবনেব বইকি।"

"তাতে লভ মেকিং (প্রেমলীলা) আছে?"

"তা আছে বইকি। প্রেমলীলা ছাডা কী আব নভেল হয?"

"সে ত নিশ্চয। বাঙলা নভেলে নাযিকাবা সব কি বকম হয?"

"যা হওযা উচিত—খুব সুন্দবী হয। তবে বযসটা তাদেব কিছু কম হয। ইংবাজি নভেলে যেমন নাযিকাবা হয ১৮/১৯, বাঙলা নভেলে তেমনই ১৩/১৪ বছবেব হয।"

এলসি হাসিযা বলিল, "আমাব বযস ত কিন্তু ১৯ বৎসব। আমি স্বচ্ছন্দে ইংবাজি উপন্যাসেব নাযিকা হইতে পাবি—কী বল? কিন্তু বাঙলা উপন্যাসেব ত পাবি না। আচ্ছা এ দেশেব ঐ সব ছোট ছোট মেযেবা প্রেম কবিতে জানে?"

"আমাদেব গবম দেশ কি না। অল্প বযসেই আমবা ও বিষযে বেশ পাবিপক্ক হইযা উঠি।"

"কাব সঙ্গে ঐ সব মেযেবা প্রেম কবে?"

আমবা যে সমযেব কথা লিখিতেছি, তখনও বাঙলা উপন্যাসে 'আর্টেব' যুগ—পবকীযা প্রেমেব যুগ—তেমন নির্ভীক ভাবে আবম্ভ হয নাই। সুতবাং মহেন্দ্র বলিল, "তাবা প্রেম কবে স্বামীব সঙ্গে—অথবা যাব সঙ্গে শেষে বিবাহ হইবে তাব সঙ্গে।"

শুনিযা এলসি ওষ্ঠযুগল কুঞ্চিত কবিযা বলিল, "সে ত নিতান্ত সেকেলে ফ্যাশান। স্বামী না হয স্বামীব সঙ্গে প্রেমে আবাব কোনও মজা আছে নাকি?"

মহেন্দ্র হাসিযা বলিল, "আমাদেব সাহিত্য এখনও তত মজাদাব হইযা উঠে নাই।"

এই সময বেযাবা আসিযা সংবাদ দিল, "খানা টেবিল পব।"

উভযে উঠিযা খানা কামবায গেল। টেবিলটি সুন্দব ভাবে সজ্জিত। দুইটি ফুলদানিস্থ পুষ্পগুচ্ছেব মাঝে বৈদ্যুতিক টেবিল ল্যাম্প জ্বলিতে লাগিল।

দুই কোস শেষ হইবাব পব, পবিবেশনকাবী 'বয' বক্তবর্ণ তবল পদার্থপূর্ণ ডিক্যাণ্টাব আনিযা মেমসাহেবেব 'ওযাইন' গ্লাস পূর্ণ কবিযা দিল। এলসি মহেন্দ্রব দিকে চাহিযা বলিল, "তোমাকে একটু ক্লাবেট দিবে কী? না হুইস্কি? আমাব স্বামী কিন্তু হুইস্কিই পছন্দ কবেন।"

মহেন্দ্র হাসিযা বলিল, "আমি ও সব কখনও পান কবি নাই। আমি মিশনাবি সহবাসে মানুষ, তাঁবা সুবাপান কবাকে অত্যন্ত গর্হিত কার্য বলিযা

মনে করেন।"

এল্‌সি হাসিয়া বলিল, "মিশনারিরা ঐ রকম অদ্ভুত জীবই বটে। তা, তুমি কখনও পোর্টও খাও নাই? পোর্ট ত অনেকে ডাক্তারের উপদেশে পান করে।"

মহেন্দ্র বলিল, "হ্যাঁ, পোর্ট আমি পান করিয়াছি বটে।"

এলসি হুকুম করিল, "বয়, সাহেবকো পোর্ট সরাপ।"

বেয়ারা সাইডবোর্ড হইতে পোর্টের বোতল ও পোর্টগ্লাস লইয়া আসিল। মহেন্দ্রের পার্শ্বস্থ ক্লারেট গ্লাসটি সরাইয়া, সেখানে পোর্টগ্লাস রাখিয়া উহা পূর্ণ করিয়া দিল।

তখন "উপন্যাসের প্রেমতত্ত্ব" সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। উভয়ের গ্লাস খালি হইবামাত্র বয় তাহা পূর্ণ করিয়া দিতেছে। তৃতীয় গ্লাসের মাঝামাঝি পৌঁছিয়া মহেন্দ্রের দেহ মনে একটা অপূর্ব পুলকসঞ্চার হইল। তাহার কথাবার্তা আরও সরস হইয়া উঠিল—কথায় কথায় উভয়ের হাসির ফোয়ারা ছুটিতে লাগিল। মাঝে মাঝে মহেন্দ্রের বিশেষ কোনও রসাল কথা শুনিয়া 'Naughty boy!" (দুষ্ট বালক) বলিয়া, হাসিতে হাসিতে এলসি তাহার বাহুতে বা পিঠে থাবড়া মারিতে লাগিল। গোলাপি চোখে, এলসির পানে চাহিয়া মহেন্দ্রের মনে হইতে লাগিল, এ যেন মূর্তিমতী কবিতা—এমন সুন্দরী সুরসিকা রমণীরত্ন জগতে দুর্লভ।

আহার শেষ হইলে উভয়ে ড্রইং রুমে গিয়া বসিল।

সেদিন মহেন্দ্র যখন বাসায় ফিরিল, রাত্রি তখন প্রায় একটা।

আট

পরদিন রবিবার ছিল। বেলা সাতটার সময় ঘুম ভাঙিয়া মহেন্দ্র শয্যায় পড়িয়া গত রাত্রের ঘটনাগুলি স্মরণ করিতে লাগিল।

সব কথা স্মরণ করিয়া নিজের প্রতি ধিক্কারে তাহার মন বিষাক্ত হইয়া উঠিল। মনে মনে বলিতে লাগিল, 'ছি ছি!—এ আমি কী করিলাম! আমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, আজীবন আমার মৃতা স্ত্রীর পবিত্র স্মৃতি বুকে করিয়া সেই ভালবাসায় তন্ময় হইয়া থাকিব, তাহাকে ধ্যান করিয়াই জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কাটাইয়া দিব, একনিষ্ঠ পত্নীপ্রেমের দৃষ্টান্ত জগৎকে দেখাইব—সে প্রতিজ্ঞা আমার কোথায় রহিল? ছি ছি—আমি কি নীচ! কী দুর্বল! কী অপদার্থ! আমি ত মনুষ্য নামের অযোগ্য। আমার মৃত্যুই শ্রেয়।'

সারাদিন মহেন্দ্র বিষণ্ণ বদনে বাসায় বসিয়া কাটাইল। যাহা অদৃষ্টে ছিল, তাহা ত হইয়াই গিয়াছে—এখন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কী করা কর্তব্য, তাহাই সে চিন্তা করিতেছিল। একবার বাক্স খুলিয়া স্ত্রীর চিঠির বাণ্ডিলটি বাহির করিল। মনে হইল, চিঠিগুলি যেন চিৎকার করিয়া বলিতেছে, 'অপবিত্র পশু! ঐ কলঙ্কিত হস্তে আমাদের স্পর্শ করিবার অধিকার আর তোমার নাই।" মহেন্দ্রের হস্তে সেই চিঠির বাণ্ডিল যেন জ্বলন্ত অঙ্গারের মত অনুভূত হইল। সে উহা বাক্সে ফেলিয়া, বাক্স বন্ধ করিল।

রাত্রে শয্যায় শয়ন করিয়াও সে অনেকক্ষণ এই বিষয়ে চিন্তা করিল।

অবশেষে স্থির করিল, জোর করিয়া, শাসন করিয়া, অবাধ্য মন মাতঙ্গকে ও পথ হইতে ফিরাইতে হইবে। প্রলোভনের পথে আর পদার্পণ করা উচিত নয়। মেজর সাহেব যতদিন না ফেরেন, ততদিন আর তাঁহার বাড়িতে সে যাইবে না—তিনি ফিরিলেও আর যাইবে না—তাঁহাকে বাঙলা পড়ানো পরিত্যাগ করাই সে স্থিরসঙ্কল্প করিল। নেশার ঝোঁকে একবার বিপথে পা দিয়াছে বলিয়া আজীবন যে সেই পথেই চলিতে হইবে, তাহার কোনও কারণ নাই—আবার চেষ্টা করিয়া, সংযম-সাধনা করিয়া দৃঢ়চিত্তে সুপথেই নিজেকে চালনা করিতে হইবে।

পরদিন সোমবারে মহেন্দ্র তাহার আফিসে গেল। পূর্ব হইতে সে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, আজ পাঁচটা বাজিলেই সটান সে বাসার পথ ধরিবে—সাহেবের কুঠির ধারে কাছেও যাইবে না। কিন্তু তিনটার পর এ বিষয়ে তাহার মনে একটু দ্বিধা প্রবেশ করিল। এরূপভাবে না বলিয়া কহিয়া পলায়ন করা কী নিতান্ত অভদ্রতা হইবে না? তার চেয়ে, যথাসময়ে গিয়া মেমসাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া, কোনও একটা ওজর দেখাইয়া বিদায় লওয়াই ভাল। ভদ্রতাও রক্ষা হইবে সকল দিক বজায়ও থাকিবে, কারণ মহেন্দ্রের সঙ্কল্প এখন স্থির—এলসির মোহজালে আর কিছুতেই সে নিজেকে জড়াইতে দিবে না।

ক্রমে, 'ভদ্রতা রক্ষার' জন্য মহেন্দ্রের মন বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সে ঘন ঘন ঘড়ির পানে চাহিতে লাগিল, কতক্ষণে পাঁচটা বাজে। অবশেষে পাঁচটা বাজিল। মহেন্দ্র কলম ফেলিয়া কাগজপত্র গুছাইয়া দেরাজ বন্ধ করিয়া, হ্যাট ও ছড়ি হস্তে আফিস হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

মেজর সাহেবের কুঠির নিকট গিয়া দেখিল, এলসি বারান্দায় দাঁড়াইয়া পথের পানে চাহিয়া আছে। ফটকের ভিতর প্রবেশ করিয়াই মহেন্দ্র হ্যাট তুলিয়া তাহাকে অভিবাদন করিল। বারান্দায় উঠিতেই, এলসি অগ্রসর হইয়া আসিয়া স্মিতমুখে বলিল "ওয়েল মোহেন নটি বয়। কাল তুমি আস নাই কেন বল ত? আমি তোমার উপর ভারি রাগ করিয়াছি।"

মহেন্দ্র বলিল "কাল যে রবিবার ছিল।"

"হ'লই বা রবিবার। তুমি ত জান আমার স্বামী এখানে নাই, আমি একলাটি রহিয়াছি। নাই বা পড়িলাম—দু'জনে বসিয়া গল্পে সল্পে আমোদে সন্ধ্যাটা ত কাটানো যাইত। কাল বিকালে তোমার কোথাও কোন কাজ ছিল বুঝি?"

"না, কাজ এমন বিশেষ কিছুই না।"

"আচ্ছা এখন চা খাইবে চল। আজ আর পড়িতে ইচ্ছা করিতেছে না। চা খাইয়া চল, দু'জনে ময়দানে একটু বেড়াইয়া আসা যাউক।"

নয়

মহেন্দ্রের 'দৃঢ় প্রতিজ্ঞা', 'স্থির-সঙ্কল্প', 'সংযম-সাধনা', কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, তাহার আর খোঁজ নাই। দিনের পর দিন, পরস্পরের নেশায় দু'জনে মশগুল হইয়া রহিল।

সেদিন বিকালে মহেন্দ্র মেমসাহেবকে 'পড়াইতে' গিয়া দেখিল, সে ম্লানমুখে

বসিয়া আছে, টেবিলের উপর একখানা হল্‌দে খাম। এল্‌সি বলিল, "মোহেন্‌, টেলিগ্রাম আসিয়াছে, কাল প্রাতে আমার স্বামী আসিয়া পৌঁছিবেন।" বলিয়া টেলিগ্রামখানি মহেন্দ্রের দিকে ঠেলিয়া দিল। মহেন্দ্র সেখানি পড়িয়া, বিষণ্নবদনে টেবিলের উপর রাখিয়া দিল।

এল্‌সি বলিল, "দেখ মোহেন্‌, এখন হইতে আমাদের কিন্তু খুব সাবধানে চলিতে হইবে। শুধু আমার স্বামী ফিরিয়া আসিতেছেন বলিয়া নয়—তোমায় আমায় লইয়া আমাদের সমাজেও একটু কানাঘুসো চলিতেছে। কেহ কেহ বলিতেছে, একজন নেটিভের সঙ্গে অত মেশামিশি কী জন্য?"

মহেন্দ্র বলিল, "তবে কী এখন হইতে আমাদের পরস্পরের সম্বন্ধ ছিন্ন হইবে, এল্‌সি? তাহা হইলে কেমন করিয়া আমি বাঁচিব, প্রিয়তমে?"

"তাহা হইলে কী আমিই বাঁচিব? না প্রিয়তমে, সে হইতেই পাবে না। তুমি পূর্বে যেমন আমার স্বামীকে রোজ পড়াইতে আসিতে, পড়াইয়া চলিয়া যাইতে, সেইরূপ করিবে। তবু চোখের দেখা ত হইবে! যাহাতে মাঝে মাঝে দুই এক ঘণ্টা করিয়া নির্জনে তোমাতে আমাতে মনের কথা আদান-প্রদানের সুযোগ পাই, তাহার একটা ব্যবস্থা ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক করিয়া লইতে হইবে। তুমি মুখ হাত ধুইয়া লও। চা খাইয়া চল, ময়দানে গিয়া একটু বেড়ানো যাক।"

সন্ধ্যার পর কেল্লা হইতে বাহির হইয়া ময়দানের এক জনহীন স্থানে বৃক্ষতলের অন্ধকারে বেঞ্চ দেখিতে পাইয়া, সেইখানে দুইজনে বসিয়া, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা জল্পনা কল্পনা করিতে লাগিল।

অবশেষে স্থির হইল, পার্ক লেনে অথবা ঐ অঞ্চলের কোনও উপযুক্ত বাড়িতে, বেনামীতে একখানি ঘর ভাড়া লইতে হইবে। সুযোগমত সঙ্কেত অনুসারে সেইখানেই মাঝে মাঝে উভয়ের দেখা সাক্ষাৎ এবং "মনের কথার আদান প্রদান" চলিবে। এলসি বলিল, "তাহারা বোধ হয় ২/৪ মাসের ভাড়া অগ্রিম চাহিয়া বসিবে। কিছু আসবাবও আমাদের আবশ্যক হইবে। আমি সেজন্য তোমায় এক হাজার টাকা দিব। আজ রাত্রেই টাকাটা দিয়া রাখিব—নইলে আমার স্বামী আসিলে অসুবিধা হইতে পারে। এখন ওঠা যাক চল, আমাদের ডিনারের সময় হইয়া আসিল।"

মেজর গ্রীন পরদিন প্রাতে আসিয়া পৌঁছিলেন। বিকালে যথানিয়মে মহেন্দ্র তাঁহাকে পড়াইতে গেল। মেজর সাহেব পড়িলেন না—মহেন্দ্রকে চা খাওয়াইয়া হাসি-খুসী গল্পগুজবে সময় কাটাইয়া তাহাকে বিদায় দিয়া সস্ত্রীক টমটমে হাওয়া খাইতে বাহির হইলেন। পরদিনও এইরূপ হইল।

এ দুই দিন এখান হইতে বিদায় লইয়া, মহেন্দ্র পার্ক লেন অঞ্চলে "উপযুক্ত বাড়ি"-তে খালি ঘর খুঁজিয়া বেড়াইল। কিন্তু তখন রাত্রি—কোথাও কোনও সুবিধা করিতে পারিল না। সুতরাং সে স্থির করিল, রবিবারে এই পাড়ায় আসিয়া এ কার্যটি সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিবে।

তৃতীয় দিন, আফিসে মেজর সাহেব মহেন্দ্রকে একান্তে ডাকিয়া কহিলেন, "মোহেন্‌, আমার এখন অনেক কাজ পড়িয়াছে। এখন আমি আর বাঙলা পড়িবার সময় পাইব না। আর তোমার কষ্ট করিয়া আমার কুঠিতে আসার

প্রযোজন নাই।" বলিযা তিনি মহেন্দ্রেব প্রাপ্য টাকা তাহাকে বুঝাইযা দিলেন। মহেন্দ্র দেখিল, মেজব সাহেবেব মুখখানা গম্ভীব—বিবক্তিব ছাযাও তাহাতে সুস্পষ্ট।

মহেন্দ্র আফিসে নিজ স্থানে গিযা বসিযা ভাবিতে লাগিল, না পডিবাব কাবণ সাহেব যাহা বলিলেন তাহাই কী সত্য? না কাহাবও নিকট কোন "কানাঘুষা" শুনিযা তাঁহাব মনে একটা সন্দেহ প্রবেশ কবিযাছে? যাহা বলিলেন, তাহা আফিসে না বলিযা, নিজ গৃহেও ত বলিতে পাবিতেন। তাঁহাব কুঠিতে আব আমি যাই, ইহা কি তাঁহাব ইচ্ছা নয? বাস্তবিক, এ দিকে একটু বাডাবাডি হইযা উঠিযাছিল বইকি। সেটা নিতান্ত নির্বুদ্ধিতাব কার্য হইযাছে।"

ইহাব দুই দিন পবে মেজব সাহেব আফিসেব বাবান্দায আসিযা হঠাৎ দেখিলেন, কিছুদূবে তাঁহাব গৃহভৃত্য একখানি চিঠি হাতে কবিযা মহেন্দ্রেব আফিসেব দিকে যাইতেছে। সাহেব বেযাবাকে ডাকিলেন। সে ব্যক্তি চিঠিখানি বস্ত্রমধ্যে লুকাইযা প্রভুব নিকট আসিযা দাডাইল। সাহেব তাহাকে নিজেব খাসকামবায আনিযা বলিলেন "কিস্কা চিঠি—ডেখলাও

প্রভুব সক্রোধ মূর্তি দেখিযা বেযাবা কম্পিত হস্তে চিঠিখানি বাহিব কবিযা দিল। "টুম আভি বাহাব বাবাণ্ডামে ঠাহবো বলিযা সাহেব চোখে চশমা আঁটিযা দেখিলেন তাঁহাব স্ত্রীব হস্তাক্ষবে মহেন্দ্রেব নাম লেখা খামেব মুখে জল দিযা ভিজাইযা দিলেন। কিযৎক্ষণ পবে উহা সন্তর্পণে খুলিযা চিঠি পাঠ কবিলেন। সেই কযেক লাইন ইংবাজিব অনুবাদে এই—

"প্রিযতম,

আজ তিন দিন তোমায় চোখেব দেখাটিও দেখিতে পাই নাই। সে জন্য কী কষ্টে যে আছি, তাহা বলিতে পাবি না। আজ বাত্রি নযটাব পব এলিযট ট্যাঙ্কেব পশ্চিমে আমাদেব সেই নির্জন বৃক্ষতলে বেঞ্চখানিতে তুমি বসিযা থাকিও। সৌভাগ্যবশত একটা সুযোগ ঘটিযাছে—ঐ সময সেখানে গিযা আমি তোমাব সহিত ঘণ্টা দুই যাপন কবিতে পাবিব। এস—এস—এস—তোমায না দেখিতে পাইলে আমি মবিযা যাইব।

তোমাবই
এলসি।'

মেজব সাহেব কাগজে টুকিযা লইলেন—এলিযট—ট্যাঙ্ক-পশ্চিমে—বেঞ্চে। তাহাব পব, খামখানি আঠা দিযা আঁটিযা ডাকিলেন, "বেযাবা।' বেযাবা আসিযা দাঁডাইল।

সাহেব বলিলেন, "যাও, চিঠটি মোহেনবাবুকে দেও। হাম ইস চিঠিঠকো দেখা, মেমসাহেব ইযে মোহেনবাবু কোইকো মৎ বোলো খববদাব। বোলনেসে—বোলনেসে—"

মেজব সাহেব তাঁহাব টেবিলেব দেবাজ টানিযা একটা বিভলভাব বাহিব কবিযা বেযাবাব দিকে লক্ষ্য কবিয়া বলিলেন, "বোলনেসে, হাম তুমকো শুট

করেগা—জান মারেগা—সম্‌ঝা ?"

বেয়ারা কম্পিতপদে এক হাত পিছাইয়া গিয়া, করজোড়ে কাতরস্বরে কহিল, "নেহি খোদাবন্দ—হাম কুছ নেহি বোলেগা। কোইকো নেহি বোলেগা। মেরা জান পিযাবা হায়।"

মেজর সাহেব রিভলভারটি দেবাজে বন্ধ করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা—ইয়াদ বাখখো, যাও।"

দশ

বিকালে মেজর সাহেব স্ত্রীকে বলিলেন, "এলসি, আজ আমি বাড়িতেই খাইব। বার্বুর্চিকে বলিয়া দাও।"

এ কথা শুনিয়া মেমসাহেবের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। মনের ভাব যথাসাধ্য গোপন করিয়া সে বলিল, "তবে যে তুমি বলিয়াছিলে, আজ তোমাদের ইউনাইটেড সার্ভিস ক্লাবে একটা ভোজ আছে—ন'টার সময় তোমায় সেখানে যাইতে হইবে—বাড়িতে খাইবে না।"

"হ্যাঁ, তা বলিয়াছিলাম বটে, কিন্তু—সেখানে যাইতে আর ইচ্ছা হইতেছে না। আজ এম্পায়ারে একটা খুব ভাল ফিল্‌ম আছে—চল ডিনারের পর দু'জনে দেখিযা আসা যাউক।"

এলসি ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হইয়া, অগত্যা স্বামীর প্রস্তাবে সম্মত হইল।

ডিনার শেষে রাত্রি নয়টার সময় টমটম জোতাইয়া, মেজর সাহেব স্ত্রীকে লইযা বাহির হইলেন। বায়স্কোপে পৌঁছিয়া টমটম বিদায় করিয়া দিলেন—ট্যাক্সিতে ফিরিবেন।

সাড়ে নয়টায় বায়স্কোপ আরম্ভ হইল। দশটার পূর্বেই মেজর সাহেব বলিলেন, "তুমি একটু থাক প্রিয়তমে; আমি দশ মিনিট মধ্যে ফিরিয়া আসিতেছি। বড় পিপাসা পাইযাছে, বারে গিয়া একটা পেগ পান করিয়া আসি।"

এল্‌সি কোন কথা বলিল না—স্বামীর সঙ্গ তাহার বিষবৎ বোধ হইতেছিল। মেজর সাহেব চলিয়া গেলে সে বসিযা ভাবিতে লাগিল আজ আর মোহনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কোনই উপায় নাই—সে বেচারী সঙ্কেতস্থানে বসিয়া অবশেষে হতাশ হইযা প্রস্থান করিবে।

সাহেব রাস্তা পার হইয়া দ্রুতপদে ময়দানের ভিতর দিয়া চলিলেন। দশ মিনিট পরে উদ্দিষ্ট স্থানের নিকটবর্তী হইয়া, পথ হইতেই দেখিতে পাইলেন, বৃক্ষতলের অন্ধকারে বেঞ্চের উপর ফেল্ট হ্যাট্‌ মাথায় দিয়া কে একজন একাকী বসিয়া আছে।

পথ হইতে নামিয়া, ঘাসের উপর দিয়া সন্তর্পণে তিনি সেইদিকে অগ্রসর হইলেন। পার্শ্ববর্তী হইয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে তিনি ডাকিলেন, "মোহেন্‌!"

মহেন্দ্র চমকিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "কে, মেজর গ্রীন ?"

"হ্যাঁ। আমি মেজর গ্রীন। তুমি এ সময়ে এখানে বসিয়া কী করিতেছ, মোহেন্‌ ?"

"বায়ু সেবন করিতেছি।"

সাহেব গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "রাস্কেল ! ব্ল্যাগার্ড ! বায়ু সেবন করিতেছ ? না, আমার স্ত্রীর প্রতীক্ষা করিতেছ ? বিশ্বাসঘাতক ! ড্যাম নিগার শূয়ারকা বাচ্চা ! এত বড় আস্পর্দ্ধা তোমার—একজন য়ুরোপীয় মহিলা—আমার স্ত্রীর সহিত প্রেম কর ? আমি এই দণ্ডে তোমায় কুকুরের মত হত্যা করিব। তোমার ঈশ্বরকে স্মরণ কর !" বলিয়া সাহেব সাঁ করিয়া ভিতরের বুক পকেট হইতে রিভলভার বাহির করিলেন। উহার উজ্জ্বল নলটি অদূরস্থ গ্যাসের আলোকে চক্‌মক্ করিয়া উঠিল।

কিন্তু রিভলভার ছুঁড়িবার অবসর সাহেব পাইলেন না। মহেন্দ্র পালোয়ানগণের নিকট শেখা একটা "ল্যাং" মারিয়া, সেই মুহূর্তে সাহেবকে ধরাশায়ী করিয়া, তীরবেগে ঘোড়দৌড়ের মাঠের দিকে ছুটিল।

মেজর সাহেব তাঁহার স্থূল দেহখানি যথাসাধ্য শীঘ্র উঠাইয়া, আবার দুই পায়ে দাঁড়াইয়া, পলায়মান মহেন্দ্রের দিকে বিভলভার লক্ষ্য করিলেন—আওয়াজ হইল গুড়ুম। সৈনিক পুরুষের শিক্ষিত হস্ত—মহেন্দ্রের মাথার ফেল্ট হ্যাট্ উড়িয়া গেল।

কিন্তু মহেন্দ্র পড়িল না দেখিয়া, সাহেব তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। স্থূলদেহ লইয়া যথাসম্ভব দ্রুত দৌড়িতে লাগিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার তাঁহার রিভলভার গর্জন করিল, "গুড়ুম—গুড়ুম !"

কিন্তু মহেন্দ্র পড়িলও না, তাহাকে সাহেব আর দেখিতেও পাইলেন না। অগত্যা তখন প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। রিভলভাব পকেটে পুরিয়া, পোশাকের ধূলাকাদা ঝাড়িতে ঝাড়িতে আবার বায়স্কোপ অভিমুখে চলিলেন। তথায় পৌঁছিয়া, বার-এ দাঁড়াইয়া অল্প একটু সোডা সংযোগে একটা ডবল-পেগ ব্র্যাণ্ডি লইয়া এক নিঃশ্বাসে তাহা পান করিয়া ফেলিলেন। একটা সিগারেট ধরাইয়া অর্দ্ধেকটা খাইয়া, সেটা ফেলিয়া দিয়া ভিতরে গিয়া স্ত্রীর নিকট বসিলেন। এল্‌সি বলিল, "দশ মিনিট মধ্যে আসিব বলিয়া গেলে—প্রায় এক ঘণ্টা কাটিল, ছিলে কোথায় ?"

মেজর সাহেব সংক্ষেপে উত্তর করিলেন, "এক বন্ধুর সঙ্গে কথা কহিতেছিলাম।"

এগার

মহেন্দ্র সেই নির্জন ময়দানের ভিতর উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে যখন দেখিল, বন্দুকের শব্দ বন্ধ হইয়াছে, তখন দাঁড়াইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিল। এতক্ষণে সে 'গ্রাস রাইড' রাস্তা পার হইয়া, প্রায় ধোবীতালাওয়ের নিকট পৌঁছিয়াছিল। অন্ধকারে তীক্ষ্ণদৃষ্টি প্রেরণ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু পশ্চাদ্ধাবনকারী সাহেবের আর কোনও চিহ্ন দেখিতে পাইল না। তখন সে দ্রুতপদে অগ্রসর হইল। ক্রমে লোয়ার সার্কুলার রোডে আসিয়া পড়িয়া, একখানা চল্‌তি ঠিকাগাড়ি খালি পাইয়া, তাহা ভাড়া করিল। "জানানীসোয়ারীর"র মত সমস্ত খড়খড়ি বন্ধ করিয়া, রাত্রি এগারটার সময় নিজ বাসায় আসিয়া পৌঁছিল।

সমস্ত বাত্রি অনিদ্রায কাটাইযা. ভোবে উঠিযা, মহেন্দ্র ধুতি গামছা আব তাহাব মৃতা পত্নীব চিঠিব বাণ্ডিলটি লইযা গঙ্গাস্নান কবিতে গেল। জলে নামিযা প্রথমে বাণ্ডিলটি গঙ্গাগর্ভে ছুঁড়িযা ফেলিযা দিল। তাব পব স্নান কবিযা বাসায ফিবিযা আসিল। আফিসেব সাহেবেব নামে কর্মত্যাগপত্র লিখিযা উহা ডাকে দিযা, নিজ জিনিসপত্র বাঁধিতে লাগিল। আহাবান্তে বাসায পাওনাগণ্ডা মিটাইযা দিযা, জিনিসপত্রসহ স্টেশনে গিযা ট্রেনে উঠিল এবং সন্ধ্যাব মধ্যেই বাড়ি পৌঁছিযা জননীকে প্রণাম কবিল।

মা বলিলেন, "কী বাবা, ছুটি নিযে এলি ?"

"না মা চাকবি ছেড়ে দিযে এলাম। পবেব এক্তাজাবি আব পোষাল না।"

অমন চাকবিটা ছাড়িযা আসাতে মা বড় দুঃখ কবিতে লাগিলেন।

মেমসাহেবেব সেই হাজাব টাকায চাষেব জমি কিছু বাড়াইযা হাল-গরু কিনিযা মহেন্দ্র চাষবাস আবম্ভ কবিযা দিল এবং পবেব মাসেই নিকটস্থ গ্রামেব একটি সুন্দবী ডাগব মেযে দেখিযা বিবাহ কবিযা ফেলিল।

বৎসব দুই পবে মহেন্দ্র তাহাদেব গ্রামেব লাইব্রেবিতে একখানি ইংবাজি সংবাদপত্রে মেজব গ্রীনেব নাম ছাপা দেখিযা কৌতূহলী হইযা খববটা পড়িল। ইহা বিলাতী সংবাদপত্র হইতে উদ্ধৃত। ভাবতীয সেনাবিভাগেব মেজব গ্রীন এক বৎসবেব ফার্লো লইযা লণ্ডনে বাস কবিতেছিলেন, তিনি লণ্ডনেব আদালতে মোকদমা কবিযা বিবি এলসি গ্রীনেব সহিত তাঁহাব বিবাহবন্ধন ছেদন কবিযাছেন এবং বো বেল্পাগুন্ট লযেডস ব্যাঙ্কেব কর্মচাবি টার্নাব নামক কোনও যুবকেব বিরুদ্ধে হাজাব পাউণ্ড খেসাবতেব ডিক্রি পাইযাছেন।